জ্বালানি সমস্যাঃ
বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

প্রফেসর মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম

অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ১৯৪৬ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি একই বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগদান করার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের University of NewCastle Upon Tyne থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিকৌশল বিভাগের অধ্যাপক পদে এবং ১৯৯০ সালে ইনস্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি-তে গবেষণা অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ইনস্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি'র পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রফেসর ইসলাম তাঁর কর্মজীবনে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় এনার্জি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি US National Academy of Sciences-এর Renewable Energy Technology Diffusion in Developing Countries প্যানেলের সদস্য হিসাবে কাজ করেন এবং ১৯৮২ সালে উক্ত প্যানেলের প্রতিবেদন "Diffusion of Biomass Energy Technologies in Developing Countries" শীর্ষক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের East-West Centre-এর সাথে সহযোগিতা কার্যক্রমের অধীনে "Rural Energy to Meet Development Needs : Asian Village Approaches" শীর্ষক বইয়ের যৌথ সম্পাদনা করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক সংস্থা Asian and Pacific Development Centre (APDC)-এর সহযোগিতায় "Rural Energy Systems in the Asian-Pacific–A Survey of their Status, Planning and Management" শীর্ষক বইয়ের যৌথ সম্পাদনা করেন। ১৯৯৩-৯৫ সময়কালে প্রফেসর ইসলাম বাংলাদেশে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করেন এবং তিনি উক্ত কমিটির ড্রাফটিং উপ-কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালের ১৫ জানুয়ারি গেজেটের মাধ্যমে অনুমোদিত ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি প্রকাশিত হয়। ১৯৯৫ সালে মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক সংস্থা Asian and Pacific Development Centre (APDC)-এর সহযোগিতায় তিনি "Rural Energy Planning–A Government Enabled Market Based Approach" শীর্ষক বইয়ের যৌথ সম্পাদনা করেন। ১৯৯৫-৯৭ সময়কালে তিনি বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য-নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়নের জন্য গঠিত জাতীয় কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করেন।

অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম উন্নয়নশীল দেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যার নৈরাজ্যজনক চিত্রের প্রেক্ষিতে গত পঁচিশ বছরে এ ব্যাপারে তাঁর চিন্তা ও গবেষণার ফসল হিসাবে এই মূল্যবান গ্রন্থটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। অধ্যাপক ইসলামের মেধা ও প্রজ্ঞা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নয়নশীল দেশের জ্বালানি সমস্যার বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জ্বালানি নীতি নির্ধারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। যেমন National Academy of Science, USA। ১৯৮২ সালে এই প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট প্যানেলে অংশগ্রহণ করে অধ্যাপক ইসলাম "Diffusion of Biomass Energy Technologies in Developing Countries" শীর্ষক গ্রন্থে তাঁর অবদান রাখেন।

বাংলাদেশের জ্বালানি নীতি-১৯৯৫ প্রণয়নে তিনি এক অনন্য অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। এবার 'জ্বালানি সমস্যা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' গ্রন্থ রচনা করে আমাদের দেশের গ্যাসের মজুদ, চাহিদা নিরূপণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থ আমাদের দেশে বিরল। অন্যদিকে গ্রন্থটি আমাদের প্রাকৃতিক জ্বালানি সম্পর্কিত তথ্যসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী। গ্রন্থটিতে দেশের নীতি নির্ধারকসহ সুশীল সমাজের সকলের জন্যই একটি স্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

জ্বালানি সমস্যা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

প্রফেসর মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
ইনস্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

গণপ্রকাশনী
শহীদ রফিক-জব্বার মহাসড়ক, ঢাকা-১৩৪৪

প্রকাশনায়
গণপ্রকাশনী
শহীদ রফিক-জব্বার মহাসড়ক
নয়ারহাট, ঢাকা-১৩৪৪

□

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৪০৮
ডিসেম্বর, ২০০১

□

মুদ্রণে
গণমুদ্রণ লিমিটেড
শহীদ রফিক-জব্বার মহাসড়ক
নয়ারহাট, ঢাকা-১৩৪৪

□

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

□

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

□

Jwalani Samashya : Bangladesh Prekshit
[Energy Problem : Bangladesh Perspective]
by
Professor Mohammad Nurul Islam

□

Published by
Gonoprakashani
A Project of Gonoshasthaya Kendra Trust
Shahid Rafique-Jabbar Mahasarak
Nayarhat, Dhaka-1344
Bangladesh

□

First Edition
December, 2001

□

Printed at
Gonomudran Limited
Shahid Rafique-Jabbar Mahasarak
Nayarhat, Dhaka-1344
Bangladesh

□

Price : Taka Two hundred Fifty only
US$: 8.00

ISBN : 984-8233-19-9

মুখবন্ধ

মানব সভ্যতার ইতিহাসের সাথে জ্বালানি ব্যবহার, এর চাহিদা নিরূপণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং উৎস অনুসন্ধানের ইতিবৃত্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্থানভেদে এর প্রাচুর্য বা অপ্রতুলতা সভ্যতার অগ্রগতিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। মানুষের জীবনযাত্রা সবসময়ই জ্বালানি নির্ভর ছিল কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার অগ্রযাত্রার সাথে জ্বালানি সহজ প্রাপ্যতার বিষয়টি আরো নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির মাপকাঠিতে কোনও দেশ উন্নত বা অনুন্নত হতে পারে। কিন্তু জ্বালানির সরবরাহের নিরাপত্তার বিষয়টির গুরুত্ব কারো জন্যই খাটো করে দেখার সুযোগ আর নেই। কারণ এর সাথেই জড়িত তেল-রাজনীতি ও বিশ্বের ভূরাজনৈতিক তৎপরতা।

বিগত শতকে খনিজ তেল ও গ্যাসের আবিষ্কার, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে পশ্চিমা দেশসমূহের একচেটিয়া বিস্তৃতি ও অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব বাজার অর্থনীতিতে তার প্রভাব সম্পর্কে আজ সকলেই ওয়াকেবহাল। সত্তরের দশক পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে উন্নয়নশীল দেশের খনিজ তেল 'উন্নত' বিশ্বে সরবরাহের নিশ্চয়তা ছিল। ১৯৭৩ এর প্রথম "oil shock" এর ফলে জ্বালানির সমস্যার 'বিশ্বায়ন' হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এই ধাক্কা 'উন্নত' দেশগুলি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জ্বালানি সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। গত শতকের আশির দশকে আমাদের অনেক আশার বাণী শোনান হয়েছিল এবং আশ্বাস দেয়া হয়েছিল যে তেল-গ্যাসের বিকল্প জ্বালানি কিছু দিনের মধ্যেই সকলের জন্য জ্বালানি সমস্যা সমাধান করে দেবে। বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। তদুপরি আমাদের কাঠামোগত, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অন্তরায় সমূহের কারণে বিকল্প জ্বালানির ব্যবহারের দিন আজো সূদুর পরাহত।

অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম উন্নয়নশীল দেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যার নৈরাজ্যজনক চিত্রের প্রেক্ষিতে গত পঁচিশ বছরে এ ব্যাপারে তাঁর চিন্তা ও গবেষণার ফসল হিসাবে এই মূল্যবান গ্রন্থটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। অধ্যাপক ইসলামের মেধা ও প্রজ্ঞা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নয়নশীল দেশের জ্বালানি সমস্যার বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জ্বালানি নীতি নির্ধারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। যেমন National Academy of Science, USA। ১৯৮২ সালে এই প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট প্যানেলে অংশগ্রহণ করে অধ্যাপক ইসলাম "Diffusion of Biomass Energy Technologies in Developing Countries" শীর্ষক গ্রন্থে তাঁর অবদান রাখেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের East-West Centre-এর সাথে ১৯৮৪ সালে এনার্জি বিষয়ে আরও একটি গবেষণা প্রকল্পে সম্পৃক্ত হয়ে তিনি "Rural Energy to Meet Development Needs: Asian Village Approaches" গ্রন্থটির যৌথ সম্পাদনা করেন। ১৯৯৩-৯৫ সালে তিনি মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান Asian and Pacific Development Centre-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দু'টি গ্রন্থের যৌথ সম্পাদনা করেন। গ্রন্থ দু'টি হল "Rural Energy Systems in the Asia-Pacific -A Survey of their Status, Planning and Management" এবং "Rural Energy Planning-A Government Enabled Market-Based Approach"। বাংলাদেশের জ্বালানি নীতি-১৯৯৫ প্রণয়নে তিনি রেখেছিলেন এক অনন্য অগ্রণী ভূমিকা। তাই আমি মনে করি তাঁর এই বিশ্লেষণধর্মী, তথ্য সমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী গ্রন্থটি দেশের নীতি নির্ধারকসহ সুশীল সমাজের সকলকেই চিন্তার খোরাক যোগাবে এবং দিক নির্দেশনা দিতে পারবে। একই সাথে আমরা যেন আন্তর্জাতিক জ্বালানি রাজনীতির বিভিন্ন চোরাবালিতে পদচারণা না করি সে ব্যাপারেও এই গ্রন্থ সকলকে সাবধান করতে পারবে।

প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ
প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ভূমিকা

বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যা সমাধানে সচেতনতা সৃষ্টির আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়ে এ বইখানি লেখা। ১৯৯৩-৯৫ সালে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি কমিটি এবং ১৯৯৫-৯৭ সালে ন্যাশনাল গ্যাস প্রাইসিং পলিসি ফরমুলেশন কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করার সময় বাংলাদেশের জ্বালানি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। সে সময়ে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাবার উদ্দেশ্যে এ বইখানি লেখার ইচ্ছা হয়। ইতিপূর্বে গ্রামীণ জ্বালানি সম্বন্ধে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এশিয়া অঞ্চলের গ্রামীণ জ্বালানি সম্বন্ধীয় তিনখানা বই সম্পাদনার পর সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যা সম্বন্ধে একখানি বই লেখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে মনে হয়েছে। এর কারণ জ্বালানি উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও সময়ের স্বল্পতা। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জ্বালানি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সাব-সেক্টরের বিষয়বস্তু এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। বিশেষভাবে বিদ্যুৎ সেক্টর সম্বন্ধে তেমন কোন আলোচনা নেই। সময় সুযোগ হলে ভবিষ্যতে জ্বালানি সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ে লেখার ইচ্ছা রইল।

"বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যার বিভিন্ন দিক" বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত লেখাটি ১লা আগস্ট ১৯৯৯ সালে দৈনিক অর্থনীতির প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়। পরবর্তীতে ১০ নভেম্বর ২০০০ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে দৈনিক অর্থনীতির বিভিন্ন সংখ্যায় ৬৫ কিস্তিতে এ বইয়ের বেশিরভাগ লেখা ছাপা হয়েছে। অনেকে পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখাগুলোর কপি সংগ্রহের জন্য আমার সাথে এবং দৈনিক অর্থনীতি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে এবং লেখাগুলো সংকলিত করে বই হিসাবে প্রকাশ করার অনুরোধ জানায়। সে অনুরোধে সাড়া দিতে গিয়ে আজ এই গ্রন্থের প্রকাশ।

প্রথম অবস্থায় দৈনিক অর্থনীতিতে লেখাগুলো যেভাবে ছাপা হয়েছিল প্রায় সেভাবে বই হিসাবে ছাপাবার চিন্তা করি এবং সে পাণ্ডুলিপি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ইকবাল মাহমুদকে পড়তে দেই। প্রফেসর মাহমুদ আমার প্রস্তাবে সম্মতি দেন নি। তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য - বই এবং সংবাদপত্রের পাঠক এক নয়, সে কারণে সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখা হুবহু বইয়ে প্রকাশ করা ঠিক হবে না। প্রফেসর মাহমুদ অত্যন্ত যত্নের সাথে বইয়ের একটি সূচিপত্র লিখে আমাকে চিন্তা করতে বলেন। আমি আগ্রহের সাথে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর মাহমুদের উপদেশ পালন করার চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছি তা পাঠক বিবেচনা করবেন। অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও প্রফেসর মাহমুদ আমার লেখা পাণ্ডুলিপি পড়ে এ বইয়ের শিরোনাম ঠিক করে দিয়েছেন এবং মুখবন্ধ লিখেছেন সে জন্য আমি গর্বিত।

সূচিপত্র অনুসারে বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের লেখা সাজাতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে আজকের পৃথিবীতে নির্দিষ্ট কোন দেশের জ্বালানি উন্নয়ন সম্বন্ধে লেখা শুধুমাত্র সে দেশের জ্বালানি ও উন্নয়নের তথ্য ও উপাত্তের মধ্যে সীমিত রাখা যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যতে জ্বালানি সমস্যা সমাধান কিভাবে করা উচিত সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে হলে জ্বালানি আবিষ্কারের ইতিহাস এবং ব্যবহারের বিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যে বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে বিশ্বে জ্বালানি আবিষ্কারের ইতিহাস এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বের জ্বালানি অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার পর তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের জ্বালানি সম্বন্ধীয় বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। বিশ্বের কয়েকটি নির্বাচিত দেশের এনার্জি সম্বন্ধে উপাত্তের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দ্বাদশ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমার ধারণা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের এনার্জি সম্বন্ধীয় উপাত্তের বিবরণ পাঠককে বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যা বুঝতে সাহায্য করবে। বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে জ্বালানি শব্দটি এনার্জি শব্দের সমার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু এমনভাবে লেখা হয়েছে যে পাঠক ইচ্ছা করলে এককভাবে যেকোন একটি অধ্যায় অথবা একই সাথে বিভিন্ন অধ্যায়ও পড়তে পারেন।

বাংলাদেশে জ্বালানি ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত/ব্যবহৃত জ্বালানি সম্পদ সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশে জ্বালানি ব্যবহার, ভবিষ্যত চাহিদা ও সরবরাহের কৌশল সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে উল্লিখিত ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশের জ্বালানির চাহিদা ও সরবরাহ ব্যবস্থা এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দীর্ঘ মেয়াদকালে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ১৯৯৫ সালে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি অনুমোদন করেছে। ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেশের জ্বালানি উন্নয়নে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং ভবিষ্যতে রাখতে পারবে এ চিন্তা করে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির অন্তর্ভুক্ত ৫টি পলিসি যথা (১) নন-রিনিউয়েবল পলিসি, (২) পেট্রোলিয়াম পলিসি, (৩) রিনিউয়েবল এন্ড রুরাল এনার্জি পলিসি, (৪) পাওয়ার পলিসি এবং (৫) রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন পলিসি এর বিবরণ পরিশিষ্ট ১-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের এনার্জি সেক্টরের উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিগত বিষয় অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধান, পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ফরেন, প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্ট, ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি এবং প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের বিবরণ নবম অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে গ্যাস উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এনার্জি সেক্টরের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথভাবে এনার্জির মূল্য নির্ধারণ করা

জরুরি। একাদশ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

গ্যাস রপ্তানি বিষয়ে ইদানিংকালে আলোচিত বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের সংকলন দ্বাদশ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্যাস রপ্তানি বিতর্কের নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। জ্বালানি উন্নয়নের ফলে ভূমি, পানি ও বাতাস দূষিত হয়। জ্বালানি উন্নয়ন ও পরিবেশগত সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে করণীয় কিছু বিষয় সম্বন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে সুপারিশ করা হয়েছে।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যাঁর অশেষ কৃপায় আমার পক্ষে এ বইখানা লেখা সম্ভব হয়েছে।

আমার মা, বাবা, শাশুড়ী ও শ্বশুর সব সময় আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করেছেন, তাঁদের অনুপ্রেরণা আমাকে জীবনে সামনে অগ্রসর হতে শক্তি যুগিয়েছে; আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের অবদান স্মরণ করি। আমার জীবনে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ প্রফেসর এম. এ. নাসের, প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর মোশাররফ হোসেন খান, ড. ফসিহ্ উদ্দিন মাহতাব, প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ এবং প্রফেসর নূরউদ্দীন আহমদ আন্তরিকভাবে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন; আমি তাঁদের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

আমার স্ত্রী নূর আখতার, পুত্র তানিম ও কন্যা রেজওয়ানা দৈনিক অর্থনীতির জন্য লেখার প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের সময় অত্যন্ত যত্নের সাথে আমার লেখা পড়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ১লা আগস্ট ১৯৯৯ থেকে শুরু করে ১০ নভেম্বর ২০০০ তারিখ পর্যন্ত মোট ৬৫ কিস্তিতে দৈনিক অর্থনীতির বিভিন্ন সংখ্যায় এ বইয়ের লেখাগুলি ছাপা হয়। দৈনিক অর্থনীতিতে আমার লেখা ছাপার সুযোগ করে দেয়ার জন্য পত্রিকার সম্পাদক জনাব জাহিদুজ্জামান ফারুকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পত্রিকায় আমার লেখা পড়ে আমাকে উৎসাহিত করার জন্য আমি ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী, জনাব শফিক খান, জনাব সৈয়দ আশরাফ হোসেন, জনাব আফতাব উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর এম. এ. হান্নান, জনাব আবু তাহের খান ও জনাব মিয়া মোহাম্মদ শাহজাহানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ খান, জনাব এ. এইচ. এম. এ. মজিদ রহিমী, জনাব আব্দুল জলিল, জনাব এ. কে. এম. শামসুদ্দিন, ড. এ. এইচ. এম. শামসুদ্দিন; তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সংবাদপত্রে প্রকাশিত গ্যাস সম্বন্ধে সংবাদ ও প্রবন্ধ পড়ে আমি উপকৃত হয়েছি; এ প্রসঙ্গে আমি প্রফেসর ড. বদরুল ইমাম এবং জনাব এনায়েত কবির-এর অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে মূল্যবান মতামত দেয়ার জন্য আমি প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ, ড. এম. কামাল উদ্দিন, জনাব এম. আব্দুল্লাহ্, জনাব প্রশান্ত কুমার দে, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ খান, জনাব এ. কে. এম. শামসুদ্দিন, জনাব নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল-এর কাছে কৃতজ্ঞ। অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বইটি ছাপাবার ব্যাপারে আন্তরিক সহযোগিতা করার জন্য গণপ্রকাশনীর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে লেখা টাইপ করার জন্য আমি জনাব মোঃ ইলিয়াস জাবেদ-এর কাছে কৃতজ্ঞ। যত্নের সাথে পত্রিকায় প্রকাশিত জ্বালানি সম্বন্ধীয় খবর সংরক্ষণ করে আমাকে সহায়তা করার জন্য জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইয়ের ভুলত্রুটি এবং বইয়ে প্রকাশিত মতামতের জন্য আমি দায়ী। গ্রন্থটি সম্পর্কে সহৃদয় পাঠকের কোন মতামত, পরামর্শ আমাকে জানালে বাধিত হবো।

প্রফেসর মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম

সূচিপত্র

১ বিশ্বে জ্বালানি আবিষ্কারের ইতিহাস ॥ ১-৮
১.১ সূচনা ॥ ১
১.২ জীবাশ্ম জ্বালানি ॥ ২
১.৩ কয়লা আবিষ্কার ও ব্যবহার ॥ ২
১.৪ তেল আবিষ্কার ও ব্যবহার ॥ ৩
১.৫ প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার ও ব্যবহার ॥ ৫
১.৬ বিদ্যুৎ আবিষ্কার ও ব্যবহার ॥ ৬
১.৭ এনার্জি সেক্টরের উন্নয়নে বিশ্বে বিনিয়োগকৃত মূলধন ॥ ৬
১.৮ জ্বালানি সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ ॥ ৭
১.৯ ট্রাডিশনাল ও কনভেনশনাল জীবাশ্ম জ্বালানির ভবিষ্যত ॥ ৮

২ বিশ্বের জ্বালানি অবস্থা ॥ ১০-২২
২.১ বিশ্বের বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের জ্বালানির অবস্থা ॥ ১০
২.১.১ কয়লার ব্যবহার ॥ ১১
২.১.২ তেলের ব্যবহার ॥ ১৩
২.১.৩ প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ॥ ১৩
২.১.৪ হাইড্রোপাওয়ার ॥ ১৬
২.১.৫ নিউক্লিয়ার পাওয়ার ॥ ১৬
২.১.৬ প্রাইমারি এনার্জি সরবরাহ ও চাহিদা এবং মাথাপিছু ব্যবহার ॥ ১৭
২.২ শিল্পোন্নত এবং পেট্রোলিয়াম সম্পদের অধিকারী দেশসমূহের এনার্জি ব্যবহারের বিবরণ ॥ ২০
২.৩ বিভিন্ন অর্থনৈতিক গ্রুপের দেশের জ্বালানি ব্যবহারের বিবরণ ॥ ২১

৩ বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যার বিভিন্ন দিক ॥ ২৩-৩৩
৩.১ সূচনা ॥ ২৩
৩.২ ভূ-রাজনৈতিক সমস্যা ॥ ২৩
৩.৩ রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক সমস্যা ॥ ২৪
৩.৪ অর্থনৈতিক সমস্যা ॥ ২৪
৩.৫ প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা ॥ ২৫
৩.৬ আর্থ-সামাজিক সমস্যা ॥ ২৫
৩.৭ গৃহস্থালি খাতের জ্বালানি সমস্যা ॥ ২৬
৩.৮ জ্বালানি সম্বন্ধীয় সঠিক তথ্যের অভাব ॥ ২৮

৩.৯ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্বালানি সমস্যা ॥ ২৯
৩.১০ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্বালানি সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার ও প্রতিবন্ধকতা ॥ ৩১

৪ বাংলাদেশে জ্বালানি ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ॥ ৩৪-৪১
৪.১ নীতি নির্ধারণ ॥ ৩৪
৪.২ কমার্শিয়াল এনার্জি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ॥ ৩৪
৪.৩ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ॥ ৩৪
৪.৪ প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ॥ ৩৪
৪.৫ অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তেল আমদানি এবং বিপণন ॥ ৩৮
৪.৬ বায়োমাস জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা ॥ ৪০
৪.৭ রিনিউয়েবল এনার্জি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ॥ ৪০
৪.৮ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ॥ ৪০

৫ বাংলাদেশে প্রাপ্ত/ব্যবহৃত জ্বালানি সম্পদ ॥ ৪২-৪৮
৫.১ কয়লা ॥ ৪২
৫.২ পীট ॥ ৪৩
৫.৩ তেল ॥ ৪৩
৫.৪ প্রাকৃতিক গ্যাস ॥ ৪৩
৫.৫ হাইড্রোপাওয়ার ॥ ৪৬
৫.৬ বায়োমাস জ্বালানি ॥ ৪৬
৫.৭ পশুসম্পদ ও গোবর জ্বালানি ॥ ৪৬
৫.৮ রিনিউয়েবল এনার্জী টেকনোলজী ॥ ৪৬
৫.৮.১ মিনি হাইড্রো পাওয়ার ॥ ৪৬
৫.৮.২ সৌরশক্তি ॥ ৪৭
৫.৮.৩ বায়ুশক্তি ॥ ৪৭
৫.৮.৪ স্রোতশক্তি ॥ ৪৭
৫.৯ আমদানীকৃত জ্বালানি ॥ ৪৭
৫.৯.১ জ্বালানি তেল ॥ ৪৭
৫.৯.২ কয়লা ॥ ৪৮
৫.১০ মন্তব্য ॥ ৪৮

৬ বাংলাদেশে জ্বালানি ব্যবহার, ভবিষ্যত চাহিদা ও সরবরাহের কৌশল ॥ ৪৯-৫৫
৬.১ প্রাইমারি কমার্শিয়াল এনার্জির ব্যবহার ॥ ৪৯
৬.২ প্রাইমারি বায়োমাস জ্বালানি ব্যবহার ॥ ৪৯
৬.৩ মোট প্রাইমারি এনার্জি (কমার্শিয়াল এনার্জি এবং বায়োমাস জ্বালানি) ব্যবহার ॥ ৫০
৬.৪ মোট ফাইনাল এনার্জি (কমার্শিয়াল এনার্জি এবং বায়োমাস জ্বালানি) ব্যবহার ॥ ৫১

৬.৫ গড় মাথাপিছু প্রাইমারি এনার্জি ব্যবহারের তুলনা ॥ ৫২
৬.৬ বাংলাদেশে গড় মাথাপিছু কমার্শিয়াল এনার্জির প্রাপ্যতা ॥ ৫৩
৬.৭ ভবিষ্যতে জ্বালানির চাহিদা ॥ ৫৪
৬.৮ জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা ॥ ৫৫

৭ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি ॥ ৫৬-৬৩
৭.১ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য ॥ ৫৬
৭.১.১ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ॥ ৫৬
৭.১.২ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির উদ্দেশ্য ॥ ৫৭
৭.২ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির অন্যান্য অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর বিবরণ ॥ ৫৭
৭.৩ নীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ॥ ৫৮
৭.৪ সুপারিশকৃত নীতিসমূহ ॥ ৬০
৭.৫ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ॥ ৬০
৭.৬ মন্তব্য ॥ ৬৩

৮ বাংলাদেশের এনার্জি সেক্টরের উন্নয়ন, আইন ও নীতিগত বিষয় ॥ ৬৪-৮৩
৮.১ বাংলাদেশে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উন্নয়নের আইন এবং নীতিগত বিষয় ॥ ৬৫
৮.২ সংবিধান অনুসারে গ্যাস সম্পদের মালিক জনগণ ॥ ৬৬
৮.৩ পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট-১৯৭৪ ॥ ৬৭
৮.৪ ফরেন প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট (প্রমোশন এবং প্রটেকশন) অ্যাক্ট-১৯৮০ ॥ ৬৮
৮.৫ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির আলোচিত বিষয়সমূহ ॥ ৬৮
৮.৬ প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট এর আলোচ্য বিষয়সমূহ ॥ ৭০

৯ বাংলাদেশে হাইড্রোকার্বন (তেল ও গ্যাস) অনুসন্ধান ॥ ৮৪-৮৯
৯.১ বাংলাদেশে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের ইতিহাস ॥ ৮৪
৯.২ আন্তর্জাতিক কোম্পানির স্বত্বাধিকার পরিবর্তন ॥ ৮৬
৯.৩ অক্সিডেন্টালের বাংলাদেশ ত্যাগ ও ইউনোকলের আগমন ॥ ৮৬
৯.৪ কেয়ার্নের বাংলাদেশ ত্যাগ ও শেলের আগমন ॥ ৮৭
৯.৫ প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট অনুসারে চুক্তিকৃত এলাকা পরিত্যাগকরণ ॥ ৮৭

১০ বাংলাদেশে গ্যাস উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা ॥ ৯০-৯৭
১০.১ গ্যাস-উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ॥ ৯০
১০.২ গ্যাস পরিবহন ব্যবস্থাপনা ॥ ৯১
১০.৩ গ্যাস পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা ॥ ৯১
১০.৪ সার্বিক গ্যাস ব্যবস্থাপনা ॥ ৯২
১০.৫ Unocal কোম্পানির ওয়েষ্টার্ণ রিজিয়ন ইনটিগ্রেটেড প্রজেক্ট (WRIP) ॥ ৯৩

১১ এনার্জির মূল্য নির্ধারণ ॥ ৯৮-১২৭
১১.১ এনার্জির (গ্যাস, তেল ও বিদ্যুতের) মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বিতর্ক ॥ ৯৮
১১.২ ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ॥ ১০০
১১.৩ গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের প্রচলিত পদ্ধতি ॥ ১০১
১১.৪ গ্যাসের মূল্য নির্ধারণে আর্থ-সামাজিক দিক ॥ ১০৯
১১.৫ আন্তর্জাতিক কোম্পানির গ্যাস সরবরাহ ও প্রচলিত পদ্ধতিতে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ ॥ ১১৬
১১.৬ গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের স্বীকৃত পদ্ধতি ॥ ১১৯
১১.৭ জ্বালানির তেলের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ ১২১

১২ বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি ও বিভিন্ন প্রকার চাপ ও প্রচার ॥ ১২৮-১৬১
১২.১ আন্তর্জাতিক কোম্পানির প্রভাব ও প্রতিপত্তি ॥ ১২৮
১২.২ অতিরিক্ত গ্যাস প্রাপ্তির প্রচার ॥ ১২৯
১২.৩ কাফনায় বৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের ভূয়া খবর ॥ ১৩০
১২.৪ গ্যাস রপ্তানির আকর্ষণীয় হিসাব ॥ ১৩০
১২.৫ দ্বিতীয় রাউন্ড অফ বিডিং এর দরপত্র মূল্যায়নের বিবরণ ॥ ১৩০
১২.৬ যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশে সফর সম্বন্ধে ॥ ১৩৩
১২.৭ যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (CSIS) গ্যাস ও উন্নয়ন সম্বন্ধীয় কনফারেন্স ॥ ১৩৫
১২.৮ নির্বাচিত দশটি দেশের এনার্জি সম্পর্কিত উপাত্তের তুলনা ॥ ১৪০
১২.৯ বাংলাদেশ থেকে ভারতে গ্যাস আমদানির আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে ॥ ১৪৬
১২.১০ যুক্তরাষ্ট্রের মুখ্য-উপ-সহকারী জ্বালানি সচিব (মন্ত্রী) জনাব ক্যালভিন হামফ্রের বক্তব্য ॥ ১৪৮
১২.১১ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের গ্যাস রপ্তানির উপদেশ ॥ ১৫০
১২.১২ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জ্বালানি উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ ॥ ১৫২
১২.১৩ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের গ্যাস রপ্তানির উপদেশ ॥ ১৫৪
১২.১৪ বিশ্বব্যাংকের গ্যাস রপ্তানির উপদেশ ॥ ১৫৫
১২.১৫ গ্যাসের মূল্য কম করে দেখানোর প্রচেষ্টা ॥ ১৫৬
১২.১৬ বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের গ্যাস রপ্তানির প্রচার ॥ ১৫৯
১২.১৭ বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার কৌশল ॥ ১৬০

১৩ বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি নিয়ে বিতর্ক ॥ ১৬২-১৮৮
১৩.১ দেশে আবিষ্কৃত কয়লা ও জ্বালানি চাহিদা ॥ ১৬২
১৩.২ নিউক্লিয়ার এনার্জি ও বাংলাদেশের এনার্জি চাহিদা ॥ ১৬৩
১৩.৩ প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প জ্বালানি ॥ ১৬৩
১৩.৪ হাইড্রোপাওয়ার ও বাংলাদেশের এনার্জির চাহিদা ॥ ১৬৪

১৩.৫ বাংলাদেশে প্রচুর তেল মজুদ প্রাপ্তির খবর ॥ ১৬৪
১৩.৬ (রিজার্ভ/প্রডাকশন) অনুপাত ও গ্যাস রপ্তানি ॥ ১৬৫
১৩.৭ বাংলাদেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ কত? ॥ ১৬৬
১৩.৮ দীর্ঘ মেয়াদকালে গ্যাসের চাহিদা নিরূপণ ॥ ১৭৫
১৩.৮.১ আগামী ৫০ বছরে দেশের গ্যাস চাহিদা ॥ ১৭৫
১৩.৮.২ দীর্ঘ মেয়াদকালে গ্যাসের সরবরাহ ও চাহিদা পর্যালোচনা ॥ ১৭৮
১৩.৮.৩ মন্তব্য ॥ ১৭৮
১৩.৯ গ্যাস রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রার আয় ॥ ১৭৯
১৩.১০ গ্যাস রপ্তানির আয় ও মধ্যম-আয়ের দেশ বাংলাদেশ ॥ ১৮১
১৩.১১ গ্যাস ব্যবহার ও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ॥ ১৮৭
১৩.১২ জ্বালানি নিরাপত্তায় গ্যাসের গুরুত্ব ॥ ১৮৭

১৪ জ্বালানি উন্নয়ন ও পরিবেশগত সমস্যা ॥ ১৮৯-২১১
১৪.১ ঢাকা শহরে বায়ু দূষণ সমস্যা ॥ ১৯০
১৪.২ সীসামুক্ত পেট্রোলের প্রচলন ॥ ১৯১
১৪.৩ দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট মোটরযানের বায়ু দূষণ ॥ ১৯৪
১৪.৪ ডিজেল ইঞ্জিনচালিত মোটরযানের বায়ু দূষণ ॥ ১৯৭
১৪.৫ মোটরযান কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি) এর ব্যবহার ॥ ১৯৭
১৪.৬ যানবাহনের কারণে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিরসনের প্রচেষ্টা ॥ ২০২
১৪.৭ ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ সমস্যা সমাধানের সুপারিশ ॥ ২০২
১৪.৮ দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন চালু রাখার চেষ্টা ॥ ২০৭
১৪.৯ দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট মোটরযানে সিএনজি ব্যবহারের চেষ্টা ॥ ২০৯
১৪.১০ দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট মটরযান আমদানি নিষিদ্ধ করণ ॥ ২১০

১৫ ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা ॥ ২১২-২১৬
১৫.১ এনার্জি খাতের উন্নয়নে জাতীয় সমঝোতা ॥ ২১২
১৫.২ এনার্জি খাতের তথ্য ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন ॥ ২১২
১৫.৩ বায়োমাস জ্বালানির ব্যবহার ॥ ২১২
১৫.৪ জ্বালানি তেলের ব্যবহার ॥ ২১৩
১৫.৫ প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ॥ ২১৩
১৫.৬ কয়লার ব্যবহার ॥ ২১৪
১৫.৭ হাইড্রোপাওয়ার ব্যবহার ॥ ২১৪
১৫.৮ বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ॥ ২১৪
১৫.৯ দেশের দু-অঞ্চলের জ্বালানি বৈষম্য ॥ ২১৪
১৫.১০ গ্রামাঞ্চলের জ্বালানি সরবরাহ ॥ ২১৫
১৫.১১ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্বালানি সমস্যা ॥ ২১৫

১৫.১২ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরসন ॥ ২১৫
১৫.১৩ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং ও গবেষণা ॥ ২১৬
১৫.১৪ এনার্জী রেগুলেটরি কমিশন প্রতিষ্ঠাকরণ ॥ ২১৬
১৫.১৫ রিনিউয়েবল এনার্জী ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি স্থাপন ॥ ২১৬

Bibliography ॥ ২১৭
Appendix-1: Recommended Energy Policy ॥ ২২৩
Acronyms & Abbreviations ॥ ২৫৯

জ্বালানি সমস্যা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

১

বিশ্বে জ্বালানি আবিষ্কারের ইতিহাস

১.১ সূচনা

পৃথিবীতে মানব বসতির বয়স আনুমানিক ৮ হাজার বছর। হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের পরবর্তী ২ হাজার বছরের ইতিহাস যতটা ভালোভাবে জানা যায় তার আগের ৬ হাজার বছরের অবস্থা ততটা ভালভাবে জানা যায় না। পৃথিবীতে মানুষ তখন গৃহস্থালি, কৃষি, যাতায়াত প্রভৃতি কাজে নিজেদের পেশীশক্তি, বন্যপশুকে পোষ মানিয়ে পশুর পেশীশক্তি; বনাঞ্চলে প্রাপ্ত জ্বালানি কাঠ এবং অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি (বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি, পানিশক্তি, স্রোতশক্তি ইত্যাদি) ব্যবহার করত। আদিকালের পৃথিবী ছিল পুরোপুরিভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি[১] নির্ভর। এ সময়ে নিম্নমানের সেকেলে প্রযুক্তির (primitive technology) মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহার করা হত বলে জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা (efficiency) ছিল খুব কম। Primitive technology নির্ভর এসব জ্বালানিকে আমাদের দেশে অনেক সময় ট্রাডিশনাল এনার্জি নামেও অবহিত করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সূচিত শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজন মিটাতে জ্বালানি চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন primitive technology ও ট্রাডিশনাল এনার্জি সে চাহিদা মিটাবার জন্য অপ্রতুল হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে উন্নতমানের জ্বালানি হিসাবে কয়লার ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে কয়লার সাথে তেল, গ্যাস, হাইড্রোপাওয়ার, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের জ্বালানি ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে পৃথিবীর মানুষ জ্বালানি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং নিয়ন্ত্রণের লক্ষে উদ্যোগ গ্রহণ করে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাদেশের ন্যায় পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশ ট্রাডিশনাল জ্বালানি ব্যবহার করে মোট জ্বালানি চাহিদার একটা বড় অংশ মিটাতে চেষ্টা করছে। নিম্নমান এবং কম দক্ষতার (efficiency) কারণে এ ধরনের জ্বালানি ব্যবহার

---

[১] নবায়নযোগ্য জ্বালানি - যে সকল জ্বালানি একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্দিষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় তাকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বলে। যেমন সূর্যের আলো থেকে প্রতিদিন দিনের বেলা সৌরশক্তি পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বছরের কোন কোন ঋতুতে বাতাসের গতি থেকে বায়ুশক্তি পাওয়া যায়। প্রতিদিন জোয়ার ভাটা থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে স্রোত শক্তি পাওয়া যায়। কৃষি মৌসুমের শেষে শস্যের ক্ষেত থেকে কৃষি বর্জ্য পাওয়া যায়। গবাদী পশু থেকে প্রতিদিন গোবর পাওয়া যায়। গাছ থেকে ঋতুভেদে ঝরাপাতা এবং কয়েক বছর পর পর ডালপালা এবং জীবনকাল শেষ হলে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশী জ্বালানি আহরণ সম্ভব হয় না (সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, স্রোতশক্তি, পানিশক্তি ইত্যাদি)। কোন কোন ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশী পরিমাণ জ্বালানি আহরণের চেষ্টা করা হলে পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। যেমন, মাত্রাতিরিক্ত গাছ কাটা হলে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।

করে টেকসই উন্নয়নের (sustainable development) লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। উন্নত বিশ্বের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশেও উন্নতমানের জ্বালানি এবং আধুনিক জ্বালানি প্রযুক্তির ব্যবহার করা প্রয়োজন হবে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জ্বালানি সম্বন্ধে আলোচনার আগে, বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি আবিষ্কারের ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১.২ জীবাশ্ম জ্বালানি

সকল জ্বালানি ও শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে সূর্য। পৃথিবীতে মানব সভ্যতা শুরু হওয়ার লক্ষ কোটি বছর আগে উৎপাদিত গাছপালা, লতাগুল্ম ও জীবজন্তুর জীবাশ্ম ভূ-অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ে প্রধানত তিন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল জ্বালানি হল মানুষের অতিপরিচিত কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস, যা একত্রে জীবাশ্ম জ্বালানি বা fossil fuel নামে পরিচিত। সব ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি অনবায়নযোগ্য অর্থাৎ একবার ব্যবহার করা হলে পুনরায় আবার সৃষ্টি হয় না।

১.৩ কয়লা আবিষ্কার ও ব্যবহার

জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে মানুষ প্রথম কয়লা আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু করে। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে গ্রীসে ও রোমে কয়লা ব্যবহৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হয় ইংল্যান্ডের নিউক্যাসেল আপন টাইন শহরে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কয়লা উত্তোলনের পদ্ধতি এবং ব্যবহার প্রসার লাভ করে।

পৃথিবীর জ্বালানি ব্যবহারের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৮০-১৭৯০) ইংল্যান্ডে সূচিত শিল্পবিপ্লব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিল্পবিপ্লবের মূল বিষয় ছিল মানুষের পেশীশক্তির পরিবর্তে মেশিন ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। যে কয়েকটি মেশিনের আবিষ্কার শিল্পবিপ্লবের সূচনা করতে এবং পরবর্তীকালে যান্ত্রিক সভ্যতাকে গতিময় করতে সহায়তা করেছে সময়ের ক্রমানুসারে এগুলো হলো : ১৭৬৯ সালে আবিষ্কৃত জেমস ওয়াটের স্টীম ইঞ্জিন, ১৭৭০ সালে আবিষ্কৃত স্পিনিং জেনি, ১৭৮৫ সালে আবিষ্কৃত আর্করাইটের পাওয়ার লুম এবং এ সকল মেশিন তৈরি করার জন্য ঢালাই লোহা উৎপাদনের নতুন কৌশল। কয়লা ব্যবহার করে লোহা গলিয়ে মেশিনারিজ উৎপাদন, টেক্সটাইল শিল্পে মেশিনারিজ ব্যবহার, স্টীম ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রযুক্তি শিল্পবিপ্লবের গতি সঞ্চার করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৮৬০ বছর (১৮৬০ সালে তেল আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জৈব জ্বালানির (জ্বালানি কাঠ) পরিবর্তে উন্নত জ্বালানি হিসাবে কয়লার ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কয়লাকে শিল্পবিপ্লবের জ্বালানি বলা চলে। কয়লা উত্তোলনের প্রথম দিকে খনি দুর্ঘটনায় বহু শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলেও কয়লা উত্তোলন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়নি। রান্না করা, ঘর গরম

করার সহজ জ্বালানি হিসাবে কয়লার পরিবর্তে কয়লা থেকে তৈরি coal gas (কয়লা-গ্যাস) ব্যবহার শুরু হয়। কয়লা থেকে গ্যাস উৎপাদন করতে গিয়ে নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন শুরু হয়। কয়লা উৎপাদন, প্রসেসিং, পরিবহন ও ব্যবহার মিলে কয়লা-শিল্প নামে আলাদা শিল্প গড়ে ওঠে এবং লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়। কয়লাকে গ্যাসে রূপান্তরিত করার আলাদা শিল্প গড়ে ওঠে।

কয়লা আবিষ্কারের পর প্রায় এক হাজার বছর কাল ধরে কয়লা একটি নির্ভরযোগ্য জ্বালানি হিসাবে বিবেচিত হলেও একবিংশ শতাব্দীতে এটি একটি অবহেলিত জ্বালানিতে পরিণত হয়েছে। দ্রুত কয়লার ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে যার কারণ নানাবিধ। উন্নত বিশ্বে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ফলে কয়লা উত্তোলনের ন্যায় কষ্টসাধ্য কাজ করার লোকের অভাব দেখা দিচ্ছে এবং পাওয়া গেলেও তা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়ছে। আর্থ-কারিগরি কারণে অনেক কয়লা খনি লাভজনকভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। কয়লা ব্যবহারের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে পরিবেশগত সমস্যা। কয়লা উত্তোলনের পর খনি এলাকায় স্তূপ করে রাখা পাথর, কাদামাটি মানুষ দেখতে চায় না। কয়লা উত্তোলনের পর পরিত্যক্ত খনি এলাকায় সৃষ্ট গভীর খাদ পৃথিবীর বুকে ক্ষতের মত মনে হয়। কয়লা ব্যবহার করে শিল্পকারখানার আশেপাশে স্তূপ করে রাখা এবং উড়ে যাওয়া ছাই মানুষের কাছে অপছন্দনীয় ও অস্বাস্থ্যকর। কয়লার কালো ধোঁয়া, কয়লার ধোঁয়ার সাথে নির্গত সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস থেকে সৃষ্ট এসিড সাধারণ মানুষকে উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত করে এবং পরিবেশ বিপন্ন করে। বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড সঞ্চিত হয়ে 'গ্রীন হাউস এফেক্ট' সৃষ্টির জন্য কয়লার প্রভাব তেল ও গ্যাসের তুলনায় বেশী। কয়লা ব্যবহারকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত দূষণ কমানোর জন্য চেষ্টা করেছে। তবুও যে হারে কয়লার ব্যবহার কমে আসছে তাতে ধারণা করা যায় যে, আগামী ৪০-৫০ বছরের মধ্যে বিশ্বে কয়লার ব্যবহার বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশে প্রথম কয়লা আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৮ সালে বগুড়ার জামালগঞ্জে মাটির প্রায় ১০০০ মিটার গভীরে। আশা করা যায় আগামী ২০০৩ সালে দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়ার কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন শুরু করা সম্ভব হবে। প্রতি বছর ১০ লক্ষ টন হিসাবে ৭০ বছর ধরে এ কয়লা উত্তোলন করা যাবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে। আগামীতে ৭০ বছর ধরে এ পরিকল্পনা কতটা বাস্তবায়িত করা যাবে তা চিন্তার বিষয়।

১.৪ তেল আবিষ্কার ও ব্যবহার

১৮৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসালভেনিয়া অঞ্চলের তিতাসভীলে (Titasville) পেট্রোলিয়াম তেল আবিষ্কার হয়। এর আগে ভূ-পৃষ্ঠের কোন কোন স্থানে উদ্‌গিরন হয়ে ওঠা তেলের ব্যবহার জানা যায় কিন্তু বহুল ব্যবহার হয়নি। তেল আবিষ্কারের পর তেল শোধনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে জ্বালানি তেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের

সূচনা হয়। তেল ক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত অপরিশোধিত (crude) পেট্রোলিয়ামকে শোধনের জন্য পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি নামে আলাদা এক ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে। পেট্রোলিয়ামকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে গড়ে ওঠে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প নামে আলাদা আরেক ধরনের শিল্প।

শিল্পবিপ্লবের প্রথম দিকের সুবিধা ভোগকারী শিল্পোন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে শক্তিশালী হওয়ায় তারা বিগত ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে সারা পৃথিবীতে পেট্রোলিয়াম খাতকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়। পেট্রোলিয়াম শিল্পের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের পূর্বের সময়কে 'সেভেন সিসটারস' -এর সময়কাল হিসাবে ধরা হয়। ঐ সময়ে সারা পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা উন্নত বিশ্বের ৭টি আন্তর্জাতিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে ছিল। এ কোম্পানিগুলো হচ্ছে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল অফ কেলিফোর্নিয়া, টেক্সাকো, মবিল, গালফ্, এক্সন; ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম এবং ইংল্যান্ড ও হলান্ডের রয়াল ডাচ শেল। এ কোম্পানিগুলো সারা বিশ্বে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা ও বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তেলের দাম সস্তা রাখত। এ ব্যবস্থার ফলে পেট্রোলিয়াম ব্যবহারকারী উন্নত দেশগুলো সস্তা তেল ব্যবহার করে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়। অন্যদিকে পেট্রোলিয়াম সম্পদের স্বত্বাধিকারী উন্নয়নশীল দেশগুলো কম দামে ক্রুড পেট্রোলিয়াম বিক্রি করার ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশগুলো ১৯৬০ সালে নিজেদের সংগঠন অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ (OPEC) গঠন করে। ১৯৭০-এর দশকে ওপেকভুক্ত দেশগুলো তাদের দেশে পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ওপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। যে কারণে হঠাৎ করে সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ নিজস্ব পেট্রোলিয়াম সম্পদ জাতীয়করণ করে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাতীয় পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, বন্টন ও বিতরণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে।

বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলো এনার্জি এফিসিয়েন্ট প্রযুক্তি (energy efficient technology) উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেদের তেলের ভোগ/ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলো পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করে সফলতা লাভ করে। ১৯৮৫ সালের দিকে প্রতিযোগিতার মুখে ওপেক এবং পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের পেট্রোলিয়াম খাতের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়। বিশ্বায়নের ঢেউয়ে উন্নয়নশীল দেশের পেট্রোলিয়াম সম্পদ উন্নয়নে এবং বাজার সৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো পুনরায় তাদের আধিপত্য স্থাপন করে, যা এখনও চলছে।

বাংলাদেশে প্রথম তেল আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে। উক্ত তেল ক্ষেত্রে মোট উত্তোলনযোগ্য তেলের পরিমাণ ছিল ৫.৫ মিলিয়ন ব্যারেল, ১৯৯৩ সাল

পর্যন্ত সময়কালে প্রতিদিন ১২১ ব্যারেল ক্রুড অয়েল উত্তোলন করা হয়েছে। কারিগরি কারণে বর্তমানে ঐ কূপ থেকে তেল উত্তোলন করা হচ্ছে না।

১.৫ প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার ও ব্যবহার

১৮৫৯ সালের যুক্তরাষ্ট্রের তিতাসভীলে (Titasville) তেল আবিষ্কৃত হওয়ার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই সাথে তেল ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান, খনন এবং উত্তোলন প্রযুক্তির প্রসার ঘটে। যেমন তেলের সাথে সংমিশ্রিত অবস্থায় প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে। আবার কখনও কখনও তেল খুঁজতে গিয়ে আলাদাভাবে গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদান হচ্ছে মিথেন। এছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাসে কিছু পরিমাণে ইথেন, প্রপেন, বিউটেন প্রভৃতি বড় ধরনের হাইড্রোকার্বনযৌগ থাকতে পারে। আবার প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের সময় এর সাথে একত্রীভূত ন্যাচারাল গ্যাস লিকিউইড (Natural Gas Liquid) পাওয়া যায় যার গুণগত মান প্রায় তরল পেট্রোলিয়ামের ন্যায়। প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে যদি সালফারযৌগ থাকে তখন ন্যাচারাল গ্যাসকে sour natural gas বলে। ন্যাচারাল গ্যাসের সাথে যদি সালফার কম্পাউন্ড না থাকে তবে সে ন্যাচারাল গ্যাসকে sweet natural gas বলে। ক্রুড অয়েলের সাথে এসোসিয়েট গ্যাস এবং গ্যাসের সাথে এসোসিয়েট তেল জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। পূর্বে সস্তা তেলের দামের সময় প্রায় সকল তেল ক্ষেত্রে তেলের সাথে উত্তোলিত প্রাকৃতিক গ্যাস কূপমুখে জালিয়ে দেয়া হত। তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার পর কূপমুখে এসোসিয়েট ন্যাচারাল গ্যাস ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পাইপলাইন-প্রযুক্তি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। পাইপলাইন-প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার দ্রুত সম্প্রসারিত হয় এবং হাজার হাজার কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক গ্যাস তরলীকরণ (LNG) প্রযুক্তি চালু হওয়ার ফলে তেলের আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি প্রাকৃতিক গ্যাসের আন্তর্জাতিক বাজার প্রচলিত হয়। LNG প্রযুক্তি ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসের বেশীরভাগ বাণিজ্য পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের প্রথম ন্যাচারাল গ্যাস আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৫ সালে সিলেটে এবং প্রথম ব্যবহার শুরু হয় ১৯৬১ সালে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে। ২০০১ সাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২২টি (ছক ৫.২)। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল গ্যাস ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত গ্যাস সালফার মুক্ত সুইট ন্যাচারাল গ্যাস। এজন্য বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের আগে সালফার পৃথকীকরণ প্রয়োজন হয় না।

১.৬ বিদ্যুৎ আবিষ্কার ও ব্যবহার

১৭৬৯ সালে জেমস ওয়াটের স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর ১৮৩০ সালে বৃটেনে যাতায়াতের জন্য স্টীম চালিত রেল ইঞ্জিন চালু হয়। ১৮৩১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জেনারেটর, ১৮৭৮ সালে ইলেকট্রিক মোটর, ১৮৭৯ সালে বৈদ্যুতিক বাল্ব মানব জাতির ইতিহাসে বিদ্যুৎ সভ্যতার সূচনা করে। একই সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক প্রযুক্তি হিসাবে স্টীম ইঞ্জিনের পর স্টীম টারবাইন এবং গ্যাস টারবাইন আবিষ্কৃত হয়। এসব প্রযুক্তি মিলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অধীনে ইলেকট্রিক ইউটিলিটি শিল্প স্থাপিত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.৭ এনার্জি সেক্টরের উন্নয়নে বিশ্বে বিনিয়োগকৃত মূলধন

বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলো তেল ও গ্যাস উভয় ধরনের হাইড্রোকার্বন উত্তোলন করে থাকে। এছাড়া অনেক বড় বড় কোম্পানি তেল, গ্যাসের পরিবহন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। সে কারণে তুলনামূলক আলোচনা করার সময় এনার্জি সেক্টরে কর্মরত বিভিন্ন ধরনের কোম্পানিগুলোকে একত্রীভূত করে তুলনা করা হয়। The Economist (2001)-এর সূত্র অনুসারে ২০০০ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ৫০টি এনার্জি কোম্পানির বিনিয়োগকৃত মূলধন ছিল ১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানির অংশ ছিল : এক্সন-মবিল ১৬.৬%, রয়াল ডাচ শেল ১১.৭%, বিপি ১০.০%, টোটাল-ফিনা-এলফ ৬.০%, অন্যান্য তেল কোম্পানি ১৯.৩%, গ্যাস ও বিদ্যুৎ কোম্পানি ৩৬.৪% (চিত্র ১.১)।

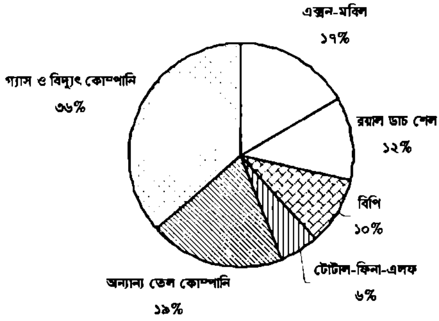

চিত্র ১.১ :
২০০০ সালে মূলধনের শতকরা অংশ হিসাবে বিভিন্ন এনার্জি কোম্পানির অবস্থান
(মোট মূলধন=১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার)

১.৮ জ্বালানি সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ

জীবাশ্ম জ্বালানির কেমিকাল এনার্জিকে তাপ ও চাপে রূপান্তরিত করার জন্য ফার্নেস ও বয়লারের ব্যবহার, চাপ এনার্জিকে মেকানিকাল এনার্জিতে রূপান্তরের জন্য টারবাইনের ব্যবহার, মেকানিকাল এনার্জিকে ইলেকট্রিকাল এনার্জিতে রূপান্তরের জন্য জেনারেটরের ব্যবহার, ইলেকট্রিকাল এনার্জিকে মেকানিকাল এনার্জিতে রূপান্তরের জন্য ইলেকট্রিক মোটরের ব্যবহার, কেমিকাল এনার্জিকে ইলেকট্রিকাল এনার্জিতে রূপান্তরিত করার জন্য ব্যাটারীর ব্যবহার, ইলেকট্রিকাল এনার্জিকে আলোকশক্তিতে রূপান্তরের জন্য বাল্বের ব্যবহার এবং আলোকশক্তিকে ইলেট্রিকাল এনার্জিতে রূপান্তরের জন্য ফটো ভোলটাইক সেলের ব্যবহার ইত্যাদি বিশ্বে এনার্জি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটিয়েছে। মানুষ এখন যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে যে ধরনের এনার্জির দরকার তার চাহিদা মিটাতে সক্ষম।

কোন নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ ধরনের এনার্জি টেকনোলজির ব্যবহার যে সকল উপাদানের ওপর নির্ভর করে তা হলো প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা, প্রযুক্তি আহরণের ক্ষমতা, প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা, আর্থিক সম্পদের প্রাপ্যতা এবং উপরোক্ত সকল সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা ও দক্ষতা। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো উপরোক্ত সব ধরনের সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহজে নিজস্ব জ্বালানি সমস্যা সমাধান করতে পারে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো সব ধরনের সম্পদ যথাযথ ব্যবস্থাপনা না করতে পারার কারণে জ্বালানি সমস্যায় ভোগে। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশের নিজস্ব প্রচুর জ্বালানি সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এর ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা থাকার কারণে সে সম্পদ দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৮ সালে জ্বালানি সম্পদ সমৃদ্ধ ও ওপেক গোষ্ঠীর সদস্য দেশ নাইজেরিয়ার গড় মাথাপিছু আয় ছিল ৩০০ ডলার অথচ জ্বালানি সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু আয় ছিল ৩৫০ ডলার।

ভূপৃষ্ঠের পার্বত্য অঞ্চলে পানি প্রবাহের স্থিতি শক্তিকে ওয়াটার টারবাইনের মাধ্যমে প্রবাহিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। উন্নত দেশগুলো নিজস্ব প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার কারণে নিজ নিজ দেশে প্রাপ্ত পানি বিদ্যুতের উৎসগুলো কাজে লাগিয়ে বিদ্যুতের চাহিদা মিটিয়েছে। অন্যদিকে চাহিদা না থাকার কারণে এবং অথবা প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারণে উন্নয়নশীল দেশের পানি বিদ্যুতের উৎসগুলো অব্যবহৃত রয়ে গেছে।

রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থের পরমাণুশক্তিকে তাপ শক্তিতে এবং পরবর্তীতে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি অত্যন্ত প্রযুক্তি নির্ভর এবং পুঁজিঘন প্রযুক্তি যে কারণে এর প্রচলন উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সীমিত। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এনার্জির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য নিজ দেশে সীমিতভাবে হলেও এ প্রযুক্তির প্রচলন করেছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে আণবিক বোমা উৎপাদনের প্রযুক্তিগত সম্পর্ক থাকার কারণে

উন্নত বিশ্বের পারমাণবিকশক্তির অধিকারী দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশকে এ প্রযুক্তি হস্তান্তরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ফলে পৃথিবীর খুব কমসংখ্যক উন্নয়নশীল দেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে পাকিস্তান ও ভারত অন্যতম। বাংলাদেশের পরিকল্পনাবিদরা বহু বছর ধরে আগ্রহের সাথে রূপপুরে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়ে সফলতা অর্জন করতে পারে নি।

১.৯ ট্রাডিশনাল ও কনভেনশনাল জীবাশ্ম জ্বালানির ভবিষ্যৎ

শিল্প বিপ্লবের সূচনাকাল পর্যন্ত সময়ে (১৭৮০-৯০ সালে) সারা পৃথিবীর মানুষ ট্রাডিশনাল বায়োমাস জ্বালানি (জ্বালানি কাঠ, লতাপাতা ইত্যাদি) দিয়ে নিজেদের চাহিদা মিটাতো। উন্নত দেশগুলো প্রথম ধাপে ট্রাডিশনাল জ্বালানির পরিবর্তে কয়লা; দ্বিতীয় ধাপে তেল আবিষ্কারের পর কয়লার পাশাপাশি তেল এবং তৃতীয় ধাপে কয়লা ও তেলের পাশাপাশি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার শুরু করে। পরবর্তীকালে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের পাশাপাশি হাইড্রোপাওয়ার এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ারের ব্যবহার শুরু করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলো জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোকে অনুসরণ করার চেষ্টা করলেও একবিংশ শতাব্দীতে এসে বেশীরভাগ উন্নয়নশীল দেশ নিজস্ব জ্বালানি চাহিদা মিটাবার জন্য প্রধানতঃ ট্রাডিশনাল জ্বালানির উপর নির্ভরশীল। ট্রাডিশনাল জ্বালানি সমূহ নবায়নযোগ্য হলেও তার প্রাপ্যতা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়া ট্রাডিশনাল জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতাও (efficiency) যথেষ্ট কম। যে কারণে শুধুমাত্র ট্রাডিশনাল জ্বালানির উপর নির্ভর করে উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে না। অপরিকল্পিতভাবে ট্রাডিশনাল জ্বালানি ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালালে পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটতে পারে। উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে হলে ট্রাডিশনাল জ্বালানির পাশাপাশি অথবা পরিবর্তে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

বিশ্বের জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং পরিকল্পনাবিদগণ এখন ভাবছেন যে, উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ যদি ক্রমবর্ধমান হারে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করতে থাকে, তবে বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণীর জ্বালানির মোট মজুদে কত বছর চলবে? কত বছর চলবে, এ হিসাব করতে গেলে দু'ধরনের হিসাব পদ্ধতি বিবেচনায় আসে। প্রথম এবং প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে বর্তমানে প্রতিবছর যে হারে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে সেই একই হারে ব্যবহৃত হলে কত বছর চলবে? এ পদ্ধতির হিসাব অপেক্ষাকৃত সহজ। মোট জীবাশ্ম জ্বালানির মজুদকে বর্তমানে যে হারে ব্যবহৃত হচ্ছে তা দিয়ে ভাগ করলে বছরের হিসাব পাওয়া যায়। একটু নিবিড়ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, জ্বালানির চাহিদা প্রতি বছর বৃদ্ধি পেলে বাস্তবে প্রাপ্ত জ্বালানিতে প্রচলিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত বছরের তুলনায় কম সময় চলবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভবিষ্যত জ্বালানির চাহিদা

নিরূপণ করে মোট মজুদ জীবাশ্ম জ্বালানিতে মোটামুটিভাবে কত বছর চলবে তা হিসাব করা জটিল এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যে কারণে এ হিসাবটি সচরাচর করা হয় না।

তিন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে এ সকল জ্বালানির ভবিষ্যৎ ব্যবহার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা যায় তা হলো : ঊনবিংশ শতাব্দী (১৮০১-১৯০০) ছিল কয়লার শতাব্দী; যখন কয়লা পৃথিবীর মোট জ্বালানি চাহিদার বেশী অংশ মিটাত। বিংশ শতাব্দীতে (১৯০১-২০০০ সাল) কয়লার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। অনেকে ধারণা করেন যে আগামী ৪০-৫০ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে কয়লার ব্যবহার ওঠে যেতে পারে। বিংশ শতাব্দী ছিল তেলের শতাব্দী। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এ জ্বালানির গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকে। অনেকে মনে করেন যে, পৃথিবীতে আহরণযোগ্য সম্ভাব্য তেল ক্ষেত্রগুলোর প্রায় বেশীরভাগ আবিষ্কার হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে এর পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। যে কারণে একবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ তেলের ব্যবহার নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে বলে ধারণা করা হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রাকৃতিক গ্যাসের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। গ্যাসের উৎস থেকে ব্যবহারকারী পর্যায়ে পাইপলাইন নির্মাণের অসুবিধার (ভৌগোলিক এবং ভূ-রাজনৈতিক) কারণে গ্যাসের ব্যবহার তেলের ন্যায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়নি। আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পাইপ সংযোগ স্থাপন করা হলে গ্যাসের ব্যবহারের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে, পৃথিবীতে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হবে। এরূপ অবস্থায় প্রাকৃতিক গ্যাস একবিংশ শতাব্দীর (২০০১-২১০০) জ্বালানির মর্যাদা লাভ করবে। অনেকে মনে করেন যে দূর ভবিষ্যতে হাইড্রোপাওয়ার এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদন করে প্রাকৃতিক গ্যাসের-পাইপলাইনে ব্যবহার করে গ্যাস জাতীয় জ্বালানি ব্যবহারের সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন তা হলো, (অনেকে মতামত ব্যক্ত করে থাকেন যে) অল্প সময়ের মধ্যে যদি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত নেয়া না হয় তা হলে বিকল্প জ্বালানি প্রচলনের ফলে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস মাটির নীচে অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যাবে। বিশ্বের সার্বিক জ্বালানি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে এ ধারণা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আরও আলোচনা করা হয়েছে।

২

বিশ্বের জ্বালানি অবস্থা

অয়েল এন্ড গ্যাস জার্নালের সূত্রে (Simpson 1998) ১৯৮০ সালে পৃথিবীর মোট প্রাইমারি জ্বালানির বাৎসরিক ব্যবহার ছিল ৭৩১৫ মিলিয়ন টন অয়েল ইকুইভ্যালেন্ট (এমটিওই)। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জ্বালানির অংশ ছিল : পেট্রোলিয়াম ৪২.৯৪%, প্রাকৃতিক গ্যাস ১৭.৪৪%, কয়লা ৩০.৫৬%, হাইড্রো পাওয়ার ৬.৫২%, নিউক্লিয়ার পাওয়ার ২.৫৪%। ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ১৬ বছরে মোট জ্বালানি ব্যবহার ৩২% বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৬৩৯.৩১ এমটিওইতে উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ব্যবহৃত মোট জ্বালানি ৯,৬৩৯.৩১ এমটিওই এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির অংশ ছিল : পেট্রোলিয়াম ৩৬.৯৬%, প্রাকৃতিক গ্যাস ২০.৫৫%, কয়লা ২৮.৮৫%, জল বিদ্যুৎ ৭.২২%, নিউক্লিয়ার পাওয়ার ৬.৪২% (চিত্র ২.১)।

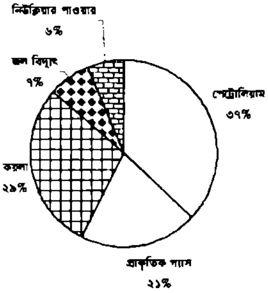

চিত্র ২.১ : ১৯৯৬ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি ব্যবহারের হিসাব

২.১ বিশ্বের বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের জ্বালানির অবস্থা

বিশ্বের নিম্নলিখিত ৬টি ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের জ্বালানি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সারণী-২.১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে – (১) পশ্চিম গোলার্ধে (উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা), (২) পশ্চিম ইউরোপে, (৩) পূর্ব ইউরোপে, (৪) মধ্যপ্রাচ্য, (৫) এশিয়া-প্যাসিফিক, (৬) আফ্রিকা। ১৯৯৬ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ৫,৩১৬.৮৮ মিলিয়ন। এর মধ্যে পশ্চিম গোলার্ধে ১৪.১%, পশ্চিম ইউরোপে ৮.৩%, পূর্ব ইউরোপে ৭.৪%, মধ্যপ্রাচ্যে ২.৯%, এশিয়া প্যাসিফিকে ৫৮.৫% এবং আফ্রিকায় ৮.৮% (চিত্র ২.২)। সারণী-২.১-এ উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে এ সকল অঞ্চলের জ্বালানি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। বাংলাদেশ এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উক্ত অঞ্চলে জ্বালানি সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

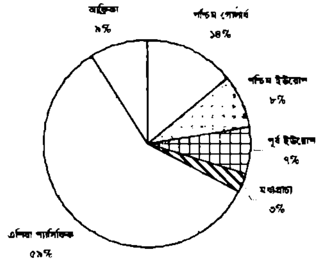

চিত্র ২.২ :
১৯৯৬ পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে জনসংখ্যার হিসাব
(মোট জনসংখ্যা = ৫,৩১৬.৮৮ মিলিয়ন)

২.১.১ কয়লার ব্যবহার

১৯৯৬ সালে মোট ৫,৭৮,৯০৯ এমটিওই কয়লা মজুদের মধ্যে পশ্চিম গোলার্ধে ১২.০%, পশ্চিম ইউরোপে ৫.৬%, পূর্ব ইউরোপে ৯.৭%, মধ্যপ্রাচ্যে ০.০২%, এশিয়া-প্যাসিফিকে ৬৬.৯% এবং আফ্রিকায় ৫.৮% (চিত্র ২.৩)। ১৯৯৬ সালে মোট উৎপাদিত ২,৭৯১ এমটিওই কয়লার মধ্যে ৪৪.৯% এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে উৎপাদিত এবং মোট ব্যবহৃত ২৭৮১ এমটিওই কয়লার মধ্যে ৪৫.১% এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রাপ্ত কয়লা চলতি ১৯৯৬ সালের হারে ব্যবহার করা হলে ৩০৯ বছর চলবে।

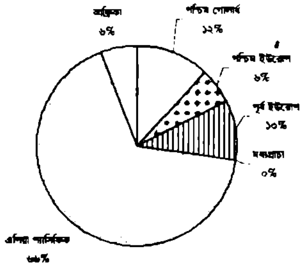

চিত্র ২.৩ :
১৯৯৬ পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে কয়লা মজুদের হিসাব
(মোট মজুদ=৫,৭৮,৯০৯ এমটিওই)

সারণী ২.১ : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত জ্বালানি ও ব্যবহারের বিবরণ (১৯৯৬)

বিবরণ	একক	পশ্চিম গোলার্ধ	পশ্চিম ইউরোপে	পূর্ব ইউরোপে	মধ্যপ্রাচ্য	এশিয়া প্যাসিফিক	আফ্রিকা	মোট
১। ভৌগোলিক এলাকা	হাজার বর্গকিঃ	৩৯,৩০৮.৯০	৪,১১২.২২	২৮,৯৮০.৩৮	৫,১৫৪.৬৭	২৭,০৪৬.৭২	১৭,৩৮০.৯৫	১২১,৯৮৩.৮৪
২। জনসংখ্যা	মিলিয়ন	৭৪৭.০৩	৪৪২.৮৯	৩৯১.৭০	১৫৫.২০	৩,১১২.০৮	৪৬৭.৯৮	৫,৩১৬.৮৮
৩। কয়লা মজুদ	এমটিওই	৬৯,৫০৭.৯১	৩২,২৯২.৬৬	৫৫,৯৮১.৪০	১৩৯.৪২	৩৮৭,২৭৩.৯৮	৩৩,৭১৩.১৯	৫৭৮,৯০৮.৫৫
৪। তেল মজুদ	এমটিওই	২১,২০৮.৩৮	২,১১৭.৯৩	৮,০৪৯.৫৭	৮৯,৬৯৯.৪৮	৫,৯৭৭.৬১	৯,৯৪৮.৯৪	১৩৭,০০১.৯১
৫। গ্যাস মজুদ	এমটিওই	১২,১৫২.০২	৪,০৫১.০৩	৪৮,২৭০.৩৬	৩৮,৫০০.৮৩	৭,৯১৯.২৬	৮,০৬৫.৫৮	১১৮,৯৫৯.০৫
৬। কয়লা উৎপাদন	এমটিওই	৬৪৬.৪৮	২৯৪.৪৪	৪৭০.২৪	০.৫৯	১,২৫৪.০৯	১২৫.১৫	২,৭৯১.০০
৭। কয়লা ব্যবহার	এমটিওই	৫৯০.৬৬	৩৯১.৩৩	৪৪৬.৬১	৪.৬৩	১,২৫৪.৩১	৯৩.৮৮	২,৭৮১.৪১
৮। তেল উৎপাদন	এমটিওই	১,০০৭.৭৭	৩৩৬.২৫	৩৬১.৪০	১,০১০.৬৯	৩৭৪.২০	৩৭৭.৫৩	৩,৪৬৭.৮২
৯। তেল ব্যবহার	এমটিওই	১, ৩০৬.৬৯	৭২২.০০	২৭৩.৮৫	২০৮.৯১	৯৩০.২৬	১২০.২২	৩,৫৬১.৯৩
১০। গ্যাস উৎপাদন	এমটিওই	৬৯৪.২২	২৪৩.৪৬	৬৩৩.৯৬	১৩০.১৭	১৯৭.৬৬	৭৭.১৪	১,৯৭৬.৬০
১১। গ্যাস ব্যবহার	এমটিওই	৬৯৬.৩৪	৩৪৭.২১	৫৬২.২৭	১২৪.৬০	২০৭.৪৫	৪২.৭১	১,৯৮০.৫৮
১২। হাইড্রো ব্যবহার	এমটিওই	৩৪৩.৮৬	১৩১.৩৭	৬৭.৩৩	৪.৩২	১০৩.৪০	১৫.৬৮	৬৬৫.৯৬
১৩। নিউক্লিয়ার ব্যবহার	এমটিওই	২১১.৭৯	২২৪.৯৬	৬৭.৮৭	-	১১১.৬৪	৩.২১	৬১৯.৪৭
১৪। প্রাইমারি এনার্জি উৎপাদন	এমটিওই	২,৯০৪.১০	১,২৩৩.৪৮	১,৬০০.৮০	১,১৪৫.৭৭	২,০৭০.৯৯	৫৯৮.৭০	৯,৫৫৩.৮৪
১৫। প্রাইমারি এ. ব্যবহার	এমটিওই	৩,১৪৯.৩০	১,৮১৬.৮৭	১,৪১৭.৯৩	৩৪২.৪৬	২,৬০৭.০৬	২৭৫.৬৯	৯,৬০৯.৩১
১৬। মাথাপিছু এ. ব্যবহার	টিওই	৪.২২	৪.১০	৩.৬২	২.২১	০.৮৫	০.৫৯	১.৮১
১৭। কয়লা (R/P)	বছর	১০৭.৫২	১০৯.৬৭	১১৯.৩৫	২৩৫.৪৫	৩০৮.৮১	২৬৯.৩৮	২০৭.৪২
১৮। তেল (R/P)	বছর	২১.০৫	৬.৩০	২২.২৭	৮৮.৭৫	১৫.৯৭	২৬.৩৫	৩৯.৫১
১৯। গ্যাস (R/P)	বছর	১৭.৫০	১৬.৬৪	৭৬.১৪	২৯৫.৭৮	৪০.০৭	১০৪.৫৬	৬০.১৮
২০। জীবাশ্ম (R/P)	বছর	৪৩.৮০	৪৪.০০	৭৬.৬২	১১২.৪৪	২১৯.৭১	৮৯.২১	১০১.৩৮
২১। জীবাশ্ম মাথাপিছু প্রাপ্তি (R/ জনসংখ্যা)	টিওই	১৩৭.৭০	৮৬.৮০	২৮৬.৭০	৮২৬.৯৩	১২৮.৯১	১১০.৫৩	১৫৭.০২

R Reserve, P-Production

Source : Compiled from Oil & Gas Journal Energy Database (Simpson 1998), Hammond (1990).

২.১.২ তেলের ব্যবহার

মোট ১,৩৭,০০২ এমটিওই ক্রুড অয়েল রিজার্ভের মধ্যে পশ্চিম গোলার্ধে ১৫.৫%, পশ্চিম ইউরোপে ১.৫%, পূর্ব ইউরোপে ৫.৯%, মধ্যপ্রাচ্যে ৬৫.৪%, এশিয়া-প্যাসিফিকে ৪.৪% এবং আফ্রিকায় ৭.৩% অবস্থিত (চিত্র ২.৪)। ১৯৯৬ সালে মোট উৎপাদিত ৩,৪৬৭.৮ এমটিওই পেট্রোলিয়ামের মধ্যে ২৯.১% মধ্যপ্রাচ্যে এবং ১০.৮% এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে উৎপাদন করা হয়েছে। মোট ব্যবহৃত ৩,৫৬১.৯ এমটিওই পেট্রোলিয়ামের মধ্যে ৫.৯% মধ্যপ্রাচ্যে এবং ২৬.১% এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ব্যবহার করা হয়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ব্যবহৃত ৯৩০.২৬ এমটিওই পেট্রোলিয়ামের মধ্যে ৪০.২% একই ভৌগোলিক এলাকা থেকে এবং বাকী ৫৯.৮% অন্যান্য অঞ্চল থেকে আমদানি করে চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রাপ্ত তেল ১৯৯৬ সালের হারে ব্যবহার করা হলে প্রায় ১৬ বছর চলবে।

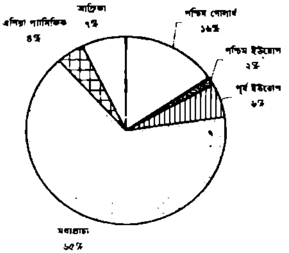

চিত্র ২.৪ :
১৯৯৬ পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে তেল মজুদের হিসাব (মোট মজুদ=১,৩৭,০০২ এমটিওই)

২.১.৩ প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

১৯৯৬ সালে মোট ১,১৮,৯৫৯ এমটিওই প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদের মধ্যে পশ্চিম গোলার্ধে ১০.২%, পশ্চিম ইউরোপে ৩.৪%, পূর্ব ইউরোপে ৪০.৫%, মধ্যপ্রাচ্যে ৩২.৪%, এশিয়া-প্যাসিফিকে ৬.৭% এবং আফ্রিকায় ৬.৮% অবস্থিত (চিত্র ২.৫)। ১৯৯৬ সালে মোট উৎপাদিত ১৯৭৬.৬০ এমটিওই প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে ৬.৬% মধ্যপ্রাচ্যে এবং ১০.০% এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে উৎপাদন করা হয়েছে। মোট ব্যবহৃত ১৯৮০.৫৮ এমটিওই প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে ৬.৩% মধ্যপ্রাচ্যে এবং ১০.৫% এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ব্যবহার করা হয়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ব্যবহৃত ২০৭.৪৫ এমটিওই প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে ৯৫.৩% একই ভৌগোলিক এলাকা থেকে এবং বাকী ৪.৭% অন্যান্য অঞ্চল থেকে আমদানি করে চাহিদা মিটানো হয়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস ১৯৯৬ সালের হারে ব্যবহার করা হলে প্রায় ৪০ বছর চলবে।

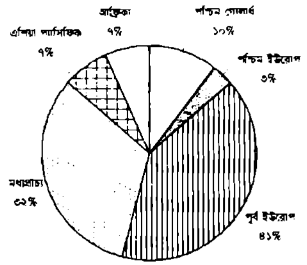

চিত্র ২.৫ :
১৯৯৬ পৃথিবীর বিভিন্নভৌগলিক অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের হিসাব
(মোট মজুদ=১,১৮,৯৫৯ এমটিওই)

প্রাকৃতিক গ্যাস সাধারণত পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়। যে কারণে এর ব্যবহার মোটামুটিভাবে একই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমিত থাকে। ব্যয়বহুল হওয়ায় মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের অল্প অংশ তরলীকৃত করে পরিবহন করা হয়। সাধারণত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম গোলার্ধে ব্যবহৃত মোট ৬৯৬.৩৪ এমটিওই প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে ৯৯.৭% এই অঞ্চলের মধ্যে এবং অবশিষ্ট ০.৩% অন্যান্য অঞ্চল থেকে আমদানি করে চাহিদা পূরণ করা হয়। পশ্চিম গোলার্ধে বিশেষভাবে উত্তর আমেরিকায় মহাদেশে কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি-রপ্তানি করা হয়। পশ্চিম ইউরোপে ব্যবহৃত মোট ৩৪৭.২১ এমটিওই প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে ৭০.১% ঐ অঞ্চলের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ২৯.৯% অঞ্চলের বাইরে থেকে আমদানি করে চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। পূর্ব ইউরোপে উৎপাদিত এবং ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৩৩.৯৬ এমটিওই এবং ৫৬২.২৭ এমটিওই। ১৯৯৬ সালে পূর্ব ইউরোপে থেকে মোট ৭১.৬৯ এমটিওই গ্যাস পাইপ লাইনের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপে রপ্তানী করা হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করার যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বড় বড় গ্যাস ক্ষেত্রের তালিকা সারণী ২.২-এ দেখানো হয়েছে। ১৯৯৬ সালে পৃথিবীতে প্রাপ্ত মোট ৪,৯৩৫ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভের মধ্যে প্রথম পাঁচটি দেশ ও তাদের প্রাপ্ত গ্যাস, মোট প্রাপ্ত গ্যাসের শতকরা অংশ : রাশিয়া ৩৪.৪৫%, ইরান ১৫.০৩%, কাতার ৫.০৭%, আবুধাবী ৩.৮২%, সৌদি আরব ৩.৭৬%। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ মোট গ্যাসের শতকরা অংশ হিসাব যথাক্রমে ০.৫৫%, ০.৫০% এবং ০.২০%। পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশ ইরান, কাতার ও আবুধাবী থেকে গ্যাস আমদানিতে আগ্রহী।

সারণী ২.২ : প্রাকৃতিক গ্যাসের বড় রিজার্ভ (১৯৯৬)

ক্রমিক নং	দেশের নাম	রিজার্ভ (টিসিএফ)	%
১.	রাশিয়া	১,৭০০.০	৩৪.৪৫
২.	ইরান	৭৪১.৬০	১৫.০৩
৩.	কাতার	২৫০.০০	৫.০৭
৪.	আবুধাবী	১৮৮.৪০	৩.৮২
৫.	সউদি আরব	১৮৫.৪০	৩.৭৬
৬.	যুক্তরাষ্ট্র	১৬৫.১০	৩.৩৪
৭.	ভেনেজুয়েলা	১৩৯.৯০	২.৮৩
৮.	আলজেরিয়া	১২৮.০০	২.৫৯
৯.	নাইজেরিয়া	১০৯.৭০	২.২২
১০.	ইরাক	১০৯.৫০	২.২২
১১.	তুরকেমেনিস্তান	১০১.০০	২.০৪
১২.	ইন্দোনেশিয়া	৬৮.৯০	১.৪০
১৩.	কানাডা	৬৮.৫০	১.৩৯
১৪.	মেক্সিকো	৬৮.৪০	১.৩৯
১৫.	মালয়েশিয়া	৬৮.০০	১.৩৮
১৬.	উজবেকিস্তান	৬৬.২০	১.৩৪
১৭.	নেদারল্যান্ড	৬৫.০০	১.৩২
১৮.	কাজাকিস্তান	৬৫.০০	১.৩২
১৯.	চীন	৫২.৪০	১.২০
২০.	কুয়েত	৪৭.৫০	১.০৬
২১.	নরওয়ে	৫৯.০০	০.৯৬
২২.	লিবিয়া	৪৫.৮০	০.৯৩
২৩.	ইউক্রেন	৩৯.৬০	০.৮০
২৪.	পাকিস্তান	২৭.০০	০.৫৫
২৫.	ওমান	২৫.২০	০.৫১
২৬.	ভারত	২৪.৯০	০.৫০
২৭.	যুক্তরাজ্য	২৩.৩০	০.৪৭
২৮.	মিশর	২২.১০	০.৪৫
২৯.	আর্জেন্টিনা	১৮.৬০	০.৩৮
৩০.	বাংলাদেশ	১০.০৮	০.২০
১-৩০	বড় গ্যাস রিজার্ভ মোট	৪,৬৮৪.৮	৯৪.৯২
	অন্যান্য দেশ	২৫০.৯৭	৫.০৮
	সর্বমোট	৪,৯৩৫.০৫	১০০.০০

Source : Compiled from Oil & Gas Journal Energy Database (Simpson 1998)

২.১.৪ হাইড্রোপাওয়ার

১৯৯৬ সালে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত মোট ৬৯৫.৯৫ এমটিওই হাইড্রোপাওয়ারের মধ্যে পশ্চিম গোলার্ধে ৪৯.৪%, পশ্চিম ইউরোপে ১৮.৯%, পূর্ব-ইউরোপে ৯.৭%, মধ্য প্রাচ্যে ০.৬%, এশিয়া-প্যাসিফিকে ১৯.২%, আফ্রিকাতে ২.৩% অবস্থিত (চিত্র ২.৬)। হাইড্রোপাওয়ার একটি প্রযুক্তি নির্ভর ও পুঁজিঘন প্রযুক্তি। যে কারণে শিল্পোন্নত দেশের সম্ভাব্য হাইড্রোপাওয়ার স্থাপনার স্থানে ইতোমধ্যে হাইড্রোপাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের হাইড্রোপাওয়ারের সম্ভাব্য স্থানে ভবিষ্যতে পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণের সম্ভাবনা রয়েছে। ইদানীংকালে পরিবেশগত সমস্যার কথা বিবেচনা করে অনেক দেশে হাইড্রোপাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না।

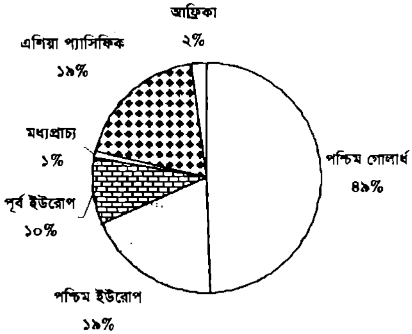

চিত্র ২.৬ :
১৯৯৬ পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে হাইড্রোপাওয়ার উৎপাদনের ক্ষমতা
(মোট উৎপাদন ক্ষমতা =৬৯৬ এমটিওই)

২.১.৫ নিউক্লিয়ার পাওয়ার

১৯৯৬ সালে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত মোট ৬১৯.৪৭ এমটিওই নিউক্লিয়ার পাওয়ারের মধ্যে পশ্চিম গোলার্ধে ৩৪.২%, পশ্চিম ইউরোপে ৩৬.৩%, পূর্ব-ইউরোপে ১১.০%, মধ্যপ্রাচ্যে ০%, এশিয়া-প্যাসিফিকে ১৮.০%, আফ্রিকাতে ০.৫% অবস্থিত (চিত্র ২.৭)। বিভিন্ন এনার্জি প্রযুক্তির মধ্যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার সবচেয়ে বেশী প্রযুক্তি নির্ভর ও পুঁজিঘন। তাছাড়া নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রযুক্তি হস্তান্তরে কড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। যে কারণে যে কোন দেশ ইচ্ছা করলেই বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রযুক্তি সংগ্রহ করতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে অবস্থিত নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের তালিকা সারণী ২.৩-এ দেখানো হয়েছে।

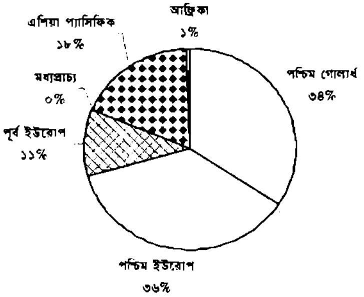

চিত্র ২.৭ :
১৯৯৬ পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার উৎপাদনের ক্ষমতা
(মোট উৎপাদন ক্ষমতা =৬২০ এমটিওই)

২.১.৬ প্রাইমারি এনার্জি সরবরাহ ও চাহিদা এবং মাথাপিছু ব্যবহার

সারণী ২.১-এ উপস্থাপিত তথ্য পর্যালোচনা করে প্রাইমারি এনার্জি (কয়লা, তেল ও নিউক্লিয়ার) উৎপাদন ও ব্যবহারের তুলনা করলে দেখা যায় যে পূর্ব-ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা অঞ্চল জ্বালানি উদ্বৃত্ত অঞ্চল অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জ্বালানির পরিমাণ ব্যবহারের পরিমাণের চেয়ে বেশী এবং পশ্চিম গোলার্ধ, পশ্চিম ইউরোপ এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, জ্বালানি ঘাটতি অঞ্চল অর্থাৎ অন্যান্য অঞ্চল থেকে জ্বালানি আমদানি করে চাহিদা মিটাতে হয়।

১৯৯৬ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বছরে মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল : পশ্চিম গোলার্ধে ৪.২২ টিওই, পশ্চিম ইউরোপে ৪.১০ টিওই, পূর্ব ইউরোপে ৩.৬২ টিওই, মধ্যপ্রাচ্যে ২.২১ টিওই, এশিয়া প্যাসিফিকে ০.৮৫ টিওই, আফ্রিকায় ০.৫৯ টিওই এবং সারা পৃথিবীর গড় ১.৮১ টিওই (চিত্র ২.৮)। ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুসারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার চললে সব ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিভিন্ন অঞ্চলের যে সময় চলবে তা হলো : পশ্চিম গোলার্ধে ৪৪ বছর, পশ্চিম ইউরোপে ৪৪ বছর, পূর্ব ইউরোপে ৭৭ বছর, মধ্যপ্রাচ্যে ১১২ বছর, এশিয়া প্যাসিফিকে ২২০ বছর, আফ্রিকায় ৮৯ বছর এবং সারা পৃথিবীর প্রায় ১০১ বছর। ১৯৯৬ সালে মাথাপিছু জীবাশ্ম জ্বালানির প্রাপ্যতা [(কয়লা + তেল + প্রাকৃতিক গ্যাস)/জনসংখ্যা] ছিল : পশ্চিম গোলার্ধে ১৩৭.৭০ টিওই, পশ্চিম ইউরোপে ৮৬.৮০ টিওই, পূর্ব ইউরোপে ২৮৬.৭০ টিওই, মধ্যপ্রাচ্যে ৮২৬.৯৩ টিওই, এশিয়া প্যাসিফিকে ১২৮.৯১ টিওই, আফ্রিকায় ১১০.৫৩ টিওই এবং বিশ্বব্যাপী গড় ১৫৭ টিওই (চিত্র ২.৯)।

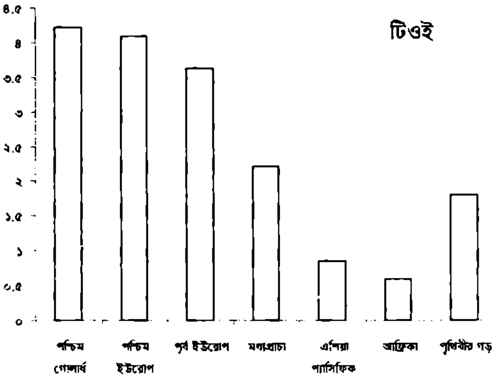

চিত্র ২.৮ :
১৯৯৬ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বছরে মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহারের পরিমাণ (টিওই)

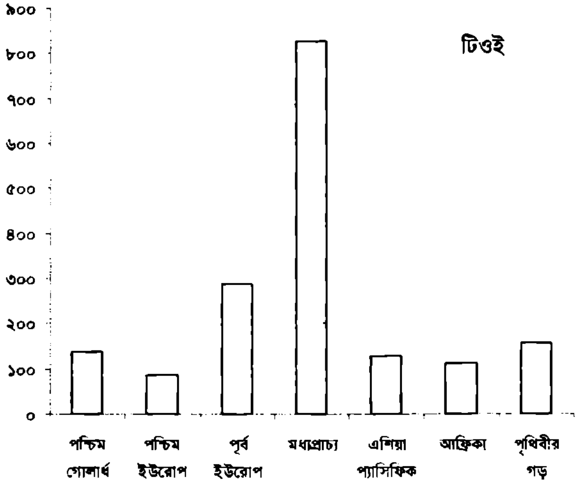

চিত্র ২.৯ :
১৯৯৬ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মাথাপিছু জীবাশ্ম জ্বালানির প্রাপ্যতা (টিওই)

সারণী ২.৩ : বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিবরণ

দেশের নাম	ইউনিট	মেগাওয়াট	%
আর্জেনটিনা	২	৯৩৫	০.২৭
ব্রাজিল	১	৬২৬	০.১৮
কানাডা	১৪	৯,৯৯৮	২.৮৭
মেক্সিকো	২	১,৩০৮	০.৩৭
যুক্তরাষ্ট্র	১০৪	৯৬,৪২৩	২৭.৬৪
পশ্চিম গোলার্ধ	১২৩	১,০৯,২৯০	৩১.৩২
বেলজিয়াম	৭	৫,৭১২	১.৬৪
ফিনল্যান্ড	৪	২,৬৫৬	০.৭৬
ফ্রান্স	৫৮	৬১,৬৫৩	১৭.৬৭
জার্মানী	২০	২২,২৮২	৬.৩৯
নেদারল্যান্ড	১	৪৪৯	০.১৩
স্পেন	৯	৭,৩৭৭	২.১১
সুইডেন	১২	১০,০৪০	২.৮৮
সুইজারল্যান্ড	৫	৩,০৭৯	০.৮৮
যুক্তরাজ্য	৩৫	১২,৯৬৮	৩.৭২
পশ্চিম ইউরোপে	১৫১	১,২৬,২১৬	৩৬.১৮
আর্মেনিয়া	১	৩৭৬	০.১১
বুলগেরিয়া	৬	৩,৫৩৮	০.০১
চেক রিপাবলিক	৪	১,৬৪৮	০.৪৭
হাঙ্গেরী	৪	১,৭২৯	০.৫০
কাজাকিস্তান	১	৭০	০.৫০
লিথুনিয়া	২	২,৩৭০	০.৬৮
রোমানিয়া	১	৬৫০	০.১৯
রাশিয়া	২৯	১৯,৮৪৩	৫.৬৯
স্লোভাকিয়া	৫	২,০২০	০.৫৮
স্লোভেনিয়া	১	৬৩২	০.১৮
ইউক্রেন	১৬	১৩,৭৬৫	৩.৯৫
পূর্ব ইউরোপে	৯০	৪৬,৬৪১	১৩.৩৭
মধ্যপ্রাচ্য	০	০	০
দক্ষিণ আফ্রিকা	২	১,৮৪২	০.৫৩
আফ্রিকা	২	১,৮৪২	০.৫৩
চীন	৯	৭,০৫১	২.০২
ভারত	১০	১৬৯৫	০.৪৯
জাপান	৫৩	৪৩,৬৯১	১২.৫২
কোরিয়া	১৫	১২,৩৪০	৩.৫৪
পাকিস্তান	১	১২৫	০.০৪
এশিয়া-প্যাসিফিক	৮৮	৬৪,৯০২	১৮.৬০
মোট	৪৩৪	৩,৪৮,৮৯১	১০০

Source : Compiled from IAEA Bulletin Vol. 41, No. 4, 1999.

২.২ শিল্পোন্নত এবং পেট্রোলিয়াম সম্পদের অধিকারী দেশসমূহের এনার্জি ব্যবহারের বিবরণ

বর্তমান বিশ্বে মোট ২৫টি শিল্পোন্নত দেশের সংগঠনের নাম অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (OECD)[১]। এনার্জি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিন্ন নীতি ও কৌশল গ্রহণের জন্য ওইসিডির অন্তর্ভুক্ত ২৩টি দেশ মিলে ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (IEA)[২] নামে একটি বিশেষ সংগঠন সৃষ্টি করেছে। অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিস (OPEC)[৩]-এর অন্তর্ভুক্ত ১১টি দেশ তেল ও গ্যাস রপ্তানি করে। ১৯৯৬ সালে OECD, OPEC ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি ব্যবহারের বিবরণ সারণী ২.৪-এ দেখান হয়েছে।

পৃথিবীর মোট কয়লার ৪৩.৪৭%, পেট্রোলিয়ামের ৩২.১৯%, প্রাকৃতিক গ্যাসের ৪৫.৭৩%, হাইড্রোপাওয়ারের ৫২.০৬%, নিউক্লিয়ার পাওয়ারের ৮৬.৫৩% এবং অন্যান্য রিনিউয়েবল এনার্জির ৯৩.৫৬% ওইসিডির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে উৎপাদিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত কয়লার ১.১২%, পেট্রোলিয়ামের ৩৯.৪৬%, প্রাকৃতিক গ্যাসের ১৩.২৯%, হাইড্রোপাওয়ারের ৩.২৩%, রিনিউয়েবল এনার্জির ০.৬৪% ওপেকভুক্ত দেশগুলোতে হয়ে থাকে। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত কয়লার ৫৫.৪১%, পেট্রোলিয়ামের ২৮.৩৫%, প্রাকৃতিক গ্যাসের ৪০.৯৮%, হাইড্রোপাওয়ারের ৪৪.৭১%, নিউক্লিয়ার পাওয়ারের ১৩.৪৭%, রিনিউয়েবল-এর ৫.৮১% পৃথিবীর অন্যান্য দেশে হয়ে থাকে।

মাথাপিছু আয়ের বিশ্লেষণে ওপেকভুক্ত কোন কোন দেশ উচ্চ আয়ের শ্রেণীভুক্ত হলেও প্রযুক্তিগত পরিমাপে এগুলো উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত। ওপেকভুক্ত দেশসমূহ নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য OECDসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তেল ও গ্যাস রপ্তানি করছে। কিন্তু নিজস্ব জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেশন করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। অন্যভাবে বলতে গেলে পৃথিবীর নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির ক্ষমতা অর্জনকারী ওইসিডি দেশসমূহ ইচ্ছা করে ওপেকভুক্ত দেশকে এ

---

[১] OECD গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ২৫টি দেশের নাম : কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, গ্রীস, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যন্ড, ইতালী, লাক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, যুগশ্লাভিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড। ওইসিডিভুক্ত দেশগুলি বেশীরভাগই এনার্জি আমদানী করে থাকে।

[২] IEA-এর অন্তর্ভুক্ত ২৩টি দেশের নাম : অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, গ্রীস, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যন্ড, ইতালী, জাপান, লাক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

[৩] OPEC ভুক্ত ১১টি দেশের নাম (ওপেক-এর সদস্য হওয়ার বছর) : আলজিরিয়া (১৯৬৭), ইরাক (১৯৬০), ইরান (১৯৬০), ইউএই (১৯৭৪), ইন্দোনেশিয়া (১৯৬২), কাতার (১৯৬১), কুয়েত (১৯৬০), লিবিয়া (১৯৬২), নাইজেরিয়া (১৯৭১), ভেনেজুয়েলা (১৯৬০), সৌদি আরব (১৯৬০)।

ক্ষমতা অর্জন করতে দেয়নি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে যেসকল দেশের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা উন্নতমানের যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব-ইউরোপের কয়েকটি দেশ, কোরিয়া, চীন, পাকিস্তান ও ভারত নিউক্লিয়ার পাওয়ার উৎপাদন করে নিজ দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার একটা অংশ পূরণ করছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ও পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট বন্ধ করে দেওয়ার শর্তে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে। মোদ্দা কথা হল যে ভবিষ্যতে উন্নত বিশ্ব তাদের ক্ষমতা বলয়ের বাইরে কোন দেশে নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুযোগ প্রদান করবে না। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের ন্যায় পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশকে জ্বালানি চাহিদা মিটাবার জন্য কনভেনশনাল এনার্জির উৎস যেমন কয়লা, তেল, গ্যাস ও হাইড্রোপাওয়ারের উপর নির্ভর করতে হবে।

সারণী ২.৪ : OECD, OPEC ও অন্যান্য দেশের জ্বালানি ব্যবহারের বিবরণ (১৯৯৬)

বিবরণ	একক	OECD	OPEC	অন্যান্য দেশ
কয়লা উৎপাদন	%	৪৩.৪৭	১.১২	৫৫.৪১
পেট্রোলিয়াম উৎপাদন	%	৩২.১৯	৩৯.৪৬	২৮.৩৫
প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন	%	৪৫.৭৩	১৩.২৯	৪০.৯৮
হাইড্রোপাওয়ার উৎপাদন	%	৫২.০৬	৩.২৩	৪৪.৭১
নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেশন	%	৮৬.৫৩	০.০০	১৩.৪৭
রিনিউয়েবল পাওয়ার জেনারেশন	%	৯৩.৫৬	০.৬৪	৫.৮১

Source : Compiled from Oil and Gas Journal Database (Simpson 1998)

২.৩ বিভিন্ন অর্থনৈতিক গ্রুপের দেশের জ্বালানি ব্যবহারের বিবরণ

বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে (WB 2000) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে গড় মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে প্রধানত তিনটি গ্রুপে ভাগ করে থাকে। নিম্ন আয়ভুক্ত দেশ সমূহ, যাদের ১৯৯৮ সালে গড় মাথাপিছু আয় ৭৬০ ইউএস ডলার অথবা এর কম, মধ্যম আয়ের দেশসমূহ, যাদের গড় মাথাপিছু আয় ৭৬১ ইউএস ডলার থেকে ৯৩৬০ ইউএস ডলার পর্যন্ত এবং উচ্চ আয়ের দেশ, যাদের গড় মাথাপিছু আয় ৯,৩৬১ ইউএস ডলার অথবা এর চেয়ে বেশী। এ তিন শ্রেণীভুক্ত দেশের আয়তন, জনসংখ্যা, এবং এনার্জি ব্যবহারের হিসাব সারণী ২.৫-এ দেখানো হয়েছে।

নিম্ন আয়ভুক্ত দেশসমূহে ৬০% লোক বাস করে, ২২% এনার্জি ব্যবহার করা হয় এবং ৬% জিএনপি উৎপাদন করে থাকে। মধ্যম আয়ের দেশসমূহে ২৫% লোক বাস করে, ২৮% জ্বালানি ব্যবহার করে এবং ১৫% জিএনপি উৎপাদন করে থাকে। উচ্চ আয়ের দেশসমূহে ১৫% লোক বাস করে, ৫০% জ্বালানি ব্যবহার করে এবং ৭৯% জিএনপি উৎপাদন করে। নিম্ন আয়ভুক্ত দেশসমূহের গড় মাথাপিছু আয় এবং এনার্জি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫২০ ডলার এবং ৬৪০ কেজিওই। মধ্যম আয়ভুক্ত

দেশসমূহের গড় মাথাপিছু আয় এবং এনার্জি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,৯৫০ ডলার এবং ১,৮০১ কেজিওই। উচ্চ আয়ভুক্ত দেশসমূহের গড় মাথাপিছু আয় এবং এনার্জি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫,৫১০ ডলার এবং ৫,৩৪৬ কেজিওই।

সারণী ২.৫ :

অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে বিভিন্ন দেশের জ্বালানি ব্যবহারের তারতম্য

বিবরণ	একক	নিম্ন আয় ৭৬০ ডলারের কম	মধ্যম আয় ৭৬১-৯,৩৬০ ডলার	উচ্চ আয় ৯,৩৬১ ডলারের বেশী
ভৌগলিক এলাকা	%	৩২	৪৪	২৪
জনসংখ্যা	%	৬০	২৫	১৫
জ্বালানি ব্যবহার	%	২২	২৮	৫০
জিএনপি	%	৬	১৫	৭৯
মাথাপিছু জ্বালানি	কেজিওই	৬৪০	১,৮০১	৫,৩৪৬
মাথাপিছু জিএনপি	ডলার	৫২০	২,৯৫০	২৫,৫১০

Source : Compiled from WB (2000)

উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে গড় মাথাপিছু আয়ের সাথে গড় মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। যেসকল দেশের মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ বেশী সেসকল দেশের মাথাপিছু গড় আয়ও বেশী।

৩

বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যার বিভিন্ন দিক

৩.১ সূচনা

মানুষের বেঁচে থাকা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। অন্যদিকে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে গ্রীণ হাউস প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য জ্বালানির ব্যবহার অনেকাংশে দায়ী। যে কারণে জ্বালানি বিষয়টি ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্রীয়, উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক এবং বিশ্ব পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

ইদানিংকালে সংবাদপত্রের পাতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার সাথে জ্বালানি সমস্যার বিষয়টিও নিয়মিতভাবে আলোচিত হচ্ছে। জ্বালানি সমস্যা বলতে সাধারণভাবে যা বুঝায় তা হল – চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় জ্বালানি না পাওয়ার বিড়ম্বনা। সম্প্রতিকালে বাংলাদেশে জ্বালানি সমস্যা হিসাবে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় হচ্ছে বিদ্যুতের লোডশেডিং অর্থাৎ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ না পাওয়া, বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি, অপ্রতুল গ্যাস সরবরাহের কারণে কল-কারখানা বন্ধ এবং গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, গ্যাস ও বিদ্যুতের সিস্টেম লস ইত্যাদি। গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীরা এ সমস্যার জন্য খুবই ক্ষুব্ধ হন। বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যা শুধুমাত্র গ্যাস ও বিদ্যুৎ সেক্টরের সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর বিস্তৃতি অন্যান্য জ্বালানি উৎসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যা নিকট অতীতের অবহেলা বা অদক্ষতার জন্য হঠাৎ করে সৃষ্ট একটি সমস্যা নয় যে সরকার পরিবর্তন হলে বা মন্ত্রী পরিবর্তন করে এর দ্রুত সমাধান করা যাবে। নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যা ভূ-রাজনৈতিক, রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থ-সামাজিক আবর্তে পরিবেষ্টিত একটি জটিল সমস্যা। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত তাদের উচিত এ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণগুলো অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এনার্জি সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অধীনে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন হয়। এ কারণে নিরবচ্ছিন্নভাবে এ ধরনের কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমঝোতা একান্ত কাম্য।

৩.২ ভূ-রাজনৈতিক সমস্যা

স্বাধীনতার পরে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) বাস্তবায়ন শুরু করে তখন হঠাৎ করে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এবং বাংলাদেশের

অর্থনীতিতে যে প্রভাব পড়ে তা সামাল দিতে প্রায় ১০-১২ বছর সময় লেগে যায়। বিশ্ব বাজারের তেল সংকটের সমস্যার সামাল দিতে দ্রুততার সাথে নিজস্ব গ্যাস ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা ধারাবাহিকভাবে এখন পর্যন্ত চলে আসছে।

৩.৩ রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক সমস্যা

অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত সহায়ক এ কথা এনার্জি সেক্টরের উন্নয়নের জন্য প্রযোজ্য। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা একটি স্বাধীন দেশের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়ক নয়। বর্তমান বিশ্বে দক্ষতার সাথে বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য চৌকস প্রশাসকের চেয়ে বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী দক্ষ ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন অনেক বেশি। উদাহরণ স্বরূপ, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুবাদে এনার্জি মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পান তিনি কিভাবে তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দেশের এনার্জি সম্পদ উন্নয়নের জন্য কাজে লাগাতে পারবেন তা পাঠক বিবেচনা করবেন। দক্ষ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য যে কোন পেশার একজন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন সেক্টর ও মন্ত্রণালয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতার চেয়ে একই সেক্টরে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করা যুক্তিসঙ্গত ও উপযোগী। আলোচ্য বিষয়টি জন প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হল। জানামতে জাপানে এবং ভারতের কোন কোন সেক্টরে এ ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

৩.৪ অর্থনৈতিক সমস্যা

এনার্জি সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যয়বহুল। যে কারণে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। স্বাধীনতার পরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সকল সরকার এনার্জি সেক্টরের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করেছেন। গড়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কোন কোন বছর মোট বরাদ্দের ২০% এরও বেশি অর্থ এনার্জি সেক্টরের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে একদিকে বরাদ্দকৃত এ অর্থ যেমন যথেষ্ট ছিল না, অন্যদিকে অর্থদাতাদের শর্তানুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে সবসময় এনার্জি সেক্টরের বিভিন্ন সাব-সেক্টরের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সুষম হয়নি। এর ফলে অর্থ ব্যয় হলেও আনুপাতিক হারে ফল পাওয়া যায়নি। নব্বই দশকের প্রথম দিক থেকে অতিরিক্ত সিস্টেম লসের কারণে প্রধান প্রধান অর্থ দাতারা বৈদেশিক ঋণ প্রদান বন্ধ করে দিলে জ্বালানি খাতের সমস্যা বিশেষত বিদ্যুৎ সেক্টরের সমস্যা ক্রমান্বয়ে প্রকটরূপ ধারণ করে।

৩.৫ প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা

এনার্জি সেক্টরের প্রকল্পগুলো অতিমাত্রায় প্রযুক্তি নির্ভর। যে কারণে প্রায় সকল ক্ষেত্রে বিদেশী প্রযুক্তি এবং বিদেশী উপদেষ্টার ওপর নির্ভর করে প্রকল্প বাস্তাবায়ন করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হলে বিদেশী উপদেষ্টাদের ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমানো সম্ভব হত। স্বাধীনতার ৩০ বছর পরেও এনার্জি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, গ্যাসের ব্যবহার ইত্যাদি সহজ বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। বিদেশী উপদেষ্টারা সব সময়ে আমাদের দেশের স্বার্থে উপদেশ প্রদান করেছে বা করবে এরূপ ধারণা কতটা যৌক্তিক?

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এনার্জি সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আকার ও লোকবল বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষতার সাথে এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলো চালাবার জন্য সংস্কার সাধনের কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড দক্ষতার সাথে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করলেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। বড় ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য দৃঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক সমঝোতা প্রয়োজন।

৩.৬ আর্থ-সামাজিক সমস্যা

কৃষি উন্নয়নের জন্য অপেক্ষাকৃত কম দামে বিদ্যুৎ, ডিজেল ও রাসায়নিক সার সরবরাহ করা ছাড়া এনার্জি সেক্টরে অন্যান্য ভোক্তাদের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচিত হয়নি। যদিও সচরাচর বলা হয়ে থাকে যে মানুষ উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু। এনার্জি সেক্টরের ক্ষেত্রে মোট জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশ[১] গ্যাস ও বিদ্যুতের ন্যায় উন্নত এনার্জির সুবিধা ভোগ করছে। এই ভোক্তাদের মধ্যে যারা রাজধানীর অধিবাসী তারা সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান, তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শহর, থানা-শহর ও গ্রামের অধিবাসীরা।

দেশের সরকার, রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তারা দু'টি কারণে গ্যাস ও বিদ্যুতের সমস্যা নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা করেন। প্রথম কারণটি অর্থনৈতিক। এনার্জি অর্থনৈতিক অগ্রগতির চালিকা শক্তি। গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ-এর সংকট হলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয় সে কারণে এনার্জির অবিরাম ও

---

[১] ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ১২.৫ কোটি। গড়ে প্রতি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫.৬ ধরলে মোট পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় ২.২৩ কোটি। ১৯৯৭ সালে মোট গ্যাস ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ছিল ৭,৬৫,২৮২ অর্থাৎ মোট পরিবারের ৩.৪৩%। মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ছিল ৩৪,৫৮,৬৭৫ যা মোট পরিবার ১৫.৫%।

নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় কারণ রাজনৈতিক, দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর যে ক্ষুদ্র অংশ গ্যাস ও বিদ্যুতের ভোক্তা তারা সংখ্যায় কম হলেও দেশের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ভোক্তাগোষ্ঠী। এরা নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজেদের চাহিদা মিটাবার জন্য কম খরচে উন্নতমানের জ্বালানি ব্যবহারে আগ্রহী। রাজনৈতিক শক্তি এদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে আগ্রহী।

৩.৭ গৃহস্থালি খাতের জ্বালানি সমস্যা

আমাদের দেশে গৃহস্থালি (domestic), কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যিক, পরিবহন খাতে বিভিন্ন ধরনের এনার্জি ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া রাসায়নিক সার উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালি ছাড়া অন্য সকল খাতে এনার্জির সরবরাহ ও চাহিদা বাজার ব্যবস্থার আওতায় পরিচালিত হয়। গৃহস্থালি খাতে ব্যবহৃত এনার্জির বহুলাংশ মিটানো হয় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বায়োমাস জ্বালানি (কাঠ, পাটখড়ি, খড়, তুষ, শুকনা গোবর ইত্যাদি) দ্বারা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব জ্বালানি প্রচলিত বাজার ব্যবস্থার আওতায় সরবরাহ হয় না। মানুষের বেঁচে থাকা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য গৃহস্থালি খাতের জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান প্রভৃতি মানুষের মৌলিক চাহিদা হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। অন্ন ও বাসস্থানের সাথে জ্বালানিও একটি অভিন্ন মৌলিক চাহিদা। খাদ্যদ্রব্য রান্না করার জন্য এবং রাতের আঁধারে বাসস্থানের আলোর জন্য জ্বালানির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, যাদের রান্নার জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ নেই তারা রান্নার জন্য প্রধানত বায়োমাস জ্বালানি (কাঠ, খড়, তুষ, পাটখড়ি, আখের ছোবড়া, লতা-পাতা, শুকনা গোবর ইত্যাদি) ব্যবহার করেন।

বাংলাদেশের জ্বালানি সম্পদের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সকল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কর্মসূচি কমার্শিয়াল এনার্জি বা বাণিজ্যিক জ্বালানির (গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি) উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত। কিন্তু বায়োমাস বা ট্রাডিশনাল জ্বালানির পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। যেহেতু এসকল জ্বালানির বেশিরভাগ বাজার ব্যবস্থার বাইরে সরবরাহ এবং ভোগ করা হয় সে কারণে এ জ্বালানিগুলোকে কখনও কখনও নন-কমার্শিয়াল এনার্জিও বলা হয়।

দেশের এনার্জি পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তারা হয়তো জানেন না বা জানার আগ্রহ নেই যে, বৃহৎ জনগোষ্ঠী তাদের বাঁচার প্রয়োজনে কি জ্বালানি ব্যবহার করেন। তাদের জ্বালানি ব্যবহার ব্যবস্থা টেকসই কি-না? যদি জানতেন তাহলে সরকারি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থে এ বিষয়ে নিয়মিতভাবে সঠিক তথ্য প্রকাশিত হত। ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর সময় সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে,

সে সময় বাংলাদেশের ১৪.৫% পরিবার বাতি জ্বালাবার জন্য বিদ্যুৎ এবং ৮৫.৬% পরিবার কেরোসিন ব্যবহার করতেন। অন্যদিকে রান্নার জন্য মোট পরিবারের ২.৪% গ্যাস, ০.৯% বিদ্যুৎ, ০.৬% কেরোসিন এবং ৯৪.২% বায়োমাস জ্বালানি ব্যবহার করতেন। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে মোট কেরোসিন ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৫,৪০,০০০ টন। মোটামুটি হিসাব করলে এ কেরোসিন দিয়ে দেশের বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন ৮৪.৫% পরিবারের বাতি জ্বালাবার এবং ২% পরিবারের রান্নার প্রয়োজন মেটে। এমতাবস্থায় ১৯৯৭ সালে মোটামুটি হিসাবে গৃহস্থালি কাজে জ্বালানির ব্যবহারের প্রকারভেদে মোট পরিবারের বন্টন ছিল : রান্নার জন্য গ্যাস ৩.৪%, কেরোসিন ২.০% এবং বায়োমাস জ্বালানি ৯৪.৬%। রান্নার জন্য নির্ধারিত মূল্যে বিদ্যুতের ব্যবহার ধরা হয়নি। বাতি জ্বালাবার জন্য মোট পরিবারের বন্টন বিদ্যুৎ ১৫.৫% এবং কেরোসিন ৮৪.৫%।

বায়োমাস জ্বালানি বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত মোট জ্বালানির প্রায় ৬০-৭০% প্রয়োজন মিটায়। এনার্জি পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তারা ধরে নেন যে, বাংলাদেশের মোট জ্বালানি চাহিদার যে অংশ কমার্শিয়াল জ্বালানি দ্বারা মিটানো সম্ভব হয় না জনগণ নিজেরা বায়োমাস জ্বালানি দিয়ে সে চাহিদা পূরণ করে থাকেন। কর্মকর্তাদের এ ধারণাটা সত্য, তবে বায়োমাস ফুয়েল নবায়নযোগ্য হলেও অফুরন্ত নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু জমির প্রাপ্যতা কমে যাওয়ার কারণে যেমন খাদ্য সমস্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে জমিভিত্তিক বায়োমাস জ্বালানি প্রাপ্যতার মাথাপিছু পরিমাণও দিন দিন কমে যাচ্ছে। দেশের পরিকল্পনাবিদদের এ বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, অপরিকল্পিতভাবে বায়োমাস জ্বালানি ব্যবহারের পরিবেশগত প্রভাব দেশের টেকসই উন্নয়নের (sustainable development) জন্য হুমকি স্বরূপ। অপরিকল্পিতভাবে বায়োমাস জ্বালানি ব্যবহারের পরিণাম হিসাবে যা ঘটছে তার কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হল।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি বছর নবায়নযোগ্যভাবে উৎপাদিত জ্বালানি কাঠের পরিমাণ দেশের মোট চাহিদার তুলনায় খুবই কম। পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে সরকার রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে জ্বালানির জন্য গাছ কাটার নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে কোন কোন অঞ্চলের জনগণ বাড়তি দাম পাওয়ার জন্য নবায়নযোগ্য (renewable) পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণ জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য বেশি সংখ্যক নিজস্ব গাছ কাটছে। যে কারণে ক্রমাগতভাবে জ্বালানিকাঠ আহরণের ফলে গাছের পরিমাণ কমছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জ্বালানি কাঠের অভাবের কারণে বহুবছর ধরে জ্বালানি কাঠের পরিবর্তে কৃষি পণ্যের উপজাত দ্রব্যাদি (খড়, তুষ ইত্যাদি) এবং গোবর বিকল্প জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গরিব মানুষেরা ৬০-৭০ বছর আগের কেটে ফেলা সুন্দরী গাছের শিকড় মাটির ৮-১০ ফুট নীচ থেকে তুলে জ্বালানি হিসাবে বিক্রি করছে। ঢাকার আশেপাশের বনাঞ্চলে শুকনো মৌসুমে গরিব মানুষেরা ঝাড়ু ও বস্তা নিয়ে বনের শুকনো পাতা কুড়িয়ে তাদের

প্রয়োজনীয় জ্বালানির ন্যূনতম চাহিদা মেটাচ্ছে। ঝাড়ু দিয়ে বনের পাতা নিয়ে যাওয়ার কারণে ভূমি ক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে বনের ক্ষতি হচ্ছে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বায়োমাস জ্বালানির অবস্থা সবচেয়ে সংকটাপন্ন কেননা এ অঞ্চলে মাথাপিছু বনভূমি সবচেয়ে কম। এ অঞ্চলে অত্যধিক পরিমাণে কৃষি উপজাত দ্রব্যাদি এবং গোবর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের ফল কৃষি জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে ও কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভবিষ্যতে বায়োমাস জ্বালানি দিয়ে টেকসইভাবে জনগণের জ্বালানির চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে না। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে দেশের মোট জ্বালানির চাহিদা মিটাতে বায়োমাস জ্বালানি অংশের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস এবং বাণিজ্যিক জ্বালানির অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হবে। এমতাবস্থায় দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে অঞ্চলভিত্তিক জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে পরিকল্পিতভাবে বায়োমাস এবং বাণিজ্যিক জ্বালানি উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৩.৮ জ্বালানি সম্বন্ধীয় সঠিক তথ্যের অভাব

১৯৭৪ সালে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় বাংলাদেশের প্রথম এনার্জি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি স্টাডিজ (BES) নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় (GOB 1976)। উক্ত স্টাডি রিপোর্টে অন্যান্য বাণিজ্যিক জ্বালানির সাথে সর্বপ্রথম দেশের বিভিন্ন ধরনের ট্রেডিশনাল এনার্জির সরবরাহ সম্বন্ধে মোটামুটি হিসাব করা হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে প্রকাশিত বিভিন্ন পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থে ট্রেডিশনাল এনার্জির বার্ষিক সরবরাহের পরিমাণ অনুমান করা হয়েছে ২.৩ থেকে ২.৬ কোটি টন। এরপর ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত বর্ষ গ্রন্থে ১৯৮৯ সালের জন্য ট্রেডিশনাল জ্বালানির পরিমাণ ধরা হয়েছে ২.৩৮ কোটি টন এবং ১৯৯০ সালে তা বাড়িয়ে ধরা হয় ৪.৩৫ কোটি টন এবং ১৯৯৭ সালে এর পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫.৭৪ কোটি টন (GOB 1998a)। ১৯৮৯ এবং ১৯৯০ সালের মধ্যে এমন কি ঘটলো যে বায়োমাস জ্বালানি সরবরাহের পরিমাণ এক বছরে ১.৯৭ কোটি টন (৮৩%) বৃদ্ধি পেল? সুষ্ঠু জ্বালানি পরিকল্পনার জন্য সঠিক তথ্য অপরিহার্য। এনার্জি সেক্টরে তথ্যের দুর্বলতার এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ আছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ ১৯৮৯-এর ২৭৬ পৃষ্ঠায় সে সময় আবিষ্কৃত ১৪টি গ্যাস ফিল্ডের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১২.৬১০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট উল্লেখ করা হয়েছে (GOB 1989)। পরিসংখ্যান গ্রন্থ ১৯৯১-এর ৩১৮ পৃষ্ঠায় সে সময় আবিষ্কৃত ১৭টি গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলন যোগ্য মজুদের পরিমাণ ৩৬.৮২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট উল্লেখ করা হয়েছে (GOB 1991)। পরিসংখ্যান গ্রন্থ ১৯৯৩-এর ২৯৫ পৃষ্ঠায় সে সময় আবিষ্কৃত মোট ১৭টি গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস-ইন-প্লেস এবং উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ যথাক্রমে ২১.৩৫৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং ১২.৪১৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (GOB 1994)।

সরকারি পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন বছরের প্রকাশিত গ্রন্থে গ্যাসের মজুদ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হলে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পরিসংখ্যান গ্রন্থ ১৯৯৯-এর পৃষ্ঠা ২৩৫ অনুসারে মোট ২০টি গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১৩.৭৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে ১৯৯৯ সালের জুন পর্যন্ত উত্তোলন করা হয়েছিল ৩.৫৯২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সে অনুসারে ১৯৯৯ জুলাই মাসে মোট উত্তোলনযোগ্য মজুদ ছিল ১০.১২৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (GOB 2001)।

৩.৯ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্বালানি সমস্যা

বাংলাদেশে টেকসই জ্বালানি পরিকল্পনা ও উন্নয়নের আর একটি নাজুক দিক হচ্ছে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম জ্বালানির প্রয়োজন মিটানোর জন্য সাহায্য ও সহযোগিতার অভাব। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন মৌলিক চাহিদার সমস্যার সাথে জ্বালানি সমস্যাও একটি বড় সমস্যা। শহরের বস্তিবাসী দরিদ্র মানুষ গ্রামের সমগোত্রীয় দরিদ্রের চেয়ে জ্বালানি সমস্যায় বেশি সংকটাপন্ন। Household Expenditure Survey-এর তথ্য অনুসারে শহরের উচ্চ আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠী জ্বালানি ক্রয়ের জন্য তাদের মাসিক আয়ের ৪% থেকে ৬% ব্যয় করে থাকে। অন্যদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের স্বল্প আয়ের ৬% থেকে ৮% জ্বালানি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতে হয় (GOB 1998)। এ ছাড়া উচ্চ আয়ভুক্ত পরিবার অপেক্ষাকৃত কম দামের এবং উন্নত মানের জ্বালানি (যেমন গ্যাস ও বিদ্যুৎ) ব্যবহার করে। অন্যদিকে, নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারবর্গ অপেক্ষকৃত বেশি দামের এবং নিম্নমানের জ্বালানি ব্যবহার করে থাকে (যেমন জ্বালানি কাঠ, গোবর, কেরোসিন ইত্যাদি)। যেখানে গরিব পরিবারের সদস্যরা তাদের স্বল্প আয় দিয়ে তাদের বাঁচার জন্য ন্যূনতম খাদ্য ক্যালোরির চাহিদা মিটাতে পারে না, সেই আয়ের একটি বড় অংশ যখন জ্বালানির জন্য ব্যয় করা হয় তখন তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্য ক্রয় করা সম্ভব হয় না।

গবেষণা কর্মের সূত্রে লেখকের জীবনে গরিব মানুষের জ্বালানি সমস্যার অনেক ঘটনা দেখার সুযোগ হয়েছে। এ ধরনের মর্মস্পর্শী ঘটনা তাকে গরিব মানুষের জ্বালানি সমস্যা সমাধানের পক্ষে মত সৃষ্টি করতে প্রেরণা যোগাচ্ছে। এর কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

স্বাধীনতার পর রেশনে কম দামে চাল বিক্রি হত। একবার মিয়ানমার থেকে আমদানি করা কতকটা বাদামী রংয়ের চাল রেশনে বিক্রি করা হয়েছিল। গরিব মানুষ সে চাল রেশনের চেয়ে কিছু কম দামে বাজারে বিক্রি করে বাজার থেকে একটু বেশি দামে দেশী চাল কিনছিল। বিষয়টি লেখকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। আলাপ করে জানা গিয়েছিল যে, রেশনের সে চাল রান্না করতে দেশীয় চালের তুলনায় অনেক বেশি জ্বালানির প্রয়োজন হয়। যে কারণে সার্বিকভাবে খাদ্য (চাল এবং জ্বালানি) খাতে কিছুটা ব্যয় কমানোর জন্য তারা দেশী চাল কিনেছিল। অনুসন্ধিৎসার জবাবে

জানিয়েছিল যে, এ চাল রান্নার জন্য অমাপা (unmetered) গ্যাসের দরকার। যাদের বাসায় গ্যাস নেই তারা লাকড়ি দিয়ে এ চাল রান্না করলে খরচ বেশি পড়ে।

ইডেন কলেজের দেয়ালে একজন বয়স্কা মহিলা গোবরের চটা শুকাচ্ছিলেন। লেখকের ধারণা ছিল যে মহিলা তার নিজের রান্নার জ্বালানির জন্য শুকনা গোবর ব্যবহার করেন। একদিন দেখা গেল যে, মহিলা বস্তাভরে শুকনা গোবর অন্য একজন মহিলার নিকট বিক্রি করছে। প্রথম বিক্রেতা মহিলাকে গোবর বিক্রির কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেছিলেন যে, বিক্রির টাকা দিয়ে খাবার কিনবেন। পরবর্তী প্রশ্ন ছিল তিনি নিজে কি দিয়ে রান্না করেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, পলাশীর মোড়ে ডাস্টবিন থেকে কিছু দাহ্য পদার্থ সংগ্রহ করে শুকিয়ে তা দিয়ে রান্না করেন। একটু দূরেই শুকানোর অপেক্ষায় বিছিয়ে রাখা তার জ্বালানির নমুনা চোখে পড়েছিল, দেখে খুব কষ্ট লেগেছিল। তাকে অনুসরণ করে তার ঘরে গিয়ে দেখা গিয়েছিল যে তার চলতি বেলার রান্নার জ্বালানি ছিল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি থেকে ফেলে দেয়া সিনথেটিক কাপড়ের ছোট ছোট টুকরো। আগুনের তাপে কাপড়ের টুকরাগুলো পুড়ে যে দুর্গন্ধ হচ্ছিল তাতে লেখকের পক্ষে সেখানে বেশি সময় দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না। যে মহিলা বস্তায় গোবর কিনছিলেন তাকে গোবর কেনার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন যে, লাকড়ির চেয়ে খরচ কম পড়ে, তাই তিনি শুকনো গোবর দিয়ে রান্না করেন। তিনি কি কাজ করেন জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, ছাদ পিটাবার সর্দারনীর কাজ করেন। প্রথম জীবনে কি করতেন জানতে চাইলে জানালেন নরসিংদীতে কাপড় বুনতেন, বয়সের ভারে চোখের জ্যোতি কমে যাওয়ায় কাপড় বোনা ছেড়ে ছাদ পিটানোর কাজ ধরেছেন।

গ্রামের এক গরিব পরিবারে এক মহিলাকে দেখা গিয়েছিলো যে তিনি কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে পাওয়া গম কোন মতে চুলায় ভেজে, পাটায় পিশে, পানি দিয়ে গুলিয়ে নিজে খাচ্ছেন ও বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছেন। গম থেকে আটা করে রুটি বানিয়ে খাওয়ার সময়, সামর্থ্য ও জ্বালানি কোনটাই তার ছিল না।

একবার টেকনাফে রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্পে অন্য ঘটনা চোখে পড়েছিলো। UNHCR-এর অনুদানে রিফিউজিদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যসামগ্রীর সাথে রান্নার জন্য অনুপাত অনুসারে তুষের তৈরি লাকড়ি দেয়া হচ্ছিল। লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে ঠিকাদার ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের কাছে লাকড়ি সরবরাহ করছে তার লোকেরা পুনরায় রিফিউজিদের কাছ থেকে তুষের লাকড়ি কিনে আবার অফিসিয়াল চ্যানেলে বিক্রি করছে। আলাপ করে জানা গিয়েছিলো যে, কোন কোন পরিবার আশেপাশের এলাকা থেকে জ্বালানি কুড়িয়ে এনে রান্নার কাজ চালায়। আবার কোন কোন পরিবার সতর্কতার সাথে প্রাপ্ত জ্বালানি ব্যবহার করে কিছুটা জ্বালানি সাশ্রয় করে তা বিক্রি করে যে পয়সা পায় তা দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করে।

বার বার চুলা জ্বালালে ও নিভালে অনেক জ্বালানি খরচ হয়। সে কারণে অনেক গরিব পরিবারকে জ্বালানি বাঁচাবার জন্য এক বেলা রান্না করে তিন বেলা খেতে দেখা

গিয়েছে। অনেক গরিব পরিবারকে কেরোসিনের অভাবের জন্য দিনের আলো থাকতে থাকতে রাতের খাবার সমাপন করার ঘটনাও চোখে পড়েছে।

ভিক্ষার অভাব দুর্ভিক্ষ শব্দটি বাংলা ভাষায় সাধারণত খাদ্য অভাবকে বুঝায়। জ্বালানির অভাবে যদি খাদ্য রান্না না করা যায় তবে তাকে এক শব্দে কি বলা হবে তা জানা নেই। তবে তাদের যে অভাব প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে তা লেখকের মনে গভীর দাগ কেটেছে। যে সকল গরিব পরিবারের ভাগ্যে গ্যাস অথবা বিদ্যুতের সংযোগ পাওয়া সম্ভব হয়নি তাদের জ্বালানি সংকটের অবস্থার কিছু বিবরণ উপরে দেয়া হল। এবারে গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গরিব পরিবারের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

রান্নার কাজে যারা গ্যাস ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে সিঙ্গেল বার্ণার ব্যবহারকারীদেরকে নিম্ন আয়ভুক্ত এবং ডাবল বার্ণার ব্যবহারকারীদেরকে উচ্চ আয়ভুক্ত পরিবার হিসাবে গণ্য করা হয়। অনেক গরিব পরিবার একই বার্ণার ব্যবহার করে একজনের পর একজন রান্নার কাজ সারেন।

পিডিবি, ডেসা ও ডেসকোর আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত গৃহস্থালি কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের সর্বনিম্ন মাসিক বিদ্যুৎ বিল ১১৫/-। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত পারিবারিক কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের সর্বনিম্ন মাসিক বিদ্যুৎ বিল ৬০/-। পিডিবি'র কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড যদি অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারের জন্য মাসিক সর্বনিম্ন ৬০/- বিল ধার্য করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে তবে অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের এর চেয়ে বেশি হারে মাসিক সর্বনিম্ন বিল চার্জ করা কতটা যুক্তিসঙ্গত তা পর্যালোচনা করা উচিত। টেলিফোন বিলের ন্যায় উচ্চ আয় এবং সর্বনিম্ন আয়ভুক্ত সকল পরিবারের জন্য প্রতিমাসে ২০/- টাকা ডিমান্ড চার্জ ধার্য করে বিদ্যুতের ব্যবহারের হিসাব অনুসারে বিল করা হলে নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারের মাসিক বিদ্যুৎ বিল ৬০/- এর কম হত। অন্যদিকে সকল গ্রাহকের জন্য প্রতি মাসে ২০ ডিমান্ড চার্জ ধরা হলে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলোও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত না। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারের বিদ্যুৎ বিল কিছুটা বাড়তো।

৩.১০ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্বালানি সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার ও প্রতিবন্ধকতা

দেশে অতীতে এমন একটা সময় ছিল যখন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে উদ্যোগীদের কমিউনিস্ট বলা হত এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের বৈষম্য তুলে ধরলে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যায়িত করা হোত। সরকারি প্রশাসন এ দু'ধরনের উদ্যোগীদের প্রয়োজনবোধে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে জেলে পুরে রাখত। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের সংবিধানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থে কয়েকটি মৌলিক ধারা সংযোজন করা হয়েছে (GOB 1990)।

> *সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ ঃ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে – কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।*
>
> *সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ (১) ঃ সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।*
>
> *সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ (২) ঃ মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।*

সংবিধানের এ মূল্যবান অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি রেখে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যতগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে সবক'টি দলিলেই দারিদ্র্য বিমোচন করাকে উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত ১৯৯৩ সালে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ২০০২ সালের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সার্কভুক্ত দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানগণ অঙ্গীকার করেছেন। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) এর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টের অন্তর্নিহিত বাণী হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন (UNDP 1994)। সংক্ষেপে দারিদ্র্য বিমোচন শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায় নয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত উন্নয়নের দর্শন।

স্বাধীনতার ৩০ বছর পরেও দেশে এখনও কিছু কিছু মানুষের মনে অতীতের কালোছায়া বিরাজমান। যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জ্বালানি সমস্যার ব্যবধান এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্বালানি সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করাটাও ভাল মনে করেন না। লেখকের মতে জাতীয় সুষম নীতির জন্য এ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে অবশ্যই দারিদ্র্য দূর করতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্বালানি সমস্যার সমাধান করা দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি অংশ মাত্র।

দরিদ্রদের জ্বালানি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব করা হলে প্রশ্ন ওঠে যে, গরিবদের জন্য বিশেষ প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জটিল। কথাটা হয়তো বা সত্য, তবে সম্পূর্ণ সত্য নয়। বাংলাদেশে দরিদ্রদের উদ্দেশ্যে প্রণীত অনেক সফল কর্মসূচির উদাহরণ রয়েছে। বাংলাদেশে অনেক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO) বিভিন্ন সেক্টরে উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছে। তবে জানামতে কোন এনজিও এখন পর্যন্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এনার্জি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। বরং ইদানিংকালে দেশে ও বিদেশে সুনাম অর্জনকারী কিছু কিছু এনজিও সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য বায়োগ্যাস প্লান্ট, সৌরশক্তি ও

বায়ুশক্তির প্রযুক্তি বাজারজাত করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রযুক্তিগুলো এত ব্যয় বহুল যে, আমাদের দেশে উচ্চ আয়ভুক্ত পরিবারবর্গ ছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী এর সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। তাছাড়া এ ধরনের প্রযুক্তি থেকে প্রাপ্ত এনার্জি গরিবের বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম এনার্জির চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে না। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্বালানি সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞানের দীনতা সমস্যা সমাধানের প্রধান অন্তরায় বলে মনে হয়।

৪

বাংলাদেশে জ্বালানি ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশের কমার্শিয়াল এনার্জি যেমন কয়লা, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং নন-কমার্শিয়াল এনার্জি যেমন বায়োমাস জ্বালানি (কাঠ, কৃষি বর্জ্য, গোবর ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো –

৪.১ নীতি নির্ধারণ

মন্ত্রী পরিষদ জ্বালানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করে থাকে। বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুমোদিত ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি ১৯৯৬ সালের ১৪ জানুয়ারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে (GOB 1996)। সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ইন্ডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারদের (IPP) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি ঘোষণা করেছে (GOB 1996a)।

৪.২ কমার্শিয়াল এনার্জি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

পরিকল্পনা কমিশনের ইন্ডাস্ট্রি এন্ড এনার্জি ডিভিশন এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এজেন্সির সহযোগিতায় কমার্শিয়াল এনার্জির সার্বিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এনার্জি সেক্টরের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য চারটি উইং কাজ করে (১) অয়েল, গ্যাস এবং ন্যাচারাল রিসোর্সেস, (২) পাওয়ার (৩) রুরাল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি এবং (৪) এনার্জি মডেলিং এন্ড ইকোনোমিক উইং। ইন্ডাস্ট্রি এন্ড এনার্জি ডিভিশনের ডিভিশন চীফ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য সার্বিক পরিকল্পনার দায়িত্ব পালন করেন।

৪.৩ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধরনের কমার্শিয়াল এনার্জির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এনার্জি মন্ত্রণালয়ে ২টি ডিভিশন আছে (চিত্র ৪.১)। এনার্জি ডিভিশনের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। পাওয়ার ডিভিশনের অধীনস্থ সংস্থা সমূহ বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।

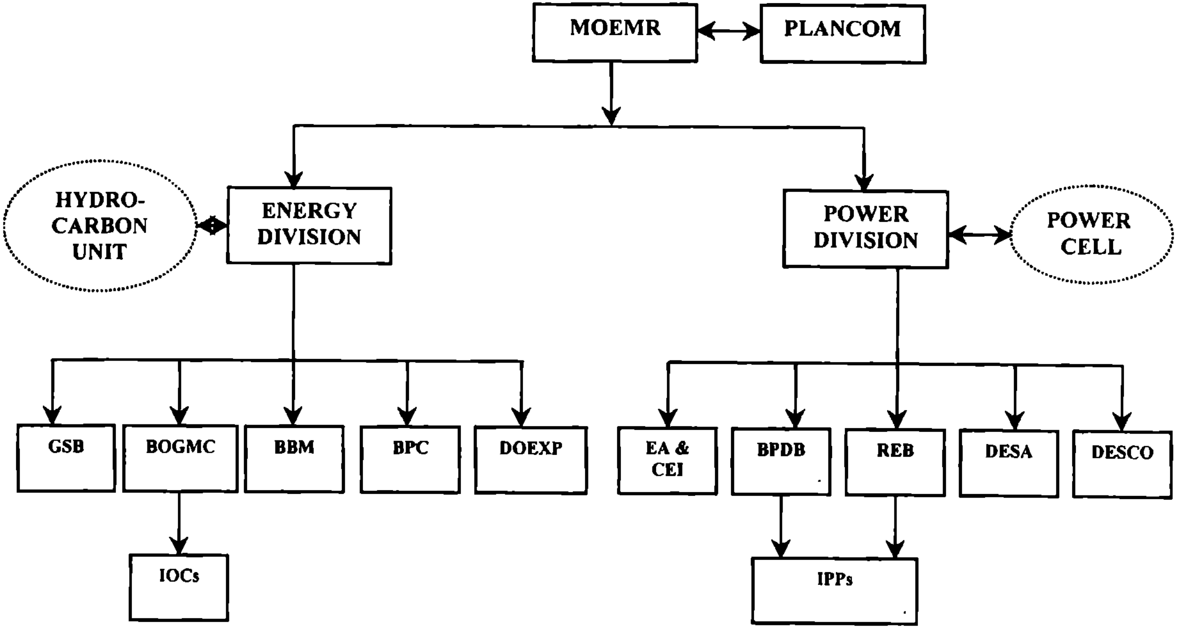
MOEMR
PLANCOM
HYDRO-CARBON UNIT
ENERGY DIVISION
POWER DIVISION
POWER CELL
GSB
BOGMC
BBM
BPC
DOEXP
EA & CEI
BPDB
REB
DESA
DESCO
IOCs
IPPs

চিত্র ৪.১ : কমার্শিয়াল এনার্জি পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এনার্জি ডিভিশনের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম সমূহ হলো–হাইড্রোকার্বন ইউনিট (Hydrocarbon Unit) – তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়নে মন্ত্রণালয়কে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ (GSB) – খনিজ পদার্থ জরিপ, অনুসন্ধান এবং ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধান করা। বাংলাদেশ ব্যুরো অফ মাইনস (BBM) – আবিষ্কৃত খনিজ পদার্থ লীজ প্রদান করা। বাংলাদেশ অয়েল, গ্যাস এন্ড মিনারাল কর্পোরেশন (BOGMC) বা পেট্রোবাংলা – কয়লা, পীট, তেল, গ্যাস, কঠিন শিলা অনুসন্ধান, উৎপাদন ও বিপণন করা। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (BPC) – অপরিশোধিত তেল আমদানি, পরিশোধন ও বিপণন এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি ও বিপণন এবং উদ্বৃত্ত পেট্রোলিয়াম পণ্য রপ্তানিকরণ। ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সপ্লোসিভ (DOEX) – বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স প্রদান।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পাওয়ার ডিভিশনের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম সমূহ হলো – পাওয়ার সেল (Power Cell) – ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারদের অংশগ্রহণ সম্বন্ধীয় নীতি প্রণয়ন এবং অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান। ইলেকট্রিক্যাল এডভাইজার এন্ড চীফ ইলেকট্রিক্যাল ইন্সপেক্টর (EA&CEI) – ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট অনুসারে বিদ্যুতের উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণ এবং নিরাপদ ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স প্রদান। বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (BPDB) – বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিদ্যুৎ বিতরণ। রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (REB) – নির্দিষ্টকৃত পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ এবং পল্লী এলাকায় ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করণ। ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (DESA) – ঢাকা জেলার নির্দিষ্টকৃত এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ। ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (DESCO) – ঢাকা শহরের নির্দিষ্টকৃত এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ।

৪.৪ প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

পেট্রোবাংলা (BOGMC) কয়লা, পীট, তেল, গ্যাস, কঠিন শিলা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিভিন্ন কোম্পানির সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। পেট্রোবাংলা একটি কর্পোরেশন এবং এর অধীনস্থ ১১টি স্বতন্ত্র সংস্থা কোম্পানি আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত (চিত্র ৪.২)। এ কোম্পানিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো –

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ (MGMCL) – মধ্যপাড়ায় প্রাপ্ত কঠিন শিলা উত্তোলন ও বিপণন। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ (BCMCL) –

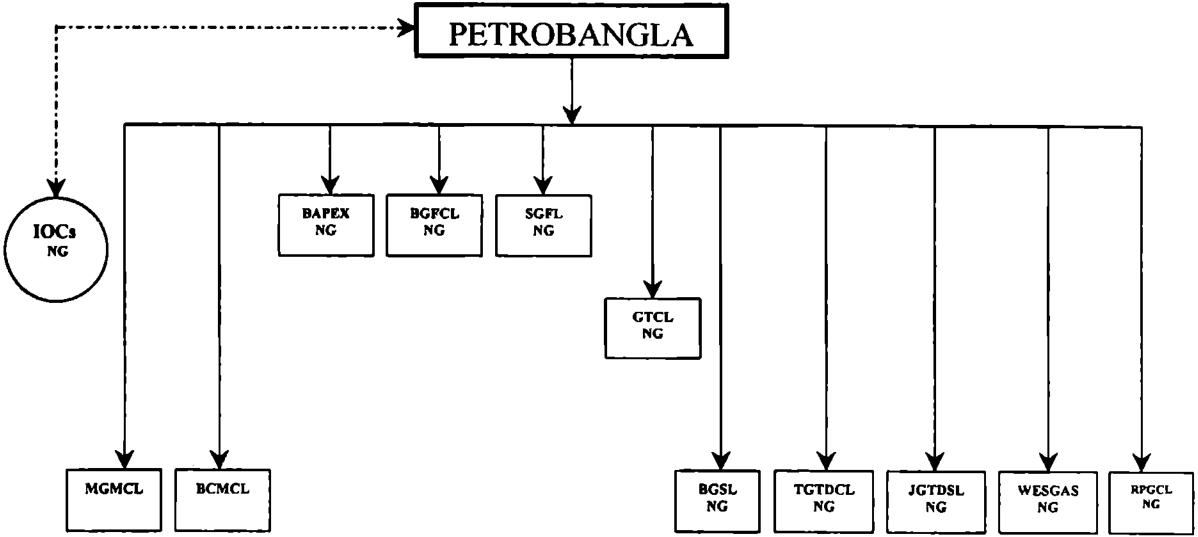
PETROBANGLA
IOCs
NG
MGMCL
BCMCL
BAPEX
NG
BGFCL
NG
SGFL
NG
GTCL
NG
BGSL
NG
TGTDCL
NG
JGTDSL
NG
WESGAS
NG
RPGCL
NG

চিত্র ৪.২ : প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা

বড়পুকুরিয়ার ভূগর্ভে প্রাপ্ত কয়লা উত্তোলন এবং বিপণন। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি লিঃ (BAPEX) – তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান। সম্প্রতি এ কোম্পানিকে তেল ও গ্যাস উৎপাদন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ (BGFCL) এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ (SGFL) – নির্দিষ্টকৃত ভৌগলিক এলাকায় অবস্থিত গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা করণ। গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ (GTCL) – গ্যাস ট্রান্সমিশনের কাজে নিয়োজিত। বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিঃ (BGSL), তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (TGTDCL), জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস লিঃ (JGTDSL) এবং ওয়েস্টার্ণ রিজিয়ন গ্যাস কোম্পানি লিঃ (WESGAS) – নির্দিষ্টকৃত ভৌগলিক এলাকায় গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশনে নিয়োজিত। রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ (RPGCL) – এলপিজি উৎপাদন ও পরিবহণ এবং যানবাহনে ব্যবহারের জন্য কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (CNG) বিপণনের কাজে নিয়োজিত। ইন্টারন্যাশনাল অয়েল কোম্পানিগুলো (IOC) –বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি প্রডাকশন শেয়ারিং চুক্তির আওতায় পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। পেট্রোবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে IOC এর কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়ন করে এবং IOC এর নিকট থেকে পাওয়া এবং ক্রয় করা প্রাকৃতিক গ্যাস বিভিন্ন ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির মাধ্যমে বিতরণ ও বিপণনের ব্যবস্থা করে থাকে।

৪.৫ অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তেল আমদানি এবং বিপণন

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (BPC) একটি কর্পোরেশন। এর আওতাধীন বিভিন্ন কোম্পানির সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল (চিত্র ৪.৩) : ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিঃ (ERL) – আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেল শোধন করে বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য উৎপাদন করে। এসফালটিক বিটুমেন প্লান্ট লিঃ (ABPL) –ERL থেকে প্রাপ্ত feedstock ব্যবহার করে বিটুমিন তৈরি করে মার্কেটিং কোম্পানিগুলোকে সরবরাহ করে। লিকিউফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস লিঃ (LPGL) –ERL থেকে প্রাপ্ত feedstock ব্যবহার করে এলপিজি উৎপাদন করে স্টীলের সিলিন্ডারে ভরে মার্কেটিং কোম্পানিগুলোকে সরবরাহ করে। ইস্টার্ণ লুব ব্লেন্ডিং প্লান্ট (ELBP) এবং (SAOCL) – BPC-এর আমদানি করা লুব্রিকেটিং অয়েল ব্লেন্ডিং করে ফর্মুলা অনুসারে লুব অয়েল তৈরি করে মার্কেটিং কোম্পানিকে সরবরাহ করে। পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিঃ (POCL), যমুনা অয়েল কোম্পানি লিঃ (JOCL) এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ (MPL) – ERL কর্তৃক উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ভোক্তাদের কাছে বিপণন করে।

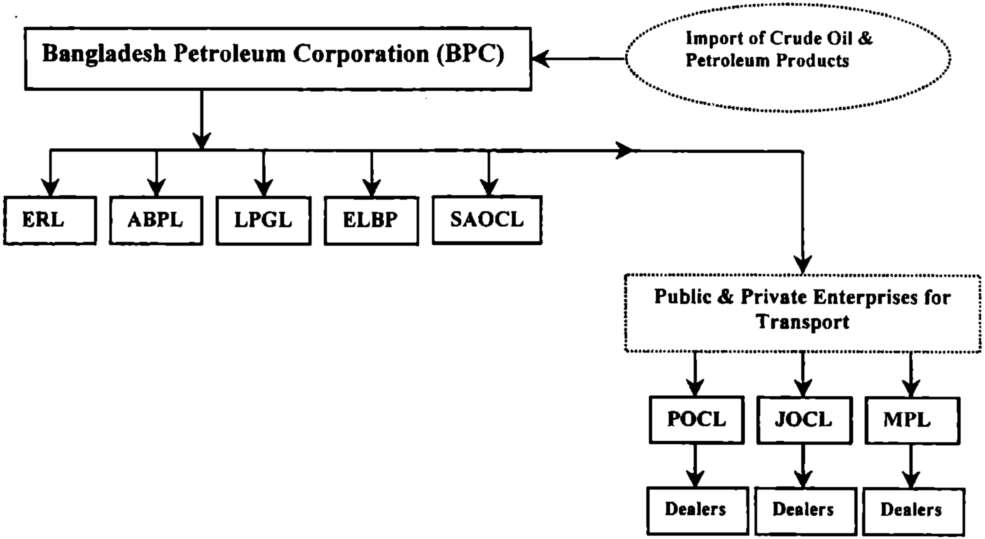
Bangladesh Petroleum Corporation (BPC)
Import of Crude Oil & Petroleum Products
ERL
ABPL
LPGL
ELBP
SAOCL
Public & Private Enterprises for Transport
POCL
JOCL
MPL
Dealers
Dealers
Dealers

চিত্র ৪.৩ : পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, পরিশোধন ও বিপণনে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

৪.৬ বায়োমাস জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার এক্সটেনশন (DAE) এবং অন্যান্য সংস্থা দেশের সাধারণ কৃষকদের কৃষি পণ্য উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করে। কৃষকরা জ্বালানি কাঠের অভাবের কারণে কৃষি পণ্যের সাথে উৎপাদিত বর্জ্যের কিছু অংশ বায়োমাস জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং বনবিভাগ (DOF) সরকারি মালিকানাধীন বনের বৃক্ষসম্পদ ব্যবস্থাপনা করে এবং দেশের সাধারণ মানুষকে নিজস্ব জমিতে বৃক্ষ রোপণে সহায়তা করে। সাধারণ মানুষের উৎপাদিত বৃক্ষ সম্পদ দেশে ব্যবহৃত জ্বালানি কাঠের বেশিরভাগ সরবরাহ করে। সরকারি বনভূমি থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি কাঠের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। উভয় উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি কাঠ মোট বায়োমাস জ্বালানি চাহিদার অংশবিশেষ মিটায়। যে কারণে ফসলের বর্জ্য ও গোবর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ লাইভস্টক (DOL) কৃষকদের পশুসম্পদ উন্নয়নে পরোক্ষ সহায়তা করে। কৃষকদের নিজস্ব পশু সম্পদ জমি চাষের জন্য পশুশক্তির বেশিরভাগ চাহিদা মিটায়। কোন কোন স্থানে পশুশক্তির ঘাটতির কারণে যান্ত্রিক চাষ প্রচলন করা হয়েছে। গবাদী পশুর গোবর সার অথবা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বায়োমাস জ্বালানি (কাঠ, কৃষি-বর্জ্য ও গোবর) উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় সাধারণ কৃষকদের ভূমিকা মুখ্য, সরকারি সহায়তার ভূমিকা গৌণ।

৪.৭ রিনিউয়েবল এনার্জি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে বায়োমাস ফুয়েল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দেশের সাধারণ মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (BPDB) কাপ্তাই হাইড্রোপাওয়ার প্লান্ট ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত। ইদানীংকালে REB-এর মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এলাকায় ফটোভোলটাইক সেলের প্রযুক্তি প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য পল্লী এলাকায় REB-এর এই প্রযুক্তি প্রচলনের পরিকল্পনা আছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (NGO), বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ধরনের নিউরিনিউয়েবল এনার্জি টেকনোলজি প্রচলনের জন্য চেষ্টা করছে। এর মধ্যে উন্নত চুলা, বায়োগ্যাস প্লান্ট, সোলার ফটোভোলটাইক সেল অন্যতম। এখন পর্যন্ত নিউরিনিউয়েবল এনার্জি টেকনোলজি মোট জ্বালানি চাহিদার খুবই নগণ্য অংশ মিটায়।

৪.৮ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (BPDB) দেশের অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। ইদানীংকালে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (BPDB) ও

রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ডকে (REB) বিক্রি করছে। দেশী ও বিদেশী এসকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (IPP) নামে পরিচিত। দক্ষতার সাথে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন করার জন্য পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ (PGCB) নামে একটি স্বতন্ত্র কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (BPDB), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (DESA) ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (DESCO) নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় নির্দিষ্টকৃত এলাকায় ভোক্তাদের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (REB), পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (PBS) সমূহের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ভোক্তাদের কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে।

৫

বাংলাদেশে প্রাপ্ত/ব্যবহৃত জ্বালানি সম্পদ

বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন জ্বালানি হচ্ছে কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ, বায়োমাস জ্বালানি (কাঠ, কৃষি বর্জ্য, গোবর ইত্যাদি)। এর মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস ও বায়োমাস্ জ্বালানি স্থানীয় উৎস থেকে পাওয়া যায়। কয়লা ও তেলের চাহিদা আমদানী করে মিটাতে হয়। দেশে প্রাপ্ত কয়লা আগামী ২০০৩ সাল নাগাদ ব্যবহার শুরু হতে পারে। কাপ্তাই হাইড্রোপাওয়ার প্লান্ট থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ মোট বিদ্যুতের চাহিদার কিছু অংশ মিটাতে সক্ষম। বেশিরভাগ বিদ্যুৎ প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালিয়ে উৎপাদন করা হয়, কিছু অংশ তেল জ্বালিয়ে উৎপাদন করা হয়। উপরোক্ত জ্বালানির মধ্যে কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুৎ কমার্শিয়াল জ্বালানি নামে পরিচিত এবং বায়োমাস জ্বালানি ট্রাডিশনাল জ্বালানি নামে পরিচিত। বায়োমাস জ্বালানিকে কখনও কখনও নন-কমার্শিয়াল জ্বালানি বলে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের জ্বালানির বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

৫.১ কয়লা

বগুড়ার জামালগঞ্জে, রংপুরের খালাশপীরে এবং দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। জামালগঞ্জে আবিষ্কৃত মোট কয়লা সম্পদের পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন টন। এ কয়লা মাটির ১০০০ মিটার গভীরে অবস্থিত হওয়ায় এর উত্তোলন অর্থনৈতিক বিবেচনায় লাভজনক নয়। খালাশপীরে ২০০-৪৫০ মিটার গভীরে ৪৫০ মিলিয়ন টন কয়লা সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। বড়পুকুরিয়াতে মাটির ১৫০-৩৫০ মিটার গভীরতায় ৩০০ মিলিয়ন টন কয়লা সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির কয়লা উত্তোলনের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। হিসাব করা হয়েছে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে প্রতি বছর ১ মিলিয়ন টন হিসাবে ৭০ বছরে মোট ৭০ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে। এখানে উল্লেখ্য যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে প্রাপ্ত মোট ৩০০ মিলিয়ন টন কয়লার মাত্র ২৩.৩% কয়লা উত্তোলনযোগ্য। অর্থাৎ খনিতে প্রাপ্ত কয়লা সম্পদের ৭৬.৭% মাটির নিচে ছেড়ে আসতে হবে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশের মতে উপরে বর্ণিত কয়লা খনি ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে কয়লা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে জ্বালানির চাহিদা মিটাবার জন্য কয়লার প্রাপ্যতা নিরূপণের সময় অনেকে খনিতে আবিষ্কৃত মোট কয়লা সম্পদের পরিমাণকে উল্লেখ করে থাকেন। বাস্তবে উত্তোলনযোগ্য কয়লার পরিমাণকে কয়লার প্রাপ্যতা হিসাবে উল্লেখ করা উচিত। কেননা যে কয়লা উঠানো সম্ভব হবে না সে কয়লার হিসাব করার কোন যুক্তি নাই।

৫.২ পীট

ফরিদপুর, খুলনা এবং সিলেট অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠের ১ থেকে ৩ মিটার গভীরে ২.৫ মিটার পুরু পীটের স্তর আছে। মোট আবিষ্কৃত শুকনো পীট সম্পদের পরিমাণ ফরিদপুরে ১৫০ মিলিয়ন টন, খুলনায় ৮ মিলিয়ন টন, এবং সিলেটে ১৩ মিলিয়ন টন। ফরিদপুরে আবিষ্কৃত পীট উত্তোলনের জন্য পেট্রোবাংলা, মাদারিপুরের বাঘিয়া বিলে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিল। পীট তুলতে গেলে উপরের মাটি তুলে ফেলতে বেশ খরচ পড়ে, অন্যদিকে পীট তোলার সময় জমিতে কৃষি কাজ ব্যাহত হয় এবং পীট তোলার পর জমির গভীরতা বেড়ে গেলে সে জমি পুনরায় কৃষি কাজে ব্যবহার করা যায় না। এ সকল কারণে পীট তোলা লাভজনক বিবেচিত হয়নি। ফলে বাণিজ্যিকভাবে পীট উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে না।

৫.৩ তেল

১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে বাংলাদেশের প্রথম তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। উক্ত তেল ক্ষেত্রে মোট তেল সম্পদের পরিমাণ ছিল ৮.২ মিলিয়ন ব্যারেল। এর মধ্যে জুলাই ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে ০.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল উত্তোলনের পর কারিগরি কারণে তেল উঠানো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে (GOB 1998a)।

৫.৪ প্রাকৃতিক গ্যাস

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিসটিকস্-এর প্রকাশনায় (GOB 2001) বাংলাদেশে মোট ২০টি গ্যাস ক্ষেত্রের যথাস্থানে প্রাপ্ত এবং উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়েছে যথাক্রমে ২৩.০৯৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং ১৩.৭৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (ছক ৫.১)। সে অনুসারে বিবিয়ানা ও মৌলভীবাজার গ্যাস ক্ষেত্র দুইটিতে যথাস্থানে প্রাপ্ত এবং উত্তোলনযোগ্য মোট গ্যাসের পরিমাণ যথাক্রমে ৩.৬৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং ২.৮০১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট যোগ করা হলে বাংলাদেশের ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের যথাস্থানে প্রাপ্ত এবং উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল ২৬.৭৪৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং ১৬.৫৯১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। পেট্রোবাংলা কর্তৃক ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের (জালালাবাদ, ছাতক, কামতা, ফেনী) মজুদের পরিমাণ সংশোধন করায় বর্তমানে ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের যথাস্থানে প্রাপ্ত এবং উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ হয়েছে যথাক্রমে ২৪.৭৪৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং ১৫.৫০৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (ছক ৫.২)। ২০০০ সালের জুন পর্যন্ত ৩.৯০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছিল (Petrobangla 2001)। ২০০০ সালের জুলাই মাসে নীট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ছিল ১১.৬১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এখানে লক্ষণীয় যে, গ্যাস ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মোট ২৪.৭৫৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের ৬২.৬৭% ছিল উত্তোলনযোগ্য। পরবর্তী আলোচনায় পেট্রোবাংলা কর্তৃক ঘোষিত নীট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১১.৬১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন

কোম্পানি এবং যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে কর্তৃক দাবীকৃত অতিরিক্ত গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সারণী ৫.১ : বাংলাদেশের ২০টি গ্যাস ক্ষেত্রের প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	আবিষ্কারের বছর (বিসিএফ)	প্রাথমিক গ্যাস ইন প্লেস (বিসিএফ)	প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ (বিসিএফ)	পুঞ্জিভূত উৎপাদন (জুন ২০০০) (বিসিএফ)	অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ (জুলাই ২০০০) (বিসিএফ)
১.	বাখরাবাদ	১৯৬৯	১,৪৩২	৮৬৭	৫৮০.২৭	২৮৬.৭৩
২.	হবিগঞ্জ	১৯৬৩	৩,৬৬৯	১,৮৯৫	৭৮৩.৬৭	১,১১১.৩৩
৩.	কৈলাশটিলা	১৯৬২	৩,৬৫৭	২,৫২৯	২১৫.২৭	২,৩১৩.৭৩
৪.	রশিদপুর	১৯৬০	২,২৪২	১,৩০৯	১৭৯.৮১	১,১২৯.১৯
৫.	সিলেট	১৯৫৫	৪৪৪	২৬৬	১৬৫.১৮	১০০.৮২
৬.	তিতাস	১৯৬২	৪,১৩৮	২,১০০	১,৭২১.১৮	৩৭৮.৮২
৭.	নরসিংদি	১৯৯০	১৯৪	১২৬	২৬.০৩	৯৯.৯৭
৮.	মেঘনা	১৯৯০	১৫৯	১০৪	২০.১১	৮৩.৮৯
৯.	সাঙ্গু	১৯৯৬	১,০৩১	৮৪৮	৬৯.২৭	৭৭৮.৭৩
১০.	সালদানদী	১৯৯৬	২০০	১৪০	১২.০৬	১২৭.৯৪
১১.	জালালাবাদ	১৯৮৯	১,৫০০	৯০০	৩৭.১১	৭৭৭.৮৯
১২.	বিয়ানীবাজার	১৯৮১	২৪৩	১৬৭	৪.৫৫	১৬২.৪৫
(ক)	সাব-টোটাল (১-১২)		১৮,৯০৯	১১,২৫১	৩,৮১৪.৫১	৭,৩৫১.৪৯
১৩.	বেগমগঞ্জ	১৯৭৭	২৫	১৫	০	১৫
১৪.	ফেঞ্চুগঞ্জ	১৯৮৮	৩৫০	২১০	০	২১০
১৫.	কুতুবদিয়া	১৯৭৭	৭৮০	৪৬৮	০	৪৬৮
১৬.	শাহবাজপুর	১৯৯৫	৫১৪	৩৩৩	০	৩৩৩
১৭.	সেমুতাং	১৯৬৯	১৬৪	৯৮	০	৯৮
(খ)	সাব-টোটাল (১৩-১৯)		১.৮৩৩	১,১২৪	০	৩,৯২৫.০
১৮.	ছাতক	১৯৫৯	১,৯০০	১,১৪০	২৬.৪৬	২৪১.৫৩৬
১৯.	কামতা	১৯৮১	৩২৫	১৯৫	২১.১০	১.৯
২০.	ফেনী	১৯৮১	১৩২	৮০	৩৯.৫১	৮৫.৪৯০৫
(গ)	সাব-টোটাল (২০-২২)		২,৩৫৭	১,৪১৫	৮৭.০৭	৩২৮.৯২৬৫
	মোট (ক+খ+গ) বিসিএফ		২৩,০৯৯	১৩,৭৯০	৩৯০১.৫৮	১১৬০৫.৪২
	মোট (ক+খ+গ) টিসিএফ		২৩.০৯৯	১৩.৭৯	৩.৯০	১১.৬১

১-১২ : গ্যাস ক্ষেত্রে উৎপাদন চলছে, ১৩-১৭ : গ্যাস ক্ষেত্র উৎপাদন করা হয়নি, ১৮-২০ : গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করা হয়েছে।

Source : GOB (1998) এবং প্রডাকশন এন্ড মার্কেটিং ডিভিশন, পেট্রোবাংলা (Quoted in Petrobangla 2001)।

সারণী ৫.২ : বাংলাদেশের ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	আবিষ্কারের বছর	প্রাথমিক গ্যাস ইন প্লেস (বিসিএফ)	প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ (বিসিএক্ষ)	পুঞ্জিভূত উৎপাদন জুন ২০০০ (বিসিএফ)	অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ (জুলাই ২০০০) (বিসিএফ)
১.	বাখরাবাদ	১৯৬৯	১.৪৩২	৮৬৭	৫৮০.২৭	২৮৬.৭৩
২.	হবিগঞ্জ	১৯৬৩	৩.৬৬৯	১,৮৯৫	৭৮৩.৬৭	১.১১১.৩৩
৩.	কৈলাশটিলা	১৯৬২	৩,৬৫৭	২,৫২৯	২১৫.২৭	২,৩১৩.৭৩
৪.	রশিদপুর	১৯৬০	২,২৪২	১,৩০৯	১৭৯.৮১	১,১২৯.১৯
৫.	সিলেট	১৯৫৫	৪৪৪	২৬৬	১৬৫.১৮	১০০.৮২
৬.	তিতাস	১৯৬২	৪,১৩৮	২,১০০	১.৭২১.১৮	৩৭৮.৮২
৭.	নরসিংদি	১৯৯০	১৯৪	১২৬	২৬.০৩	৯৯.৯৭
৮.	মেঘনা	১৯৯০	১৫৯	১০৪	২০.১১	৮৩.৮৯
৯.	সাঙ্গু	১৯৯৬	১,০৩১	৮৪৮	৬৯.২৭	৭৭৮.৭৩
১০.	সালদানদী	১৯৯৬	২০০	১৪০	১২.০৬	১২৭.৯৪
১১.	জালালাবাদ	১৯৮৯	১,১৯৫	৮১৫	৩৭.১১	৭৭৭.৮৯
১২.	বিয়ানীবাজার	১৯৮১	২৪৩	১৬৭	৪.৫৫	১৬২.৪৫
(ক)	সাব-টোটাল (১-১২)		১৮,৬০৪	১১.১৬৬	৩,৮১৪.৫১	৭.৩৫১.৪৯
১৩.	বেগমগঞ্জ	১৯৭৭	২৫	১৫	০	১৫
১৪.	ফেঞ্চুগঞ্জ	১৯৮৮	৩৫০	২১০	০	২১০
১৫.	কুতুবদিয়া	১৯৭৭	৭৮০	৪৬৮	০	৪৬৮
১৬.	শাহবাজপুর	১৯৯৫	৫১৪	৩৩৩	০	৩৩৩
১৭.	সেমুতাং	১৯৬৯	১৬৪	৯৮	০	৯৮
১৮.	বিবিয়ানা	১৯৯৮	৩,১৫০	২,৪০১	০	২৪০১
১৯.	মৌলভীবাজার	১৯৯৯	৫০০	৪০০	০	৪০০
(খ)	সাব-টোটাল (১৩-১৯)		৫,৪৮৩	৩,৯২৫	০	৩৯২৫.০
২০.	ছাতক	১৯৫৯	৪৪৭	২৬৮	২৬.৪৬	২৪১.৫৩৬
২১.	কামতা	১৯৮১	৩৩	২৩	২১.১০	১.৯
২২.	ফেনী	১৯৮১	১৭৮	১২৫	৩৯.৫১	৮৫.৪৯০৫
(গ)	সাব-টোটাল (২০-২২)		৬৫৮	৪১৬	৮৭.০৭	৩২৮.৯২৬৫
	মোট (ক+খ+গ) বিসিএফ		২৪.৭৪৫	১৫,৫০৭	৩,৯০১.৫৮	১১৬০৫.৪২
	মোট (ক+খ+গ) টিসিএফ		২৪.৭৪৫	১৫.৫০৭	৩.৯০	১১.৬১

১-১২ : গ্যাস ক্ষেত্রে উৎপাদন চলছে, ১৩-১৯ : গ্যাস ক্ষেত্র উৎপাদন করা হয়নি, ২০-২২ : গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করা হয়েছে।

Source : প্রডাকশন এন্ড মার্কেটিং ডিভিশন, পেট্রোবাংলা (Quoted in Petrobangla 2001) ।

৫.৫ হাইড্রোপাওয়ার

পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লান-১৯৯৫ (BPDB 1995)-এর মূল্যায়ন অনুসারে বাংলাদেশে মোট হাইড্রোপাওয়ার উৎপাদনের সম্ভাবনা হচ্ছে ৭৫৫ মেগাওয়াট (বছরে আনুমানিক ১৫০০ গিগাওয়াট ঘন্টা)। ইতোমধ্যে কাপ্তাইয়ে স্থাপিত ৫টি হাইড্রোপাওয়ার প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট। ভবিষ্যতে কাপ্তাইয়ে অতিরিক্ত ৪টি ইউনিট স্থাপন করে ৩০০ মেগাওয়াট উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে। এছাড়া সাংগু এবং মাতামুহুরীতে যথাক্রমে ১৫০ মেগাওয়াট এবং ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। অতিরিক্ত ৫২৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করতে হলে এতদঅঞ্চলে প্লাবিত জমির আয়তন বেড়ে যাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে বিদ্যমান আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যার বিষয় বিবেচনা করে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না।

৫.৬ বায়োমাস জ্বালানি

বায়োমাস জ্বালানির প্রধান উৎস হচ্ছে জমি। বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের খাদ্য উৎপাদন, গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদন, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী আহরণ ও জ্বালানির প্রয়োজন মিটাবার জন্য বায়োমাস সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ক্রমান্বয়ে সীমিত জমির ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে সকল জমি থেকে বায়োমাস জ্বালানি পাওয়া যায় তা হলো বনভূমি, অকৃষি জমি, গ্রামাঞ্চলের বনভূমি, আবাদযোগ্য অনাবাদি ভূমি, বর্তমানের অনাবাদি জমি এবং কৃষি জমি। প্রত্যেক প্রকার জমিতে কি পরিমাণ বায়োমাস উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদিত বায়োমাসের কত অংশ বায়োমাস জ্বালানি হিসাবে পাওয়া যাবে তার হিসাব নিরূপণ করা সম্ভব হলে বায়োমাস জ্বালানি সরবরাহের পরিমাণ হিসাব করা যাবে।

৫.৭ পশুসম্পদ ও গোবর জ্বালানি

বাংলাদেশে মোট ২২ মিলিয়ন গবাদি পশুর মধ্যে প্রায় ১০.৫ মিলিয়ন জমি চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। জমি চাষের জন্য বলদ গরুর অভাবে কৃষি মৌসুমে দেশের বিভিন্ন স্থানে গাভী ব্যবহার করা হয়। কোন কোন স্থানে কৃষি কাজের জন্য গবাদি পশুর ঘাটতি মিটাতে পাওয়ার টিলার এবং ট্রাক্টর ব্যবহার করা হয়। মোট ২২ মিলিয়ন গবাদি পশু থেকে প্রাপ্ত গোবরের বেশ কিছু অংশ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৫.৮ রিনিউয়েবল এনার্জী টেকনোলজী

৫.৮.১ মিনি হাইড্রো পাওয়ার

মিনি হাইড্রো পাওয়ার ওয়ার্কিং কমিটির রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে মিনি হাইড্রো প্রযুক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা বছরে ১০ গিগাওয়াট ঘন্টা। চীন দেশীয়

বিশেষজ্ঞরা সিলেটের মাধবকুন্ডে, চট্টগ্রামের মহামায়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাওয়ালাক – এ তিন জায়গায় মিনি হাইড্রো প্লান্ট স্থাপনের সুপারিশ করেছে। এ প্লান্ট থেকে বছরে ২.৩ গিগাওয়াট-ঘন্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের বেশীরভাগ এলাকা সমতল ভূমি হওয়ায় মিনি হাইড্রো পাওয়ার জেনারেশনের সম্ভাবনা খুবই সীমিত।

৫.৮.২ সৌরশক্তি

শীত ও গ্রীষ্মকালে গড়ে প্রতিদিন প্রতি বর্গমিটারে যথাক্রমে ৫.০৫ কিলোওয়াট ঘন্টা এবং ৮.৭৬ কিলোওয়াট ঘন্টা সৌরশক্তি পাওয়া যায়। এ সৌরশক্তি বাংলাদেশের ভৌগোলিক এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কৃষি জমিতে ফসল, জলাভূমিতে মাছ এবং বনভূমি ও অকৃষি জমিতে গাছ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে সৌরশক্তি ব্যবহার করে লবণ উৎপাদন, ফসল শুকানো, কাপড় শুকানো এবং মাছ শুকানো হয়। এমতাবস্থায় ফটোভোলটাইক প্রযুক্তি, সোলার ওয়াটার হিটার, সোলার ড্রায়ার ব্যবহার করে অতিরিক্ত কতটুকু সৌরশক্তি আহরণ করা সম্ভব হবে তা ব্যবহারকারী পর্যায়ে মূল্যায়ন করে নিরূপণ করতে হবে।

৫.৮.৩ বায়ুশক্তি

বাংলাদেশে বায়ু প্রবাহের গতি সকল ঋতুতে সমান নয়। বায়ু-চালিত টারবাইন ব্যবহার করে পানি পাম্প করা বা বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। বায়ু প্রবাহের গতি কম হওয়ার কারণে (বায়ুর গড় গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ৩ মিটারের কম) সফলতা লাভ করা যায়নি। প্রচলিত পদ্ধতিতে বাতাসের শক্তি ব্যবহার করে পাল তোলা নৌকা চালানো হয় এবং শস্যের বর্জ্য আলাদা করা হয়।

৫.৮.৪ স্রোতশক্তি

পৃথিবীর কোন কোন দেশে স্রোতশক্তি ব্যবহার করে ওয়াটার টারবাইন চালিয়ে পানি পাম্প করার প্রচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে স্রোতশক্তি ব্যবহার করে উপকূলীয় অঞ্চলে নৌযান চালানো হয়।

৫.৯ আমদানীকৃত জ্বালানি

৫.৯.১ জ্বালানি তেল

প্রতি বছরের জ্বালানি তেলের চাহিদা আমদানি করে মিটানো হয়। ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেডের পরিশোধন ক্ষমতা অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ (বছর ১.৫ মিলিয়ন টন) ক্রুড অয়েল আমদানী করে দেশের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপন্ন করা হয়। ইস্টার্ণ রিফাইনারিতে উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের অতিরিক্ত পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা সরাসরি আমদানি করে মিটানো হয়। ইস্টার্ণ রিফাইনারিতে

পরিশোধনের সময় দেশের চাহিদার অতিরিক্ত কোন পণ্য উৎপাদিত হলে তা রপ্তানি করা হয়। ২০০১ সালে মোট আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম (ক্রুড এবং পণ্য) এর পরিমাণ ছিল ৩.৪ মিলিয়ন টন। দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের সময় প্রাপ্ত ন্যাচারাল গ্যাস লিকুইড (NGL) মোট পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদার কিছু অংশ (২.০%) মিটায়।

৫.৯.২ কয়লা

ইটের ভাটা এবং ঢালাই কারখানায় ব্যবহারের জন্য প্রতি বছর প্রায় ০.৫ মিলিয়ন টন কয়লা আমদানি করা হয়।

৫.১০ মন্তব্য

বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রগুলো এবং হাইড্রোপাওয়ারের উৎস দেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। সহজ, সস্তা এবং নির্ভরযোগ্য জ্বালানি প্রাপ্তির জন্য দেশের পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় দেশের পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। দেশের দুই অঞ্চলের মধ্যে জ্বালানি সরবরাহে সমতা আনার লক্ষ্যে আশির দশকে দুই অঞ্চলের বিদ্যুৎ গ্রিড সংযোজিত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু যমুনা ব্রিজ নির্মাণের পর ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে সর্বপ্রথম গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। ২০০৩ সালে বড়পুকুরিয়া কয়লার খনিতে কয়লা উৎপাদন শুরু হলে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের জ্বালানি সরবরাহ অবস্থা কিছুটা উন্নতি হবে। দেশের দু'অঞ্চলের মধ্যে জ্বালানি সরবরাহের বৈষম্য দূর করার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

৬

বাংলাদেশে জ্বালানি ব্যবহার, ভবিষ্যৎ চাহিদা ও সরবরাহের কৌশল

৬.১ প্রাইমারি কমার্শিয়াল এনার্জির ব্যবহার

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস-এর তথ্য অনুসারে ১৯৯৪-৯৫ সালে বিভিন্ন ধরনের কমার্শিয়াল এনার্জি ব্যবহারের হিসাব সারণী ৬.১-এ দেখানো হয়েছে (GOB 1999)।

সারণী ৬.১ : বাংলাদেশে প্রাইমারী কমার্শিয়াল এনার্জির ব্যবহার (১৯৯৫)

জ্বালানির প্রকার	পরিমাণ	পরিমাণ (পেটাজুল)	পরিমাণ (এমটিওই)	%
পেট্রোলিয়াম পণ্য	২.৪১ মিলিয়ন টন	১০২.৯১	২.৪১	২৮.১
প্রাকৃতিক গ্যাস	০.২৪৭ টিসিএফ	২৪৪.৫৩	৫.৭৩	৬৬.৮
হাইড্রোপাওয়ার	৩৭২ গিগাওয়াট ঘন্টা	১.৩৪	০.০৩	০.৩
কয়লা	০.৬৪২ মিলিয়ন টন	১৭.৩৩	০.৪১	৪.৮
মোট		৩৬৬.১১	৮.৫৮	১০০.০

৬.২ প্রাইমারি বায়োমাস জ্বালানি ব্যবহার

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস-এর উপাত্ত অনুসারে ১৯৯৫ সালে বিভিন্ন ধরনের বায়োমাস জ্বালানি সরবরাহের হিসাব সারণী ৬.২ এ উপস্থান করা হয়েছে।

সারণী ৬.২ : মোট বায়োমাস জ্বালানির ব্যবহার (১৯৯৫)

জ্বালানির প্রকার	পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	পরিমাণ (পেটাজুল)	পরিমাণ (এমটিওই)	%
জ্বালানি কাঠ	২.১০	৩১.৭১	০.৭৪	৬.০
গোবর	৬.৭০	৭৭.৭২	১.৮২	১৫.০
গাছ ও কৃষি বর্জ্য	৩২.৮৪	৪১০.৫০	৯.৬১	৭৯.০
মোট	৪১.৬৪	৫১৯.৯৩	১২.১৭	১০০.০

বর্তমান গ্রন্থকারের হিসাব অনুসারে বায়োমাস জ্বালানির চাহিদা ও সরবরাহের ব্যালান্স করে ১৯৯৫ সালে মোট বায়োমাস জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ হয় ৬০০ পেটাজুল

(১৪.০৫ এমটিওই)। পরবর্তীতে বায়োমাস জ্বালানির হিসাব পর্যালোচনা করার সময় গ্রন্থকারের হিসাব ধরা হয়েছে।

৬.৩ মোট প্রাইমারি এনার্জি (কমার্শিয়াল এনার্জি এবং বায়োমাস জ্বালানি) ব্যবহার

উপরে উপস্থাপিত উপাত্ত অনুসারে ১৯৯৫ সালে বিভিন্ন ধরনের প্রাইমারি এনার্জি ব্যবহারের হিসাবে সারণী ৬.৩ এবং চিত্র ৬.১-এ দেখানো হয়েছে। ১৯৯৫ সালে মোট জনসংখ্যা ১২০ মিলিয়ন হিসাবে গড় মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৮৯ কেজিওই।

সারণী ৬.৩ : মোট প্রাইমারি এনার্জির ব্যবহার (১৯৯৫)

জ্বালানির প্রকার	পরিমাণ (এমটিওই)	%
পেট্রোলিয়াম পণ্য	২.৪১	১০.৬
প্রাকৃতিক গ্যাস	৫.৭৩	২৫.৩
জল বিদ্যুৎ	০.০৩	০.১৩
কয়লা	০.৪১	১.৮
মোট কমার্শিয়াল এনার্জি	৮.৫৮	৩৭.৮
বায়োমাস	১৪.১	৬২.২
মোট প্রাইমারি জ্বালানি	২২.৬৮	১০০.০

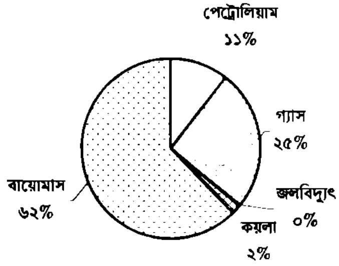

চিত্র ৬.১ :
১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে প্রাইমারি এনার্জির ব্যবহারের শতকরা হিসাব
(মোট এনার্জি=২২.৬৮ এমটিওই)

৬.৪ মোট ফাইনাল এনার্জি (কমার্শিয়াল এনার্জি এবং বায়োমাস জ্বালানি) ব্যবহার

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস কর্তৃক প্রণীত কমার্শিয়াল এনার্জি ব্যবহারের উপাত্ত এবং গ্রন্থকারের বায়োমাস জ্বালানি ব্যবহারের উপাত্ত অনুসারে ১৯৯৫ সালে মোট ফাইনাল এনার্জির (কমার্শিয়াল এনার্জি এবং বায়োমাস ফুয়েল) হিসাব সারণী ৬.৪ এবং চিত্র ৬.২-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৬.৪ : মোট ফাইনাল এনার্জির ব্যবহার (১৯৯৫)

জ্বালানির প্রকার	পরিমাণ	পরিমাণ (পেটাজুল)	পরিমাণ (এমটিওই)	%
পেট্রোলিয়াম পণ্য	২.১৫ মিলিয়ন টন	৯১.৮১	২.১৫	১০.৭
প্রাকৃতিক গ্যাস	০.১২৬৫ টিসিএফ	১২৫.২৪	২.৯৩	১৪.৫
বিদ্যুৎ	৬৯৩৪ গিগাওয়াট ঘন্টা	২৪.৯৬	০.৫৮	২.৯
কয়লা	০.৬৪২ মিলিয়ন টন	১৭.৩৩	০.৪১	২.০
মোট কমার্শিয়াল এনার্জি		২৫৯.৩৪	৬.০৭	৩০.১
বায়োমাস	৬০০ পেটাজুল	৬০০.০০	১৪.১	৬৯.৯
মোট প্রাইমারি জ্বালানি		৮৫৯.৩৪	২০.১৭	১০০.০

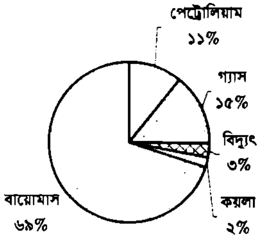

চিত্র ৬.২ :
১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে ফাইনাল এনার্জির ব্যবহারের শতকরা হিসাব
(মোট এনার্জি=২০.১৭ এমটিওই)

৬.৫ গড় মাথাপিছু প্রাইমারি এনার্জি ব্যবহারের তুলনা

বর্তমান গ্রন্থকারের হিসাব অনুসারে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু কমার্শিয়াল ও মোট প্রাইমারি এনার্জি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭১.৫ কেজিওই এবং ১৮৯ কেজিওই। ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (WB 1999) এর হিসাব অনুসারে ১৯৯৫ সালের মাথাপিছু কমার্শিয়াল এনার্জি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৬৭ কেজিওই। উপাত্তের উৎস এবং বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে বর্তমান গ্রন্থকারের সাথে বিশ্ব ব্যাংকের মাথাপিছু জ্বালানির হিসাবের পার্থক্য গ্রহণ করা যায়। আন্তঃদেশীয় উপাত্ত প্রাপ্তির সুবিধার্থে পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংকের উপাত্ত ব্যবহার করে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশের ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬ সালের গড় মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহার এবং গড় মাথাপিছু জিএনপি-এর হিসাব সারণী ৬.৫-এ দেখানো হয়েছে। ১৯৯৫ সালের হিসাবে বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহার (৬৭ কেজিওই) ছিল ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার চেয়ে কম। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে গড় মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহার (১৯৭ কেজিওই) ছিল ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকার ও নেপালের চেয়ে কম। ১৯৯৫ সালের এনার্জির উপাত্ত বিশ্লেষণের সময় শুধুমাত্র কমার্শিয়াল এনার্জি ভিত্তিতে মাথাপিছু জ্বালানি হিসাব করা হয়েছে কিন্তু ১৯৯৬ সালের মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহারের হিসাবের সময় কমার্শিয়াল এনার্জি এবং বায়োমাস জ্বালানির হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে কারণে বাংলাদেশের ১৯৯৬ সালের গড় মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহার ১৯৭ কেজিওই, ১৯৯৫ সালে গড় মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহারের (৬৭ কেজিওই) তুলনায় ছিল ১৯৪% বেশী।

সারণী ৬.৫ : সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশের গড় মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহার এবং গড় মাথাপিছু জিএনপি-এর তুলনা

দেশ	এনার্জি **কিজেওই (১৯৯৫)+**	**জিএনপি ডলার (১৯৯৫)***	এনার্জি **কিজেওই (১৯৯৬)++**	**জিএনপি ডলার (১৯৯৮)++**
বাংলাদেশ	৬৭	২৪০	১৯৭	৩৫০
ভারত	২৬০	৩৪০	৪৭৬	৪৩০
নেপাল	৩৩	২০০	৩২০	২১০
পাকিস্তান	২৪৩	৪৬০	৪৪৬	৪৮০
শ্রীলংকা	১৩৬	৭০০	৩৭১	৮১০

Source : Compiled from World Development Reports: *WB (1997), +WB (1999), ++WB (2000)

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহার ছিল (১৯৭ কেজিওই) মধ্যম আয়ভুক্ত দেশের গড় মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহারের (১৮০১ কেজিওই) চেয়ে, এমনকি নিম্ন আয়ভুক্ত দেশের গড় মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের (৬৪০ কেজিওই) চেয়েও অনেক কম (WB 2000)। গড় মাথাপিছু জিএনপি বৃদ্ধির সাথে গড় মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। উপরের বর্ণনা থেকে বলা যায় যে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ভুক্ত দেশের অবস্থান থেকে উন্নীত করতে হলে গড় মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ ৩.২ গুণ বৃদ্ধি করে ৬৪০ কেজিওই এর মাত্রা অতিক্রম করতে হবে। গড় মাথাপিছু আয় মধ্যম আয়ের সমপর্যায়ে উন্নীত করতে হলে গড় মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ ৯.১ গুণ বৃদ্ধি করে ১৮০১ কেজিওই করতে হবে।

অয়েল এন্ড গ্যাস জার্নালের উপাত্ত অনুসারে ১৯৯৬ সালে পৃথিবীর গড় মাথাপিছু কমার্শিয়াল এনার্জির ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৮১০ কেজিওই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিম গোলার্ধের দেশসমূহের গড় মাথাপিছু কমার্শিয়াল এনার্জির ব্যবহারের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি ৪২২০ কেজিওই এবং আফ্রিকার দেশসমূহের সবচেয়ে কম ৫৯০ কেজিওই (সারণী ২.১)। সারণী ১২.১-এ উপস্থাপিত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু কমার্শিয়াল এনার্জি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৭ কেজিওই। যা ছিল যথাক্রমে আফ্রিকার ও পৃথিবীর গড় মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের ১৩.১% এবং ৪.২৫%। ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ খুবই কম। ভবিষ্যতে এ পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হবে সেদিকে দৃষ্টি রেখে জ্বালানি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

৬.৬ বাংলাদেশে গড় মাথাপিছু কমার্শিয়াল এনার্জির প্রাপ্যতা

বাংলাদেশের ন্যায় ঘনবসতিপূর্ণ দেশে বায়োমাস জ্বালানির সরবরাহ বৃদ্ধি করে ভবিষ্যতে জ্বালানির চাহিদা মিটাবার সম্ভাবনা নেই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কমার্শিয়াল এনার্জির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কমার্শিয়াল এনার্জির প্রাপ্যতা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। মোট কয়লার মজুদ ১৭৫০ মিলিয়ন টনের মধ্যে মাত্র ৭০ মিলিয়ন টন উত্তোলনযোগ্য। মোট গ্যাসের মজুদ ও উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ ছিল ২৪.৭৪৫ টিসিএফ এবং ১৫.৫০৭ টিসিএফ। ২০০০ সালে অবশিষ্ট গ্যাস মজুদ এবং উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০.৮৪৫ টিসিএফ এবং ১১.৬১ টিসিএফ। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে বছরে জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ হতে পারে ৩৫০ গিগাওয়াট ঘন্টা থেকে ১০০০ গিগাওয়াট ঘন্টা পর্যন্ত। পরিবেশগত আর্থসামাজিক কারণে ভবিষ্যতে জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার সম্ভবনা নেই। নির্ভরযোগ্যতার বিবেচনায় মোট উত্তোলনযোগ্য কয়লা এবং গ্যাসের হিসাব ধরে মাথাপিছু জ্বালানির

প্রাপ্যতা হিসাব করা যুক্তিসঙ্গত। মোট জনসংখ্যা ১৩০ মিলিয়ন ধরে ২০০০ সালে মাথাপিছু জীবাশ্ম জ্বালানি ও প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাপ্যতা হয় যথাক্রমে ২৪১০ কেজিওই এবং ২০৭০ কেজিওই।

বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুসারে ১৯৯৬ সালে একটি মধ্যম আয়ের দেশের মাথাপিছু এনার্জি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৮০১ কেজিওই (WB 2000)। বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ হলে প্রাপ্ত জীবাশ্ম জ্বালানি এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে যথাক্রমে ১.৩৪ বছর এবং ১.১৫ বছর চলত। উপরের আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে বাংলাদেশে প্রাপ্ত জীবাশ্ম জ্বালানি এবং প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের উন্নয়নের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট কম।

৬.৭ ভবিষ্যতে জ্বালানির চাহিদা

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি (NEP)-তে ২টি ইকোনমিক গ্রোথ সিনারিও (লো-সিনারিও এবং রেফারেন্স-সিনারিও)-এর জন্য ২০২০ সাল পর্যন্ত জ্বালানির চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। লো-ইকোনমিক সিনারিও এবং রেফারেন্স-ইকোনমিক সিনারিও অনুসারে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ের কমার্শিয়াল এনার্জি চাহিদা সারণী ৬.৬-এ দেখানো হয়েছে। লো-ইকোনমিক সিনারিও এবং রেফারেন্স-ইকোনমিক সিনারিও অনুসারে ২০২০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ২৭২ কেজিওই এবং ৩৮৪ কেজিওই।

সারণী ৬.৬ : ভবিষ্যতে বাংলাদেশে জ্বালানির চাহিদা ও সরবরাহের ব্যালান্স

বিবরণ	একক	১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০২০
জনসংখ্যা	মিলিয়ন	১১৮	১৩০	১৪১	১৫৩	১৬৫	১৭৭
লো-ইকোনমিক সিনারিও	%	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৬.৬৫	৬.৬৫
মাথাপিছু জিএনপি	ডলার	২১৪	২৪২	২৭৬	৩১৭	৩৬৬	৪২৪
মাথাপিছু জ্বালানি	কেজিওই	৬৮	৯২	১২৭	১৫৭	২১৯	২৭২
মোট জ্বালানি	এমটিওই	৮	১২	১৮	২৪	৩৬	৪৮
রেফারেন্স ইকোনমিক সিনারিও	%	৫.৪০	৬.৪	৭.২	৭.৭	৮.২	৮.৭
মাথাপিছু জিএনপি	ডলার	২১৪	২৫৪	৩১৮	৪১৬	৫৬০	৭৭৪
মাথাপিছু জ্বালানি	কেজিওই	৭২	৯৪	১৩১	১৯৪	২৬৯	৩৮৪
মোট জ্বালানি	এমটিওই	৮	১২	১৯	৩১	৪৬	৭২
লো-সিনারিও (ঘাটতি)	এমটিওই	১.৫৩	২.৩২	৮.৩৪	১৪.৩৪	২৬.৩৩	৩৮.৩৪
রেফারেন্স সিনারিও (ঘাটতি)	এমটিওই	১.৯৯	২.৭৭	৯.৭০	২১.১১	৩৬.৬৮	৬১.৮৮

উৎস : জাতীয় জ্বালানি নীতি ১৯৯৬ (GOB 1996)

৬.৮ জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি (NEP)-তে ভবিষ্যতে জ্বালানির চাহিদা মিটাবার জন্য ২টি জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা চিন্তা করা হয়েছে : (১) চলতি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং (২) রেফারেন্স সরবরাহ ব্যবস্থা। চলতি সরবরাহ ব্যবস্থায় ধরা হয়েছিল যে নিজস্ব প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও পীটের উন্নয়ন চলবে। আমদানিকৃত তেল তরল জ্বালানির চাহিদা এবং আমদানিকৃত কয়লা ইটখোলার জ্বালানির চাহিদা মিটাবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিজস্ব প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, হাইড্রোপাওয়ার এবং আমদানিকৃত তেল ব্যবহার করা হবে। জ্বালানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার হবে না। কমার্শিয়াল এনার্জির সাথে সম্পর্কহীনভাবে বায়োমাস জ্বালানি উন্নয়ন ও ব্যবহার চলবে।

চলতি সরবরাহ ব্যবস্থা অনুসারে বাংলাদেশের এনার্জির চাহিদাও সরবরাহ ব্যালান্স সারণী ৬.৬-এ দেখানো হয়েছে। লো-ইকোনমিক সিনারিও অনুসারে ২০০০ সালের এনার্জি ঘাটতি ২.৩২ এমটিওই থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালের ৩৮.৩৪ এমটিওই হবে। রেফারেন্স ইকোনমিক সিনারিও অনুসারে ২০০০ সালে এনার্জি ঘাটতি ২.৭৭ এমটিওই থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালের ৬১.৮৮ এমটিওই হবে। এ প্রসঙ্গে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে বলা হয়েছে যে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি ঘাটতি কমাবার জন্য গুরুত্বের সাথে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তা না হলে আমদানি করে এ ঘাটতি মিটানো অসুবিধা হবে। অন্যদিকে অপরিকল্পিতভাবে বায়োমাস জ্বালানির ব্যবহার পরিবেশের অবক্ষয় ঘটাবে।

চলতি সরবরাহ ব্যবস্থার তুলনায় রেফারেন্স সরবরাহ ব্যবস্থায় তিনটি বিষয়ে জোর দিতে সুপারিশ করা হয়েছে (১) নিজস্ব ননরিনিউয়েবল জ্বালানি অনুসন্ধান, মূল্যায়ন এবং উত্তোলন জোরদারকরণ; (২) জ্বালানি সংরক্ষণের (energy conservation) জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং (৩) টেকসইভাবে বায়োমাস জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কমার্শিয়াল এনার্জি এবং বায়োমাস জ্বালানির সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ। বাস্তবে দেখা যায় যে রেফারেন্স সরবরাহ ব্যবস্থায় ১নং কৌশল অর্থাৎ হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উত্তোলন ব্যবস্থা জোরদার করার ফলে ৫টি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র (শাহবাজপুর, সাঙ্গু, সালদা নদী, বিবিয়ানা, মৌলভী বাজার) আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্তমান জ্বালানি ব্যালান্স, সারণী ৬.৬ উপস্থাপিত জ্বালানি ব্যালান্সের তুলনায় ভিন্ন হবে।

৭

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে[১] মোট ৭টি অধ্যায় আছে (GOB 1996)। প্রথম অধ্যায়ে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এনার্জি সেক্টরের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জ্বালানি সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এনার্জি ব্যবহার সম্বন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ভবিষ্যতে (২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে) এনার্জির চাহিদার বিবরণ দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যৎ জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। জ্বালানি নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ এবং সুপারিশকৃত ৫টি পলিসি সম্বন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির ৭টি অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৭.১ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির প্রথম অধ্যায়ে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৭.১.১ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

অতীতের এনার্জি উন্নয়ন কর্মসূচি ও ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা হয়।

(ক) বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে এনার্জি সেক্টরের সকল ক্ষেত্রে সুষম উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি;

(খ) এনার্জি সেক্টরের উন্নয়নে প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য সহায়ক নীতি প্রণয়ন করা হয়নি;

(গ) নির্ভরযোগ্য এনার্জি সরবরাহের অভাবে এনার্জি ব্যবহারকারী সেক্টরের (শিল্প) উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে;

(ঘ) এনার্জি এজেন্সিগুলোর ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়নি;

---

[১] দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী জ্বালানি নীতি প্রণয়নের লক্ষে সরকার ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সময়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া অনুসারে সরকার ১৮ জুলাই, ১৯৯৩ তারিখে পেট্রোলিয়াম পলিসি এবং ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে পেট্রোলিয়াম পলিসিসহ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি অনুমোদন করে। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে অনুমোদিত ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি (ইংরেজিতে) প্রকাশ করা হয়।

(ঙ) যুক্তিসঙ্গতভাবে এনার্জির মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি;

(চ) দক্ষতার সাথে এনার্জি ব্যবহারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি;

(ছ) বায়োমাস জ্বালানির অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে পরিবেশের অবক্ষয় ঘটেছে;

(জ) গ্রামাঞ্চলের সার্বিক জ্বালানি চাহিদা মিটাবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি;

(ঝ) প্রযুক্তি উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি;

(ঞ) জ্বালানি সেক্টরের দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তি গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে এনার্জির যথাযথ অনুসন্ধান, উৎপাদন, সরবরাহ ও দক্ষতার সাথে ব্যবহারের লক্ষ্যে এবং টেকসইভাবে এনার্জির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়।

৭.১.২ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির উদ্দেশ্য

(১) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল সেক্টরের টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের জন্য এনার্জি সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(২) দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং আর্থ-সামাজিক গ্রুপের এনার্জি চাহিদা মিটাবার ব্যবস্থা করা;

(৩) দেশের সকল ধরনের এনার্জি সম্পদের সর্বোত্তম উন্নয়ন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(৪) এনার্জি ইউটিলিটিগুলোর টেকসই পরিচালনা (sustainable operation) নিশ্চিত করা;

(৫) এনার্জি সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহার (rational use) নিশ্চিত করা;

(৬) এনার্জি ডেভেলপমেন্টের সময় পরিবেশগত বিষয় যথাযথভাবে বিবেচনা করা এবং পরিবেশের ক্ষতিসাধন ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে এনার্জি ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

(৭) এনার্জি সেক্টরের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা।

৭.২ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির অন্যান্য অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর বিবরণ

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বাংলাদেশের এনার্জি সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বাংলাদেশে ব্যবহৃত জ্বালানি সম্পদ সম্বন্ধে বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির চতুর্থ অধ্যায়ে উপস্থাপিত বাংলাদেশে এনার্জির ব্যবহার সম্বন্ধে বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির পঞ্চম অধ্যায়ে উপস্থাপিত ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে জ্বালানি চাহিদা সম্পর্কে বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপস্থাপিত ভবিষ্যতে জ্বালানি সরবরাহ সংশ্লিষ্ট

অবস্থা সম্বন্ধে বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির সপ্তম অধ্যায়ে উপস্থাপিত নীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ও নীতির বিবরণ নিম্নে উস্থাপন করা হল।

৭.৩ নীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

এনার্জি সেক্টরের জন্য ৫টি নীতি (৭.৪ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) প্রণয়নের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে।

(১) উপাত্ত সংগ্রহ : এনার্জি সম্পর্কিত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(২) এনার্জি সম্পদের মূল্যায়ন : এনার্জি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দেশের সকল অঞ্চলে সবধরনের জ্বালানি সম্পদের অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৩) প্রযুক্তি মূল্যায়ন : এনার্জি সেক্টরের উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। যথোপযুক্ত প্রযুক্তি বাছাইয়ের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত দক্ষতা, প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

(৪) গ্যাস ব্যবস্থাপনা : ন্যাশনাল গ্যাস গ্রিড স্থাপন, গ্যাস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলো বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থাকরণ। গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নে প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(৫) পেট্রোলিয়াম জ্বালানি ব্যবস্থাপনা : পর্যায়ক্রমে পেট্রোলিয়াম জ্বালানি আমদানি, পরিশোধন, বিতরণ এবং বিপণনে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রদান।

(৬) কয়লা ব্যবস্থাপনা : বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্পের দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য কয়লা উত্তোলন ও বিপণনের জন্য আলাদা কোম্পানি স্থাপন।

(৭) বিদ্যুৎ সেক্টরের ব্যবস্থাপনা : দক্ষতার সাথে বিদ্যুৎ সেক্টরের ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য জেনারেশন, ট্রান্সমিশন ও বিতরণ ব্যবস্থা আলাদা প্রফিট সেন্টার হিসাবে পরিচালনা এবং বিদ্যুৎ সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলো বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৮) এনার্জি সংরক্ষণ : দক্ষতার সাথে এনার্জি ব্যবহার করে এনার্জি সংরক্ষণের (conservation) ব্যবস্থাকরণ।

(৯) পরিবেশগত বিবেচনা : সকল ধরনের জ্বালানির জন্য অনুসন্ধান, উৎপাদন, পরিশোধন, পরিবহন, ব্যবহার প্রতিটি ধাপে পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করার ব্যবস্থা করণ।

(১০) মূল্য নির্ধারণ : জ্বালানির আর্থিক ব্যয় বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ করা হবে। কোন ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে গ্রাহক পর্যায়ে ভর্তুকি দিতে হবে এবং

সরকার এনার্জি সরবরাহকৃত সংস্থাকে সে জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ব্যবস্থা নেবে।

(১১) বিনিয়োগ নীতি : সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা একই ধরনের বিনিয়োগ সুবিধা ভোগ করবে।

(১২) পশ্চিমাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ : বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে পশ্চিমাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৩) এলাকাভিত্তিক এনার্জি পরিকল্পনা : গ্রামাঞ্চলের জ্বালানি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক (জেলা/থানা) জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

(১৪) জরুরি মজুদ : আপদকালীন জ্বালানি চাহিদা মিটাবার জন্য তেল ও কয়লার জরুরি মজুদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত ২০% গ্যাসকূপ খনন করে গ্যাসের জরুরি চাহিদা মিটাবার ব্যবস্থা করা হবে।

(১৫) প্রকল্প মূল্যায়ন : এনার্জি সেক্টরের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৬) গবেষণা ও উন্নয়ন : প্রত্যেকটি এনার্জি সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পিত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(১৭) জনশক্তি উন্নয়ন : প্রতিটি এনার্জি সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পিতভাবে জনশক্তি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(১৮) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা : পরিকল্পনা কমিশনের এনার্জি মডেলিং এবং ইকোনমিকস্ উইং এবং বিভিন্ন এনার্জি এজেন্সির উপাত্ত সংগ্রহ ইউনিটের ক্ষমতা জোরদার করা হবে। পরিকল্পনা কমিশন এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় দীর্ঘমেয়াদী এনার্জি পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সকল ধরনের এনার্জি কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করবে। বায়োমাস জ্বালানির টেকসই উন্নয়ন এবং গ্রামাঞ্চলের জ্বালানি চাহিদা মিটাবার লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক জ্বালানি কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হবে। রিনিউয়েবল এনার্জি উন্নযনের জন্য রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (REDA) স্থাপন করা হবে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কোল মাইনিং কোম্পানি স্থাপন করা হবে। ন্যাশনাল এনার্জি অথরিটি (NEA) নামে বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত একটি এনার্জি রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ স্থাপন করা হবে।

(১৯) আইনগত বিষয় : ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি বাস্তবায়নের জন্য বর্তমানে প্রচলিত আইন সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন হবে। ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে বর্ণিত পরিবেশগত বিষয়সমূহ ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট পলিসি এবং এনভায়রনমেন্ট অ্যাক্ট এর অধীনে পরিচালিত হবে।

(২০) রিজিওনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল সহযোগিতা : এতদঅঞ্চলের দেশসমূহে এনার্জি সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ব্যবধান কমাবার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

৭.৪ সুপারিশকৃত নীতিসমূহ

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে সুপারিশকৃত পলিসিগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে গুরুত্ব বিবেচনা করে নিম্নলিখিত ৫টি অংশে ভাগ করে প্রকাশ করা হয়েছে। যথা (১) নন রিনিউয়েবল পলিসি, (২) পেট্রোলিয়াম পলিসি, (৩) রিনিউয়েবল এন্ড রুরাল এনার্জি পলিসি (৪) পাওয়ার পলিসি, (৫) রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন পলিসি। সুপারিশকৃত ৫টি নীতির বিবরণ পরিশিষ্ট-১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭.৫ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির ৭টি প্রধান উদ্দেশ্যের আঙ্গিকে সংক্ষেপে বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হলো।

(১) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল সেক্টরের চাহিদা অনুসারে এনার্জি সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এনার্জি সরবরাহে ঘাটতির কারণে বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

(২) দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও আর্থ-সামাজিক গ্রুপের এনার্জি চাহিদা মিটানো সম্ভব হয়নি। পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস লাইন সম্প্রস্যারণ করা হলেও পূর্বাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলে জ্বালানি সমস্যা বেশী ছিল। শহর অঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি সমস্যা বেশী ছিল। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্বালানি সমস্যা সমাধানের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

(৩) দেশের সকল ধরনের এনার্জি সম্পদের সর্বোত্তম উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়নি। প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা সম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পীট এবং বায়োমাস জ্বালানির টেকসই উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বায়োমাস জ্বালানির সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) এনার্জি ইউটিলিটিগুলোর টেকসই পরিচালনা (sustainable operation) নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পেট্রোবাংলা একটি কর্পোরেশন অথচ এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলো কোম্পানির আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র কোম্পানি; পেট্রোবাংলাকে হোল্ডিং কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়নি। ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি অনুমোদনের পর পেট্রোবাংলার অধীনে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ (BCMCL) নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকেও হোল্ডিং কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পাওয়ার সেক্টর

সংস্কারের আওতায় বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (BPDB) এর কার্যক্রম ফাংশনাল লাইন অনুসারে (জেনারেশন, ট্রান্সমিশন, ডিস্ট্রিবিউশন) বিভক্ত করে কর্পোরেটাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ট্রান্সমিশন কার্যক্রমের জন্য আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার আওতায় পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (PGCB) প্রতিষ্ঠা করা হলেও আশানুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

কাঠামো এবং আইনগত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ছাড়াও এনার্জি ইউটিলিটিগুলোর বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনার জন্য এনার্জির মূল্য নির্ধারণের জন্য অর্থনৈতিকভাবে স্বীকৃত মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি প্রচলন এবং উক্ত পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। এ বিষয়ে বিভিন্ন ফোরামে আলাপ আলোচনা হলেও বাস্তবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সংসদে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৫) জ্বালানি সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহার (rational use) নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির মূল্য অর্থনৈতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিতে নির্ধারণ না করার কারণে ভোক্তারা জ্বালানির যৌক্তিক ব্যবহারে (rational use) আগ্রহী হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে এনার্জি সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত প্রতিষ্ঠান এনার্জি মনিটরিং এন্ড কনজারভেশন সেন্টার (EMCC) এর কার্যক্রম ইলেকট্রিক্যাল ইন্সপেক্টরের অফিসের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে এনার্জির দক্ষ ব্যবহারের কার্যক্রম শক্তিশালী হওয়ার পরিবর্তে দুর্বল হয়েছে।

(৬) এনার্জি সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রমে পরিবেশগত বিষয় বিবেচনা – বাংলাদেশে পরিবেশ আইন বাস্তবায়নের জন্য আইনগত প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থার দুর্বলতার এবং অথবা অনুপস্থিতির কারণে এনার্জি সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রমে পরিবেশগত বিষয় যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি। প্রকল্প শুরু করার আগে এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এনার্জি ব্যবহারের সময় বড় বড় শহরে যানবাহন থেকে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য প্রকল্প গ্রহণ হলেও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন না করার কারণে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা সম্ভব হয়নি।

(৭) এনার্জি সেক্টরের ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা – ১৯৯৩ সালে পেট্রোলিয়াম পলিসি অনুমোদনের পর প্রথম রাউন্ড অফ নেগোশিয়েশনের আওতায় ১৯৯৩-৯৫ সময়কালে বাংলাদেশের মোট ২৩টি ব্লকের মধ্যে ৮টি ব্লকে (১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ এবং ২২) হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উন্নয়নের জন্য ৫টি আন্তর্জাতিক কোম্পানি প্রোডাকশন শেয়ারিং চুক্তি করেছে (চিত্র ৭.১)।

বাংলাদেশের মানচিত্র

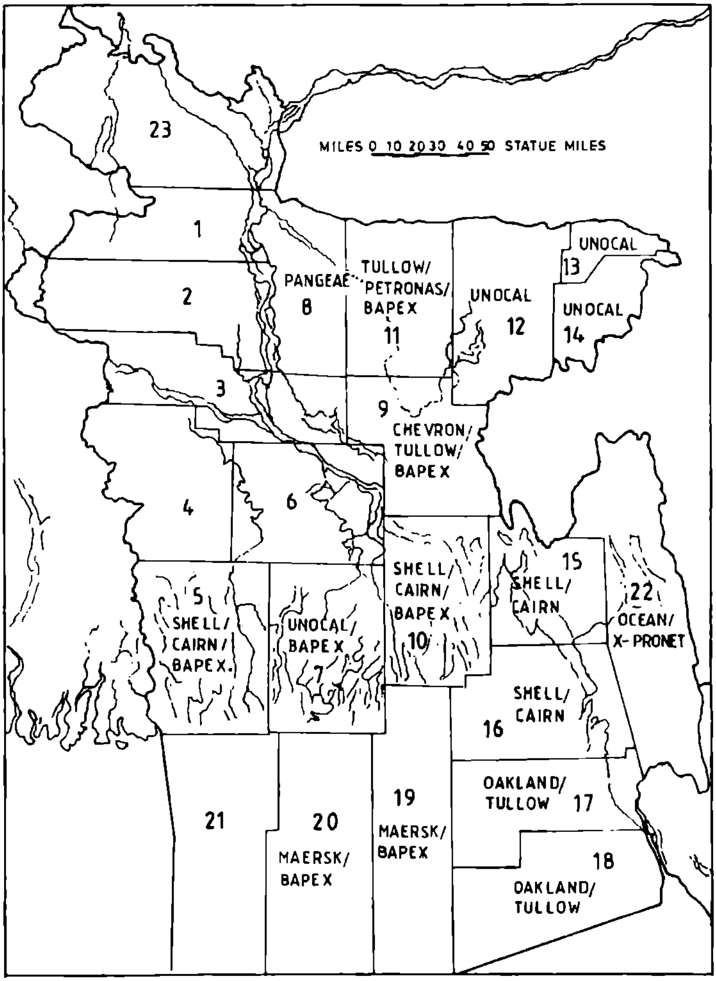
MILES 0 10 20 30 40 50 STATUE MILES
23
1
2
3
PANGEAE
8
TULLOW/
PETRONAS/
BAPEX
11
UNOCAL
12
UNOCAL
13
UNOCAL
14
9
CHEVRON/
TULLOW/
BAPEX
4
6
5
SHELL/
CAIRN/
BAPEX.
UNOCAL/
BAPEX
7
SHELL/
CAIRN/
BAPEX
10
15
SHELL/
CAIRN
22
OCEAN/
X-PRONET
SHELL/
CAIRN
16
OAKLAND/
TULLOW
17
18
OAKLAND/
TULLOW
19
MAERSK/
BAPEX
20
MAERSK/
BAPEX
21

চিত্র ৭.১ঃ হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের ব্লক ম্যাপ

১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি প্রকাশিত হওয়ার পর দ্বিতীয় রাউন্ড অফ বিডিং এর আওতায় ১৯৯৭-২০০১ সময়কালে ৪টি ব্লকে পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে (৫,৭,৯,১০), ২টি ব্লকে চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে (১৯,২০) এবং ১টি ব্লকে পিএসসি স্বাক্ষরের জন্য আলোচনা চলছে (১১)।

১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি এবং প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন পলিসি প্রকাশিত হওয়ার পর ৫টি IPP মোট ১১৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা স্থাপনের চুক্তি করেছে এবং রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ডের অধীনে ১০ মেগাওয়াটের ১১টি ছোট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (১১ x ১০ মেগাওয়াট = ১১০ মেগাওয়াট) স্থাপনের চুক্তি হয়েছে।

৭.৬ মন্তব্য

অনুমোদিত ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে (পেট্রোলিয়াম পলিসিসহ) গ্যাস রপ্তানির কোন সুযোগ রাখা হয়নি। মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের ১৪ ধারায় প্রাকৃতিক গ্যাসকে তরলীকরণ করে LNG হিসাবে রপ্তানির শর্তাবলী বর্ণিত আছে। এমতাবস্থায় প্রথম রাউন্ড অব নেগোসিয়েশন এবং দ্বিতীয় রাউন্ড অব বিডিং এর আওতায় স্বাক্ষরিত সবগুলো পিএসসিতে LNG হিসাবে গ্যাস রপ্তানির সুযোগ আছে। যতটুকু জানা গেছে স্বাক্ষরিত পিএসসিগুলোর মধ্যে ৫টি ব্লকের পিএসসিতে (১৩, ১৪, ১৬, ১৭ ও ১৮) গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানির কাছ থেকে গ্যাস ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা আছে। ইতোমধ্যে ১৩নং ব্লকে অবস্থিত জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে এবং ১৬নং ব্লকে অবস্থিত সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র থেকে পিএসসির শর্তানুসারে গ্যাস ক্রয় করা হচ্ছে। ১৪নং ব্লকে অবস্থিত মৌলভীবাজার গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস ক্রয়ের শর্ত আছে। ১৭ এবং ১৮নং ব্লকে কোন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার হয়নি। নিম্নলিখিত ৯টি ব্লকের পিএসসিতে (৫,৭,৯,১০,১২,১৫,১৯,২০ ও ২২) গ্যাস ক্রয়ের কোন শর্ত নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, ১২নং ব্লকে অবস্থিত বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস ক্রয়ের জন্য পিএসসিতে কোন শর্ত নাই। দ্বিতীয় রাউন্ড অব বিডিং এর অধীনে স্বাক্ষরিত সবগুলো পিএসসিতে পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানি বাপেক্সকে অংশীদার রাখা হয়েছে।

৮

বাংলাদেশের এনার্জি সেক্টরের উন্নয়ন, আইন ও নীতিগত বিষয়

দেশের সংবিধান হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে (অনুচ্ছেদ ৮ থেকে ২৫) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ ব্যক্ত করা হয়েছে। এ মূলনীতিগুলো হচ্ছে উন্নয়নের দর্শন। বোঝার সুবিধার জন্য কয়েকটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অভিব্যক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো (GOB 1990) :

> *"১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।*
>
> *১৫।রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত এবং সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :*
>
> *(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;*
>
> *(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;*
>
> *(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং*
>
> *(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতা পিতৃহীনতা, বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।*
>
> *১৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।*
>
> *১৯(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন,*
>
> *(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম*

> *সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"*

এনার্জি যদিও মৌলিক চাহিদা হিসাবে স্বীকৃত নয় তবে এনার্জি সব ধরনের মৌলিক চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে এনার্জি উন্নয়নের চালিকাশক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে। এনার্জি প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতেও সহায়তা করে। পরোক্ষভাবে এনার্জি সেক্টর রাজস্ব আয়ের বড় এক খাত। এনার্জি সেক্টর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব সামাজিক সেক্টর ছাড়াও অন্যান্য সেক্টরের উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতীকরণের অঙ্গীকার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সরকার এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭৭ সালে রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন বোর্ড (REB) স্থাপন করে পরিকল্পিতভাবে পল্লী এলাকায় বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করেছে।

এনার্জি সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আইন (BPDB Order, BPC Ordinance), সম্পদভিত্তিক আইন (Petroleum Act, Electricity Act) প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া অন্যান্য সহায়ক আইন এনার্জি সেক্টরের ব্যবস্থাপনা প্রভাবিত করে যেমন বিনিয়োগ আইন, শুল্ক আইন ইত্যাদি। সরকার প্রয়োজনবোধে সুশাসন এবং স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেক্টরভিত্তিক নীতি ঘোষণা করেন (National Energy Policy, Industrial Policy ইত্যাদি)। এছাড়া রাষ্ট্রপরিচালনার বিভিন্ন নীতি, বিধি-বিধান অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় এনার্জি সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। ইদানীংকালে হাইড্রোকার্বন সেক্টরে আন্তর্জাতিক কোম্পানির অংশগ্রহণের ফলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা ও বিতর্ক চলছে। সে কারণে বাংলাদেশের হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উন্নয়নের আইন ও নীতিগত বিভিন্ন বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলো।

৮.১ বাংলাদেশে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উন্নয়নের আইন এবং নীতিগত বিষয়

বাংলাদেশে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া যে সকল আইন, নীতি ও বিধি-বিধানের আওতায় পরিচালিত হয় তা হচ্ছে সংবিধান, পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট-১৯৭৪, ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির পেট্রোলিয়াম পলিসি এবং নন-রিনিউয়েবল এনার্জি পলিসিতে উল্লিখিত বিভিন্ন নীতিসমূহ এবং পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট-এর আওতায় প্রণীত মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এইসব আইন ও পলিসিসমূহ সকল আন্তর্জাতিক কোম্পানির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তবে সরকার ও কোম্পানির মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর স্বাক্ষরিত প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের শর্তসমূহ এক এক কোম্পানির জন্য এক এক রকম হতে পারে।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হলো – হাইড্রোকার্বন উন্নয়নের জন্য প্রণীত বিভিন্ন আইন, বিধি-বিধান ও নীতি প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণের করে আন্তর্জাতিক কোম্পানিকে হাইড্রোকার্বন উন্নয়নে

অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে হাইড্রোকার্বন উন্নয়নে বিনিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা এবং এ সুবিধা লাভ করার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টাসহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা চালানো। হাইড্রোকার্বন উন্নয়নে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেসব আলোচনা চলছে সে সকল আলোচনার বিষয়বস্তু অনুধাবনের সুবিধার্থে উপরে বর্ণিত দলিলসমূহের কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

৮.২ সংবিধান অনুসারে গ্যাস সম্পদের মালিক জনগণ

ভূগর্ভ থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান জ্বালানি সম্পদ। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও মূল্যসম্পন্ন সামগ্রীর মালিকানা প্রজাতন্ত্রের ওপর ন্যস্ত। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমায় অন্তর্বতী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রীর মালিকানাও প্রজাতন্ত্রের ওপর ন্যস্ত (GOB 1990)।

পৃথিবীর অনেক দেশে ভূমির অন্তঃস্থ খনিজ সম্পদের মালিকানায় ভূমির মালিকদেরকে অধিকার দেয়া হয়েছে সে কারণে ভূগর্ভে গ্যাস/তেল আবিষ্কার হলে ভূমির মালিকরা খনিজ সম্পদের মালিক হিসাবে রয়ালটি পায়।

সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সে ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে। জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। যেহেতু প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, অতএব ভূগর্ভে প্রাপ্ত গ্যাস এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদের মালিকও প্রজাতন্ত্রের জনগণ।

সংবিধানের ১৪৪ এবং ১৪৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধক দান ও বিলি ব্যবস্থা ন্যস্ত থাকবে এরূপ যে কোন কারবার বা ব্যবসার চালনা এবং যে কোন চুক্তি প্রণয়ন করা যাবে। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলে প্রকাশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি যে রূপে নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করবেন তার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে তা সম্পাদিত হবে। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা (প্রসিডিংস) আনতে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংবিধানের বিধি-বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জনগণের পক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের

দায়িত্ব পালন করে থাকেন। দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাসের বিষয় কোন বড় ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় জনপ্রতিনিধিরা আলাপ-আলোচনা করে প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তাই কাম্য। জ্বালানি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির সদস্যরা এনার্জি সেক্টরের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সংসদে আলোচনার জন্য সুপারিশ প্রদান করতে পারেন।

৮.৩ পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট-১৯৭৪

বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন, প্রসেসিং, রিফাইনিং এবং বাজারজাত করার প্রয়োজনে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট-১৯৭৪ অনুমোদন করা হয়। পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট এর সংজ্ঞা অনুসারে পেট্রোলিয়াম বলতে প্রকৃতিতে পাওয়া গ্যাস, তরল, কঠিন যে কোন ধরনের হাইড্রোকার্বনকে বুঝায়। এই আইন সরকারকে বাংলাদেশের ভৌগলিক এলাকার মধ্যে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান করা থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল স্তরে একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করেছে। এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার যে কোন ব্যক্তির সাথে পেট্রোলিয়াম অপারেশনের জন্য পেট্রোলিয়াম এগ্রিমেন্ট করতে পারে। পেট্রোলিয়াম এগ্রিমেন্ট বলতে পেট্রোলিয়াম অপারেশন সংশ্লিষ্ট প্রডাকশন শেয়ারিং এগ্রিমেন্ট বা অন্য যে কোন ধরনের চুক্তি হতে পারে। পেট্রোলিয়াম অপারেশন বলতে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান থেকে শুরু করে বাজারজাত করা পর্যন্ত যে কোন প্রক্রিয়াকে বুঝাবে। উক্ত অ্যাক্টে পেট্রোলিয়াম অপারেশনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত বিষয়সহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে।

To ensure that such petroleum operation is carried on in proper and workman like manner and in accordance with good oil field practice. To carry on petroleum operation in any area in a manner that does not interfere with navigation, fishing, and conservation of resources of the sea and sea-bed. To consider factors connected with the ecology and environment.

যদি কেউ অত্র আইনে বর্ণিত বিধি বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয় তবে তাহার জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। শাস্তির মেয়াদ ও পরিমাণ এক বছর পর্যন্ত জেল অথবা জরিমানা অথবা জেল ও জরিমানা উভয় হতে পারে। সরকার পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টে বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবে এবং তা গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পেট্রোলিয়াম অপারেশনে নিয়োজিত দেশী অথবা বিদেশী কোন বেআইনী কাজ করলে সরকার/পেট্রোবাংলা অথবা অন্য কোন ভুক্তভোগী আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন। হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের সময় সিলেটের মাগুড়ছড়ায় সংঘটিত দুর্ঘটনা এবং তার ক্ষতিপূরণ নিয়ে সংবাদপত্রে অনেক কথাবার্তা ছাপা হয়েছে। সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল, তবে কমিটির প্রতিবেদন জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়নি। বাংলাদেশ এনভারনমেন্ট

ল-ই'য়ার্স এসোসিয়েশন (BELA) মাগুরছড়া দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ইতোমধ্যে একটি মামলা দায়ের করেছে।

৮.৪ ফরেন প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট (প্রমোশন এবং প্রটেকশন) অ্যাক্ট-১৯৮০

বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার ফরেন প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্ট অনুমোদন করেছে। এই আইনের অধীনে সরকার বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে ব্যবসা করার সুষম সুযোগ প্রদান এবং তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ ও ব্যবসার সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। হরতাল, দাঙ্গা বা অন্য কোন কারণে বিদেশী বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারা বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের ন্যায় সম সুবিধা পাবে। উক্ত আইনে বিদেশী বিনিয়োগ বাজেয়াপ্ত ও জাতীয়করণ সম্বন্ধীয় ধারাগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

Foreign private investment shall not be expropriated or nationalised or be subject to any measures having effect of expropriation or nationalization except for a public purpose against adequate compensation which shall be paid expeditiously and be freely transferable. Adequate compensation shall be an amount equivalent to the market value of investment exporpriated or nationalized immediately before the expropriation or nationalization. In respect of foreign private investment, the transfer of capital and the returns from it and in the event of liquidation of industrial undertaking having such investment, the proceeds from such liquidation is guranteed.

দেশের কোন কোন রাজনৈতিক দল আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে সম্পাদিত তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য যে সকল অসম (তাদের ভাষায়) প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলো বাতিলের দাবি করছেন। একতরফাভাবে এ ধরনের চুক্তি বাতিল করা হলে দেশের প্রচলিত আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্তানুসারে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ক্ষতিপূরণের মাত্রা এত বেশি হবে যে তার দায়ভার বহন করা দেশের জন্য মুশকিল হবে। উদাহরণ স্বরূপ কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি (KAFCO)র সাথে সম্পাদিত চুক্তির ক্ষতিকারক বিষয় সকলের জানা থাকা সত্ত্বেও সরকার বাস্তবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। জাতীয় সংসদে আলাপ আলোচনা করে পিএসসি চুক্তির রূপরেখা ও মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে রাজনৈতিক সমঝোতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তা দেশের জন্য ভাল হবে।

৮.৫ ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির আলোচিত বিষয়সমূহ

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির (NEP) যেসকল বিষয়গুলো নিয়ে বহুল আলোচনা হয়েছে সে বিষয়গুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

সরকার প্রাইভেটাইজেশন পলিসির অংশ হিসাবে প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে গ্যাস খাতের উন্নয়নের বিষয় বিবেচনা করবে। অনেকে পূর্বের আবিস্কৃত জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রটি উন্নয়নের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে প্রডাকশন শেয়ারিং চুক্তি

করায় আপত্তি উঠিয়েছে। উক্ত আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা করে চুক্তি না করে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পিএসসি স্বাক্ষর করলে রাষ্ট্রের জন্য ভাল হত এবং স্বচ্ছতার প্রশ্ন উঠত না। তবে এ ধরনের আবিস্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন করা হলে সবচেয়ে ভাল হত।

NEP-তে উল্লেখ আছে যে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের জন্য আগ্রহী উদ্যোক্তাদের আবেদনপত্র গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে লাইসেন্স প্রদান করা হবে। প্রতিযোগিতামূলক এবং জটিল আবেদনপত্রগুলো নয় মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। বাস্তবে ১৯৯৭ সালে দ্বিতীয় রাউন্ডে অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তি করতে তিন বছর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী সময় লেগেছে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তবে কি সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করা সম্ভব সে ভাবে ধারণা দিলে ভবিষ্যতে সে অনুসারে সময় সীমা নির্ধারণ করা যাবে। প্রয়োজন অনুসারে মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি)-এর বিধিসমূহের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে সংশোধন করা যেতে পারে। ১৯৯৩ সালে পেট্রোলিয়াম পলিসি অনুমোদনের পর অনেকগুলো পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল পিএসসির অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে দেশের স্বার্থে পিএসসি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ্যাস উৎপাদনে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক কোম্পানিকে গ্যাস আবিষ্কারের এবং কমার্শিয়াল ডিসকভারি ঘোষণার রিজনেবল টাইম এর মধ্যে উৎপাদিত গ্যাস বাজারজাত করার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে এবং সরকার যদি কমার্শিয়াল ডিসকভারি ঘোষণার ১২ মাসের মধ্যে গ্যাস বিক্রির সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করতে না পারে তখন গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানি নিজস্ব উদ্যোগে দেশের অভ্যন্তরে গ্যাস বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে পারবে। মার্চ ১৯৯৭ এ অনুমোদিত মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট এর চতুর্দশ অধ্যায়ে ১২ মাসের জায়গায় সময় কমিয়ে ৬ মাস করা হয়েছে। এ শর্তটি আন্তর্জাতিক কোম্পানির কাছে অপছন্দনীয়। তাদের দাবি হচ্ছে যেহেতু স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশে গ্যাসের বাজার সীমিত সে কারণে তাদেরকে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস রপ্তানি করতে অনুমতি দেয়া হোক।

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে এবং মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট এর চতুর্দশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের মূলভূখণ্ডে প্রাপ্ত গ্যাসের দাম হবে সিঙ্গাপুর বাজারে হাইসালফার ফুয়েল অয়েল (HSFO) এর দামের ৭৫% এর সমান (thermal energy equivalent অনুসারে)। সমুদ্রাঞ্চলে (offshore) প্রাপ্ত গ্যাসের দাম হবে ভূখণ্ডে (onshore) এ প্রাপ্ত গ্যাসের দামের চেয়ে ২৫% বেশী। অর্থাৎ সিঙ্গাপুর বাজারে HSFO এর FOB দামের ৯৩.৭৫% এর সমান। অনেকের কাছে বাংলাদেশের গ্যাসের দাম বৈদেশিক মুদ্রায় এবং সিঙ্গাপুরের বাজার দরে HSFO এর দামের সূচক (৭৫% এবং ৯৩.৭৫%) হিসাবে ধরায় আপত্তি আছে। আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো বৈদেশিক মুদ্রায় গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বিনিয়োগ করে তার খরচের অর্থ এবং লাভের অর্থ বৈদেশিক

মুদ্রায় পাবে এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের মুদ্রার মানের দুর্বলতার জন্য ডলারে দাম ঠিক করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে সিঙ্গাপুরের বাজার দরে HSFO এর দামের ৭৫% এবং ৯৩.৭৫% হবে কেন? এর চেয়ে কম হবে না কেন?

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আন্তর্জাতিক কোম্পানি গ্যাস পেলে তাদের প্রাপ্ত গ্যাসের দাম ভারতের বন্দরে ফার্নেস অয়েলের CIF দামের ১০০% সমান (thermal energy equivalent) দাম দেয়। ভারত ফার্নেস অয়েলের ভারতের বন্দরে আনার খরচসহ দাম দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ আনার খরচ দিচ্ছে না এবং HSFO এর ৭৫% এবং ৯৩.৭৫% দাম দিচ্ছে। ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ গ্যাসের দাম বেশ কম দিচ্ছে। এ কারণে সিঙ্গাপুরে HSFO এর মুল্য সূচকে (৭৫% এবং ৯৩.৭৫%) দাম দেয়া যৌক্তিক বলে মনে হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পরিবেশগত কারণে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে হাইসালফার ফুয়েল অয়েল এর কেনাবেচা নাও চলতে পারে। সে কারণে বাংলাদেশের গ্যাসের দাম ক্রুড অয়েলে দামের সাথে মিলিয়ে ঠিক করা উচিত।

১৯৮৮ সালে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের জন্য বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মোট ২,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে ২৩টি ব্লকে ভাগ করা হয় (চিত্র ৭.১)। গড়ে একটি ব্লকের এলাকা হচ্ছে ১০,৮৭০ বর্গ কিলোমিটার। বাস্তবে বিভিন্ন ব্লকের আয়তন এর চেয়ে কিছুটা বেশি কিংবা কম হতে পারে। ১৯৯৩ সালে পেট্রোলিয়াম পলিসি অনুমোদনের পর ফার্স্ট রাউন্ড অফ নেগোশিয়েশন-এ ৬টি প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট এর অধীনে ৮টি ব্লক (১২,১৩,১৪,১৫,১৬,১৭,১৮ ও ২২) এ হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উন্নয়নের জন্য ৫টি আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে চুক্তি করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি ঘোষণা করার পর বাকি ১৫টি ব্লকের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। দ্বিতীয় রাউন্ড অফ বিডিং এর আওতায় ইতোমধ্যে ৪টি ব্লকে পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে (৫,৭,৯,১০), ২টি ব্লকে অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে (১৯,২০) এবং ১টি ব্লকে পিএসসি স্বাক্ষরের জন্য আলোচনা চলছে (১১)। বাংলাদেশের পক্ষে একই সাথে সবগুলো ব্লকের জন্য পিএসসি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া ঠিক হয়নি। পর্যায়ক্রমে দেশের নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য গ্যাসের চাহিদা মূল্যায়ন করে ব্লকগুলো ইজারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে দেশের জন্য ভাল হত।

৮.৬ প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট এর আলোচ্য বিষয়সমূহ

আন্তর্জাতিক কোম্পানির বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উন্নয়নের আইনগত অধিকারের দলিল হচ্ছে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট। পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট-১৯৭৪-এর শর্তানুসারে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক কোম্পানিকে পেট্রোবাংলা/সরকারের সাথে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করতে হয়। সাধারণ দরপত্রের ন্যায় মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের প্রার্থিত তথ্য/দলিলপত্র সরবরাহ করে আগ্রহী কোম্পানিকে দরপত্র দাখিল করতে হয়। মূল্যায়ন কমিটি পূর্ব নির্ধারিত ও প্রচারিত মূল্যায়নের নিয়ামকের ভিত্তিতে দরপত্রসমূহ

মূল্যায়ন করে প্রথম স্থান অধিকারকারী কোম্পানির সাথে উৎপাদন-বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। মডেল পিএসসি এর বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল (Petrobangla 1997) : মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টে মোট ৩২টি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত আছে। পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট-১৯৭৪ অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে পেট্রোবাংলাকে সরকারের পক্ষে বাংলাদেশের ভৌগলিক এলাকার মধ্যে যে কোন ব্যক্তি বা কোম্পানির সাথে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন, উৎপাদন, পরিশোধন এবং বাজারজাতকরণের চুক্তি করার আইনগত অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কন্ট্রাক্টর (অর্থাৎ আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি) নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে, তাদের পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান, উন্নয়ন এবং সকল ধরনের পেট্রোলিয়াম অপারেশন পরিচালনা করার আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রযুক্তিগত ক্ষমতা আছে। এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং কন্ট্রাক্টর একটি নির্দিষ্ট এলাকায় (২৩টি ব্লকের এক বা একাধিক ব্লক-এ) পেট্রোলিয়াম অপারেশন এর জন্য চুক্তি করতে ইচ্ছুক। এ মর্মে সরকারের পক্ষে পেট্রোবাংলা, আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে।

কন্ট্রাক্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে কন্ট্রাক্টর চুক্তিবদ্ধ এলাকায় ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব খরচে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন করবে। পেট্রোবাংলার তত্ত্বাবধানে পেট্রোলিয়াম অপারেশন পরিচালনার সময় কন্ট্রাক্টর আন্তর্জাতিক পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রির স্বীকৃত advanced scientific methods, procedures, technolgies and equipment ব্যবহার করবে। কোন হাইড্রোকার্বন আবিষ্কৃত না হলে কন্ট্রাক্টর কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। অথবা আবিষ্কৃত তেল বা গ্যাস ক্ষেত্রের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহিত না হলে কন্ট্রাক্টর লোকসানের ভার বহন করবে। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে কন্ট্রাক্টর যে ব্লকের জন্য দরপত্র দাখিল করবে সে ব্লক এর পরিচয় এবং আয়তন লিখতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকায় হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ছাড়া কন্ট্রাক্টর অন্য কোন সম্পদের অধিকারী হতে পারবে না।

কন্ট্রাক্টের চতুর্থ অধ্যায়ে চুক্তির সময়কাল সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম অবস্থায় হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের মেয়াদকাল তিন বছর এবং পরবর্তী দু'বছর করে চার বছর অর্থাৎ মোট ৭ বছর পর্যন্ত হতে পারে। যদি চুক্তিভুক্ত এলাকায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য কোন হাইড্রোকার্বন না পাওয়া যায় তখন যথাসময়ে এ চুক্তি বাতিল করা হবে। যদি বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য হাইড্রোকার্বন আবিষ্কার হয় তবে পেট্রোবাংলা কর্তৃক ডেভেলপমেন্ট প্লান অনুমোদনের দিন থেকে আবিস্কৃত তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য কার্যক্রম পরিচালনার মেয়াদকাল যথাক্রমে ২০ বছর এবং ২৫ বছর। যদি এ সময়সীমার পরেও আবিষ্কৃত তেল অথবা গ্যাস ক্ষেত্রে প্রডাকশন-এর সম্ভাবনা থাকে তবে চুক্তির সময়সীমা অতিরিক্ত ৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

কন্ট্রাক্টের ৫ম অধ্যায়ে চুক্তি এলাকা পরিত্যাগ (Relinquish) করার শর্তাবলীর বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত শর্তগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

চুক্তিকৃত ব্লক এর ২৫% এলাকা not later than the end of the third contract year; অতিরিক্ত ২৫% এলাকা not later than the end of the fifth contract year; প্রডাকশন এরিয়া বাদে অবশিষ্ট বাকি সকল এলাকা not later than the end of the seventh contract year-এ ছেড়ে দিতে হবে। যদি কোন ব্লকে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের জন্য সময় বাড়ানো হয় তবে সে বাড়তি সময় শেষ হয়ে গেলে প্রডাকশন এরিয়া বাদে অবশিষ্ট সকল এরিয়া পরিত্যাগ করতে হবে। যদি কন্ট্রাক্টর third contract year শেষ হওয়ার আগে এক অথবা তার বেশি exploratory well খনন করে তবে ওপরে বর্ণিত সময়ের শর্তানুসারে চুক্তিকৃত এলাকা পরিত্যাগ করতে হবে না। কন্ট্রাক্টর যদি কোন প্রডাকশন এরিয়াতে পরপর ১৮০ দিন উৎপাদন কার্য পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয় তখন পেট্রোবাংলার অনুরোধে contractor shall relinquish to Petrobangla rights to conduct petroleum operations। কন্ট্রাক্টর যে কোন সময় ৯০ দিনের লিখিত নোটিশ দিয়ে স্বেচ্ছায় চুক্তিকৃত এলাকার অংশ বা সম্পূর্ণ এলাকার পেট্রোলিয়াম অপারেশনের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারবে। যদি কন্ট্রাক্টর স্বেচ্ছায় চুক্তিকৃত সম্পূর্ণ এলাকা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে তবে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। কন্ট্রাক্টর নির্দিষ্ট সময় পর চুক্তিকৃত এলাকা বা তার কোন অংশ পরিত্যাগ করতে চাইলে কন্ট্রাক্টরকে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট-এর ৬,৭ ও ৮ অধ্যায়ে বর্ণিত শর্তানুসারে আরদ্ধ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। To the extent practicable each such relinquished individual portion shall be not less than 30% of the total area being relinquished at such time, with each relinquished portion forming a rectangle whose longest side is not more than three times as long as the shortest side both along 5 minute east-west and north-south grid line. In any event each such relinquished portion shall be of sufficient size and shape to enable Petroleum Operation to be conducted thereon by another party. কন্ট্রাক্ট পরিত্যাগ করার আগে কন্ট্রাক্টরকে যে এলাকায় এক্সপ্লোরেশন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে সে এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যতটা সম্ভব পূর্বাবস্থায় রেখে যেতে হবে। জীবন এবং সম্পত্তির যাতে ক্ষয়ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কন্ট্রাক্টের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে Minimum Exploration Work Obligation-এর শর্তাবলী লিখিত আছে। কন্ট্রাক্টর বিভিন্ন পর্যায়ে কতটুকু এক্সপ্লোরেশন কাজ করবে সে সম্বন্ধে কন্ট্রাক্ট-এর নির্দিষ্ট শূন্যস্থানে নিজস্ব পরিকল্পিত কাজের পরিমাণ উল্লেখ করবে। কোন কোম্পানি হাইড্রোকার্বন এক্সপ্লোরেশনের জন্য নির্দিষ্ট ব্লক-এ কাজ করার অধিকার পেলে তাদেরকে প্রতিবছর ওয়ার্ক প্রোগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট বাজেট পেশ করতে হবে। কন্ট্রাক্ট-এ বর্ণিত শর্তানুসারে ৮ সদস্যের যৌথ রিভিউ কমিটি ওয়ার্ক প্রোগ্রাম ও বাজেট পর্যালোচনা করে যথাযথ সুপারিশ প্রদান করবে। ৮ সদস্যের যৌথ রিভিউ কমিটিতে পেট্রোবাংলার তিন জন, সরকারের একজন এবং কন্ট্রাক্টের চার জন প্রতিনিধি থাকার নিয়ম আছে। কন্ট্রাক্টরকে রিভিউ কমিটির সুপারিশসহ ওয়ার্ক প্রোগ্রাম

ও বাজেট পেট্রোবাংলার অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে। এক্সপ্লোরেশন কার্যক্রম পরিচালনার সময় জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন হলে কন্ট্রাক্টর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ কাজে বাজেট বহির্ভূত ব্যয় হলে তাৎক্ষণিকভাবে পেট্রোবাংলাকে জানাবে। কন্ট্রাক্টের সপ্তম অধ্যায়ে নির্দিষ্ট সময় এবং ওয়ার্ক প্রোগ্রাম অনুসারে কার্যক্রম সম্পন্ন করার অঙ্গীকার করে ব্যাংক গ্যারান্টির শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কন্ট্রাক্টের ৮ম অধ্যায়ে Discovery, Appraisal and Determination of Commercial Discovery সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে। কন্ট্রাক্টর যদি কোন exploratory কূপে হাইড্রোকার্বন-এর সন্ধান পায় তবে ৩০ দিনের মধ্যে পেট্রোবাংলাকে জানাবে। উক্ত আবিষ্কৃত হাইড্রোকার্বন আবিষ্কার হওয়ার পর যদি কন্ট্রাক্টর উক্ত ক্ষেত্রের হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে চায় তবে ৯০ দিনের নোটিশ দিয়ে পেট্রোবাংলার অনুমোদনের জন্য এ্যাপ্রাইজাল প্রোগ্রাম দাখিল করবে। কন্ট্রাক্টরকে তিন বছরের মধ্যে appraisal কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। কন্ট্রাক্টর যদি গ্যাস ক্ষেত্র এ্যাপ্রাইজাল করতে না চায় তবে শর্তানুসারে তাদেরকে নির্দিষ্ট এলাকা ত্যাগ করতে হবে। এ্যাপ্রাইজাল প্রোগ্রাম সম্পন্ন হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে কন্ট্রাক্টরকে পেট্রোবাংলার কাছে একটি ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। উক্ত রিপোর্টে আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের জিওলজিকাল তথ্যাদি ছাড়া অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি থাকবে তা হল product yield pattern, gas composition, production forecasts (per well and per field) and estimates of recoverable reserve। ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট দাখিল করার পর কন্ট্রাক্টরকে ঘোষণা দিতে হবে যে তারা নিশ্চিত যে discovery is a commercial discovery এবং আবিষ্কৃত গ্যাস উত্তোলনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অথবা কন্ট্রাক্টর ঘোষণা দিতে পারে যে, আবিষ্কৃত হাইড্রোকার্বন বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলন সম্ভব নয়। এখানে লক্ষণীয় যে কোন গ্যাস ক্ষেত্র সম্বন্ধে ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট দাখিল না করার আগে পর্যন্ত উক্ত গ্যাস ক্ষেত্রের recoverable reserve সম্বন্ধে সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। কন্ট্রাক্টর কমার্শিয়াল ডিসকভারি ঘোষণা দেয়ার পর একই সাথে কন্ট্রাক্টরকে হাইড্রোকার্বন উত্তোলনের জন্য পেট্রোবাংলার অনুমোদনের জন্য আবিষ্কৃত নির্দিষ্ট গ্যাস ক্ষেত্রের ডেভেলপমেন্ট প্লান দাখিল করতে হবে এবং contractor shall proceed promptly and diligently and in accordance with good international petroleum industry practice, to develop the discovery, to install all necessary facilities and to commence commercial production.

কন্ট্রাক্টের নবম অধ্যায়ে Ancillary Rights of Contractor সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন কন্ট্রাক্টর চুক্তিকৃত এলাকায় যাওয়া আসার অধিকার লাভ করবে। মূল্য পরিশোধ করে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত নির্মাণ সামগ্রী (বালি, গ্রাভেল, পানি ইত্যাদি) ব্যবহার করতে পারবে। বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম অপারেশন পরিচালনার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন বিদেশী নাগরিক এবং বিদেশী সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করতে

পারবে। পেট্রোবাংলার সুপারিশক্রমে সরকার বিদেশী নাগরিকদেরকে বাংলাদেশে আগমন ও অবস্থানের জন্য ভিসা প্রদান করবে। To produce petroleum from contract area consistent with sound international petroleum industry and good conservation economic practices। কন্ট্রাক্টর চুক্তিকালীন সময়ে চুক্তিকৃত এলাকার সকল জিওলজিক্যাল এবং জিওফিজিক্যাল উপাত্ত দেখার সুযোগ পাবে। কন্ট্রাক্টার-এর প্রাপ্য পেট্রোলিয়ামের হিস্যা বন্ধকী রেখে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে তবে সে ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলা/সরকারের প্রাপ্য হিস্যা পেতে কোন অসুবিধা সৃষ্টি করবে না।

কন্ট্রাক্টের দশম অধ্যায়ে কন্ট্রাক্টর এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চুক্তি কার্যকরী হওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অফিস স্থাপন করতে হবে এবং প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে হবে। পেট্রোলিয়াম অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ড সরবরাহ করতে হবে। Conduct all petroleum operations in a diligent, conscientious and workmanlike manner, in accordance with the applicable law and the contract, and generally accepted standards of the international petroleum industry designed to achieve efficient and safe exploration and production of petroleum and prevent loss or waste of petroleum above or below the surface and to maximize the ultimate economic recovery of petroleum from the contract area : পেট্রোলিয়াম অপারেশনের জন্য আন্তর্জাতিক পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রির মানের অনুরূপ মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করতে হবে। While conducing Petroleum Operations, take necessary measures for conservation, safety of life, property, crops, fishing and fisheries, navigation, protection of environment, prevention of pollution and safety and health of personnel. Prevent damage to any petroleum and water bearing formations, and other natural resources. Prevent unintentional entrance of fluids into petroleum formations and the production of oil or natural gas from reserves at higher rates than consistent with good petroleum industry practice. যে কোন অনুসন্ধান এবং appraisal কূপ পরিত্যাক্ত ঘোষণা করার আগে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। পেট্রোবাংলা অন্য কোন নির্দেশ প্রদান না করলে অনুসন্ধান এবং appraisal কূপগুলো এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এগুলোতে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায়। পেট্রোবাংলাকে অনুসন্ধান এবং appraisal সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করতে হবে। সকল পেট্রোলিয়াম অপারেশন সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে পেট্রোবাংলাকে জানাতে হবে। যথাযোগ্যতা সম্পন্ন বাংলাদেশের নাগরিকদেরকে পেট্রোলিয়াম অপারেশনের কাজে নিয়োগের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। Initial Exploration Period এ এবং Extended Exploration Period এ বাংলাদেশী নাগরিকদের নিয়োগের মাত্রা যথাক্রমে ২০% এবং ৫০% এর কম হবে না। প্রডাকশন পিরিয়ড এর প্রথম পাঁচ বছর, দ্বিতীয় পাঁচ বছর এবং দশবছরের বেশি সময়কালে এ নিয়োগের মাত্রা যথাক্রমে ৬০%, ৭৫% এবং ৯০% এর কম হবে না। পেট্রোবাংলার অনুরোধে কন্ট্রাক্টর পেট্রোবাংলাকে প্রয়োজনীয়

কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। পেট্রোলিয়াম অপারেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ব্যবহৃত সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণতাকে রক্ষা করার জন্য বীমা করতে হবে। যদি একাধিক প্রতিষ্ঠান (entity) Petroleum Operation পরিচালনার চুক্তিবদ্ধ হয় তবে পেট্রোবাংলার অনুমোদনক্রমে একটি প্রতিষ্ঠান Operator হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। The contractor shall abide by the laws, decrees, rules, regulations and ordinance on environment protection adopted by the People's Republic of Bangladesh and ensure prevention of pollution of the air, water, land and ecology. Before undertaking petroleum operation, the contractor shall conduct Environmental Impact Assessment (EIA) as per prevailing Environment Conservation Act, 1995. EIA so conducted should get clearence from the Ministry of Environment and Forest. Therefore, contractor shall take necessary measures in line with the EIA recommendations and incorporate those measures in work program. The contractor shall submit a Disaster Management Plan to the Ministry of Enviornment and Forest for approval prior to undertaking petroleum operation. After completion of approved petroleum operation the contractor shall level, restore or reclaim the affected land.

দ্রুততা এবং দক্ষতার সাথে পেট্রোলিয়াম অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পেট্রোবাংলা এবং সরকার কর্তৃক কন্ট্রাক্টরকে যে সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে সে বিষয়গুলো একাদশ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সহযোগিতার বিষয়গুলো হচ্ছে - ব্যাংক একাউন্ট খোলা, অ্যাকোমোডেশন এবং যোগাযোগ, কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সাথে আমদানি/রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়মবিধি পরিচালনা করা, ভিসা প্রদান করা, বিদেশে স্যাম্পল প্রেরণে সহযোগিতা করা, পেট্রোলিয়াম অপারেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা, জমি লীজ গ্রহণের ব্যবস্থা করা এবং কন্ট্রাক্টর অনুরোধ করলে পেট্রোবাংলা বাংলাদেশী নাগরিকদের নিয়োগে সহযোগিতা করবে। পেট্রোবাংলা কন্ট্রাক্টর-এর অনুরোধে সংশ্লিষ্ট এলাকার তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করবে। চুক্তির শর্তানুসারে পেট্রোবাংলার উপরোক্ত সকল সহযোগিতা কার্যক্রমের ব্যয় কন্ট্রাক্টর বহন করবে।

যথাযথভাবে পেট্রোলিয়াম অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চুক্তি অনুসারে গঠিত জয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি-এর কর্মপরিধি দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হচ্ছে প্রথম কমার্শিয়াল ডিসকভারি ঘোষণা করার ত্রিশ দিনের মধ্যে চুক্তির শর্তানুসারে আট সদস্যের কমিটি গঠন করা হবে এবং পেট্রোবাংলা কর্তৃক মনোনীত তিন জন সদস্যের মধ্যে একজন সদস্যকে কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করবে। কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আয়োজিত সভার কোরামের জন্য ছয় জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। কমিটির সদস্যরা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম না হলে বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে আলোচনা করা হবে। প্রতি তিন মাসে একবার ঢাকাতে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। জয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সুপারিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেট্রোবাংলা এবং কন্ট্রাক্ট-এর নিকট প্রেরণ করতে

হবে। পেট্রোবাংলা কর্তৃক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অনুমোদন করার ৯০ দিনের মধ্যে কন্ট্রাক্টর কমিটির বিবেচনার জন্য পরবর্তী বছরের ওয়ার্ক প্রোগ্রাম ও বাজেট পেশ করবে।

কন্ট্রাক্টের ১৩ অধ্যায়ে Allocation of Production, Recovery of Costs and Expenses and Production Sharing সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কন্ট্রাক্টর পেট্রোলিয়াম অপারেশন পরিচালনার জন্য চুক্তিভুক্ত এলাকা থেকে উত্তোলিত হাইড্রোকার্বন বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে পারবে। মোট উত্তোলিত হাইড্রোকার্বন থেকে পেট্রোলিয়াম অপারেশনের কাজে ব্যবহৃত হাইড্রোকার্বন বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট হাইড্রোকার্বনকে available hydrocarbon (natural gas, oil, condensate etc.) নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। Available hydrocarbon যথাযথভাবে পরিমাপের ব্যবস্থা করা হবে এবং চুক্তির শর্তানুসারে কন্ট্রাক্টর এবং পেট্রোবাংলার মধ্যে বন্টন করা হবে। চুক্তির শর্তানুসারে কন্ট্রাক্টর exploration, development এবং পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অন্যান্য কাজে ব্যয়িত অর্থ recover করার জন্য বছরে উৎপাদিত available oil এর ৫০% এবং available gas অথবা condensate এর ৫৫% পর্যন্ত দাবি করতে পারবে (চিত্র ১১.২)।

উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম এর পরিমাণ ও মূল্য হিসাব করে কন্ট্রাক্টরকে প্রতি তিন মাস অন্তর পাওনা পরিশোধ করা হবে। মোট উত্তোলিত পেট্রোলিয়াম থেকে পেট্রোলিয়াম অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত পেট্রোলিয়াম এবং cost recovery petroleum বাদ দেয়ার পর উদ্বৃত্ত পেট্রোলিয়ামকে profit petroleum নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রফিট পেট্রোলিয়াম কন্ট্রাক্টর এবং পেট্রোবাংলার মধ্যে কন্ট্রাক্টর কর্তৃক পিএসসি এর নির্ধারিত স্থানে লিখিত হার অনুসারে বন্টন করা হবে। Cost recovery period কালে এবং cost recovery কাল শেষ হওয়ার পরে প্রতিদিনে উৎপাদিত তেল ও গ্যাসের কত অংশ কন্ট্রাক্টর এবং কত অংশ পেট্রোবাংলা পাবে তা কন্ট্রাক্টরকে পিএসসি দরপত্রে লিখিতভাবে ঘোষণা দিতে হবে এবং তা আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা যাবে।

কন্ট্রাক্টর measurement point এ পরিমাপকৃত cost recovery petroleum এবং profit petroleum এ দু'টি অংশ পাবে এবং কন্ট্রাক্টর তার প্রাপ্য অংশ বিক্রয় করতে পারবে এবং প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট এর ১৪.৫ এবং ২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে LNG হিসাবে রপ্তানি করতে পারবে। ১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত শর্তানুসারে প্রতি তিন মাসে প্রাপ্য cost recovery petroleum এর হিসাব সমন্বয় করা যাবে। ১৩.৬ ধারা অনুসারে পেট্রোবাংলা তার পাওনা profit oil, profit natural gas, profit condensate and profit NGL, kind-এ অথবা নগদ প্রদান করে গ্রহণ করতে পারবে।

চুক্তিকৃত ব্লকে যদি ইতোপূর্বে আবিস্কৃত এবং undeveloped গ্যাস ক্ষেত্র থাকে তবে কন্ট্রাক্টর সে গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন করে সেখান থেকে গ্যাস উত্তোলন করতে পারবে। এ সকল ক্ষেত্রে অনাবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য পেট্রোবাংলাকে উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম-

এর অংশ যে হারে প্রদান করা হবে পূর্ব-আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের প্রতিটি উৎপাদিত পণ্যের (তেল, গ্যাস, কনডেনসেট ইত্যাদি) জন্য সে তুলনায় ন্যূনতম ১৫% বেশি হিস্যা প্রদান করতে হবে এবং কন্ট্রাক্টর সমহারে কম অংশ পাবে। এ ছাড়া উক্ত গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য পেট্রোবাংলাকে ইতোপূর্বে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে সে পরিমাণ অর্থ পেট্রোবাংলা কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে recover করতে পারবে।

কন্ট্রাক্টের ১৪ অধ্যায়ে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাসের এলএনজি (LNG) হিসাবে রপ্তানি এবং স্থানীয়ভাবে ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে কন্ট্রাক্টর চুক্তিভুক্ত এলাকায় প্রাপ্ত তেলের সাথে associated অবস্থায় পাওয়া প্রাকৃতিক গ্যাস তেল উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে পারবে। চুক্তিভুক্ত এলাকায় পেট্রোলিয়াম অপারেশন পরিচালনার জন্য বিনা মূল্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করতে পারবে। তেলের সাথে প্রাপ্ত associated প্রাকৃতিক গ্যাস এবং গ্যাস ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত কোন প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করা কন্ট্রাক্টর অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক মনে না করলে উক্ত গ্যাস কূপমুখে পেট্রোবাংলার কাছে বিনামূল্যে প্রদানের জন্য প্রস্তাব করবে। যদি পেট্রোবাংলা এ গ্যাস গ্রহণ না করে তবে কন্ট্রাক্টর সে গ্যাস কূপমুখে জালিয়ে দিতে পারবে তবে দাখিলকৃত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকতে হবে। Good reservoir management practice অনুসরণ করে কন্ট্রাক্টর প্রতি বছর প্রতিটি আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের proven recoverable gas reserve-এর ৭.৫% পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারবে। ১৪.৫.৪ এবং ১৪.৫.৫ অধ্যায়ে বর্ণিত শর্ত পূরণ করে কন্ট্রাক্টর কোন নির্দিষ্ট গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত marketable natural gas লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (LNG) form-এ রপ্তানি করতে পারবে। LNG হিসাবে যে গ্যাস রপ্তানি করা যাবে তাহল (ক) contractor's cost recovery natural gas, (খ) contractor's profit natural gas, (গ) Petrobangla's profit natural gas। কন্ট্রাক্টর যদি এলএনজি-তে রূপান্তরিত করে গ্যাস রপ্তানি করতে চায় তবে LNG facilities তৈরি করার জন্য পেট্রোবাংলার সাথে এলএনজি রপ্তানির জন্য আলাদা চুক্তি করতে হবে এবং সে চুক্তির অধীনে যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হলে তৃতীয় পক্ষকে LNG facilities ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া যাবে। গ্যাস ক্ষেত্র থেকে মোট উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ থেকে নিম্নলিখিত পরিমাণ গ্যাস বাদে অবশিষ্ট গ্যাসকে marketable natural হিসাবে বিবেচনা করা হবে : (১) পেট্রোলিয়াম অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত গ্যাস; (২) তেলের উত্তোলন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত গ্যাস এবং (৩) ন্যাচারাল গ্যাস প্রসেসিং করার জন্য গ্যাসের পরিমাণ কমে গেলে সে পরিমাণ গ্যাস। LNG-তে রূপান্তরিত করে রপ্তানি করার জন্য পেট্রোবাংলা Petrobangla's Profit Natural Gas অংশ সরবরাহ করলে কন্ট্রাক্টর পেট্রোবাংলাকে ১৬.৮ অধ্যায়ে বর্ণিত মূল্য নির্ধারণী পদ্ধতি অনুসারে ইউএস ডলারে গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করবে। যে ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টর, পেট্রোবাংলার গ্যাস পাইপলাইন ব্যবহার করবে সেক্ষেত্রে পেট্রোবাংলাকে নির্ধারিত পাইপলাইন ট্যারিফ প্রদান করতে হবে। ১৪.৫.৪

অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে যেখানে পেট্রোবাংলা স্থানীয় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস ট্রান্সপোর্ট পাইপ লাইন স্থাপন করেছে সে ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলার Profit Natural Gas অংশ kind এ রাখতে পারবে। তবে তা কোন অবস্থাতেই মোট marketable natural gas এর ২০% এর বেশি হবে না। প্রতিমাসে পেট্রোবাংলা কি পরিমাণ গ্যাস kind হিসাবে নিবে তা এলএনজি চুক্তি করার আগে জানিয়ে দেবে। প্রতিমাসের জন্য নির্দিষ্টকৃত গ্যাসের পরিমাণ এলএনজি চুক্তির মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এলএনজি রপ্তানি শুরু হওয়ার ১১তম বছর থেকে পেট্রোবাংলার অনুরোধে মাসিক গ্যাসের পরিমাণ ২০% থেকে ৩০% পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। ১৪.৫.৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক এলএনজি রপ্তানি চুক্তি, এলএনজির দাম নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্টকৃত ফর্মুলা এবং এলএনজি-এর দাম অনুমোদন ছাড়া কন্ট্রাক্টর LNG রপ্তানির জন্য কোন চুক্তি করতে পারবে না। কন্ট্রাক্টর যদি পেট্রোবাংলাকে দেখাতে পারে যে LNG চুক্তির অধীনে উল্লিখিত এলএনজির দাম, মূল্য নির্ধারণের ফর্মূলা at the point of export, LNG -এর পরিমাণ এবং যে ভৌগোলিক এলাকায় LNG রপ্তানি করা হবে সে এলাকা পর্যন্ত LNG-র পরিবহন ব্যয় fair market value তবে পেট্রোবাংলা LNG-এর প্রস্তাবের অনুমোদন withheld করবে না। দেশে গ্যাসের চাহিদা নিরূপণ না করে marketable natural gas এর ২০% এর বেশি স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের জন্য রাখা হবে না, কন্ট্রাক্ট-এ ধরনের অঙ্গীকার সংযোজন করা দেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। ভবিষ্যতে যখন LNG চুক্তির প্রস্তাব করা হবে তখন বাস্তবে দেশে গ্যাসের চাহিদা এবং LNG চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় কালে দেশে গ্যাসের চাহিদা যথাযথভাবে নিরূপণ করার পর কি পরিমাণ গ্যাস kind-এ রাখা হবে সে বিষয়ে অঙ্গীকার করার ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। পরবর্তীতে পিএসসি-র সংশোধন করার সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

১৪.৬ অধ্যায়ে natural gas for domestic consumption সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। Contractor has the option to sell contractor's share of natural gas in the domestic market to a third party, subject to Petrobangla's right of first refusal. পেট্রোবাংলা যদি Evaluation Report দাখিল করার ৬ মাসের মধ্যে গ্যাস ক্রয়ের ইচ্ছা জানাতে না পারে তখন কন্ট্রাক্টর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গ্যাস বিক্রি করতে পারবে। অভ্যন্তরীণ বাজারে গ্যাস বিক্রয়ের ব্যাপারে পেট্রোবাংলা কন্ট্রাক্টরকে সহযোগিতা করবে।

১৪.৭ অধ্যায়ে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাসের ওয়েলহেড মূল্য হিসাবের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের (onshore) প্রাপ্ত গ্যাসের market price হবে সিঙ্গাপুর বাজারে High Sulphur Fuel Oil (HSFO)-এর দামের ৭৫% এর সমান (thermal energy equivalent অনুসারে)। উপকূল অঞ্চলে (offshore) প্রাপ্ত গ্যাসের ওয়েলহেড মূল্য হবে onshore এ প্রাপ্ত গ্যাসের হিসাবকৃত দামের চেয়ে ২৫% বেশি। অর্থাৎ সিঙ্গাপুর বাজারে High Sulphur Fuel Oil (HSFO)-এর FOB দামের

৯৩.৭৫% (৭৫% x ১.২৫)-এর সমান। পিএসসি প্রস্তাব দাখিলের সময় কন্ট্রাক্টরকে পিএসসি-এর নির্ধারিত স্থানে (শূন্যস্থানে) লিখে জানাতে হবে যে নির্ধারিত দামের তুলনায় পেট্রোবাংলাকে শতকরা কত ভাগ ডিসকাউন্ট প্রদান করবে। প্রতি calendar quarter এর জন্য market price হিসাব করা হবে। Asian Petroleum Price Index (APPI) কর্তৃক প্রকাশিত ১৮০ CST মানের HSFO-এর ৬ মাসের arithmetic average দামের গড় দামকে market price হিসাবে গণ্য করা হবে। যে calendar quarter এর market price হিসাব করা হবে সে calendar quarter-এর দ্বিতীয় মাসের শেষদিনে যে ৬ মাস শেষ হবে সে ৬ মাস সময়ে APPI যে সকল দিনে HSFO-এর দাম প্রকাশ করবে সে কয়দিনের দামের গড় (arithmetic average) হিসাব করার জন্য ধরা হবে। কন্ট্রাক্ট-এ HSFO-এর সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে US$ 70 per metric ton এবং US$ 120 per metric ton। অর্থাৎ কোন calendar quarter এ হিসাবকৃত HSFO এর জন্য market price যদি US$ 70 per metric ton এর কম হয় তবে সর্বনিম্ন দাম US$ 70 per metric ton ধরা হবে; আবার গড় market price যদি US$ 120 per metric ton এর বেশি হয় তবে সর্বোচ্চ দাম US$ 120 per metric ton ধরা হবে। গ্যাস measurement point এ বিক্রির জন্য গ্যাসের হিসাবকৃত গড় market price প্রযোজ্য হবে। কন্ট্রাক্টর পেট্রোবাংলা অথবা তার অঙ্গসংস্থাকে প্রতিমাসে বিক্রয়কৃত গ্যাসের ইনভয়েস পাঠাবে এবং ইনভয়েস প্রেরণের তিন মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

কন্ট্রাক্টের ১৫ অধ্যায়ে কন্ট্রাক্টর কর্তৃক গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমার্শিয়াল ডিসকভারি ঘোষণা দেয়ার পর যে কোন সময় কন্ট্রাক্টর চুক্তিভুক্ত এলাকার মধ্যে অথবা চুক্তিভুক্ত এলাকা থেকে বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত এক বা একাধিক এলাকায় Production Area to Measurement Point পর্যন্ত এক বা একাধিক পাইপলাইন নির্মাণ ও পরিচালনা করতে পারবে। এ পাইপলাইন নির্মাণের জন্য কন্ট্রাক্টরকে পেট্রোবাংলার কাছে ডেভেলপমেন্ট প্লান দাখিল করতে হবে। উক্ত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে : পাইপলাইন নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জমির চিহ্নিত এলাকা ও পরিমাণ, পাইপলাইনের গ্যাস পরিবহন ক্ষমতা, পাইপলাইন নির্মাণে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন কোম্পানি এবং এ সকল কোম্পানির নির্মিত পাইপলাইনের গ্যাস পরিবহন ক্ষমতা এবং কস্ট রিকভারির পদ্ধতি, পাইপলাইন নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য anticipated capital and operating costs, পাইপলাইন ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত গ্যাস ট্যারিফ, পাইপলাইনের কারিগরি তথ্যসমূহ, পাইপলাইন নির্মাণ ও টেস্ট পদ্ধতি, পরিবেশ দূষণ নিরোধ এবং আপদকালীন অবস্থায় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের বিবরণ, পাইপলাইন নির্মাণের জন্য খসড়া চুক্তি, এবং বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুসারে পাইপলাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য। কন্ট্রাক্টর পাইপলাইন নির্মাণের প্রস্তাব দাখিল করার ৯০ দিনের মধ্যে পেট্রোবাংলা দাখিলকৃত তথ্যগুলো মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনে জাতীয় স্বার্থে এর

সংশোধনের প্রস্তাব দেবে। নির্মিত পাইপলাইন দিয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে পাইপলাইন নির্মাণকারী কন্ট্রাক্টর এবং পেট্রোবাংলার প্রাপ্য গ্যাস পরিবহন করা হবে। পাইপলাইন নির্মাণের জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ recover করা পর্যন্ত সময়ে কন্ট্রাক্টরের পাইপলাইন পরিচালনার অধিকার থাকবে। কূপমুখ থেকে measurement point পর্যন্ত নির্মিত গ্যাস পাইপলাইন cost recovery এর আওতায় পরিচালিত হবে। যে সকল অংশীদার গ্যাস পরিবহনের জন্য পাইপলাইন ব্যবহার করবে তারা নির্দিষ্ট হারে ট্রান্সপোর্ট ট্যারিফ প্রদান করবে। গ্যাস লাইন ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ট্যারিফ পেট্রোবাংলা এবং কন্ট্রাক্টরের একটি যৌথ একাউন্টে জমা রাখা হবে এবং cost recovery period-এ প্রতি তিন মাস অন্তর কন্ট্রাক্টরকে পরিশোধ করা হবে। পেট্রোবাংলা এবং কন্ট্রাক্টরের গ্যাস পরিবহন করার পর পাইপলাইনে গ্যাস পরিবহনের জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকে তবে সকল পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে তৃতীয় পক্ষের গ্যাস পরিবহনের জন্য চুক্তি করা যাবে। সে ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের গ্যাসের বৈশিষ্ট্য এবং গুণগত মান পাইপলাইনে ইতোমধ্যে প্রবাহিত গ্যাসের সমমানের হতে হবে। পাইপলাইনের মালিকানা পেট্রোবাংলার কাছে ন্যস্ত থাকবে। কন্ট্রাক্টর কর্তৃক বিনিয়োগকৃত খরচ উসুল হওয়ার পর পেট্রোবাংলা পাইপলাইন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। যে কোন পক্ষ (পেট্রোবাংলা, কন্ট্রাক্টর, তৃতীয় পক্ষ) এ পাইপলাইন ব্যবহার করবে cost recovery না হওয়া পর্যন্ত fair tariff প্রদান করবে। cost recovery শেষ হওয়ার পর পেট্রোবাংলা ছাড়া অন্য যারা পাইপলাইন ব্যবহার করবে তাদেরকে fair tariff প্রদান করতে থাকতে হবে। পেট্রোবাংলা পাইপলাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করতে কন্ট্রাক্টরকে সহযোগিতা করবে।

পেট্রোলিয়াম তেলের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে কন্ট্রাক্টের ১৬ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রডাকশন এলাকার মেজারমেন্ট পয়েন্টে উৎপাদিত তেলের ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু নির্ধারণ করা হবে। এ চুক্তির শর্তানুসারে ভ্যালু বলতে একজন আগ্রহী ক্রেতা একজন আগ্রহী বিক্রেতাকে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির অধীনে আর্মস লেনথ ভিত্তিতে তেলের জন্য যে মূল্য প্রদানে রাজি হবে সে মূল্যকে বুঝাবে। এ মূল্য নির্ধারণের সময় উৎপাদিত তেলের গুণগতমান, পরিমাণ, মেজারমেন্ট পয়েন্ট থেকে ডেলিভারি পয়েন্ট পর্যন্ত ট্রান্সপোর্ট খরচ, মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি, দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সমমানের ক্রুড অয়েলের দাম বিবেচনা করা হবে। এছাড়া ধারণা করে নেয়া হবে যে ক্রেতা এবং বিক্রেতা নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য freely and independently এ শর্ত পালন করবে এবং উৎপাদিত প্রতি ব্যারেল ক্রুড অয়েল এর দাম ইউএস ডলারে উল্লেখ করতে হবে।

কন্ট্রাক্টের ১৭ অধ্যায়ে মেজারমেন্ট অফ পেট্রোলিয়াম (তেল ও গ্যাস) সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। উৎপাদিত পেট্রোলিয়ামের মধ্যে যেটুকু পরিমাণ পেট্রোলিয়াম অপারেশনের জন্য প্রয়োজন হবে সেটুকু বাদে অবশিষ্ট সব পেট্রোলিয়াম মেজারমেন্ট পয়েন্টে (অর্থাৎ মাপার নির্দিষ্ট স্থানে) মাপতে হবে। মেজারমেন্ট পয়েন্ট

প্রডাকশন এরিয়ার মধ্যে অথবা যে স্থানে উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করা হবে (অর্থাৎ ডেলিভারি পয়েন্টে) যেমন পাইপলাইন, ট্যাংকারে, বার্জে, রেলে, ট্রাকে সে স্থানে স্থাপন করতে হবে। ইন্টারন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রির স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসারে উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম মাপা হবে। পেট্রোলিয়াম মাপার জন্য কন্ট্রাক্টর মাপার প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। চুক্তির শর্ত অনুসারে সকল পরিমাপ স্ট্যান্ডার্ড প্রেসার (14.7 PSIG) এবং তাপমাত্রায় (60°F) রূপান্তরিত করতে হবে।

কন্ট্রাক্টের ১৮ অধ্যায়ে ট্যাক্সেস এবং ডিউটি সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম অপারেশনের জন্য কন্ট্রাক্টরকে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে সরকার, পাবলিক অথরিটি এবং লোকাল অথরিটির লেভি/ট্যাক্স প্রদান করতে হবে না। বাংলাদেশের ইনকাম ট্যাক্স আইন অনুসারে কন্ট্রাক্টরকে নিয়মানুযায়ী ট্যাক্স রিটার্ণ দাখিল করতে হবে, ট্যাক্স এসেসমেন্ট করাতে হবে এবং হিসাবকৃত ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করতে হবে। ১৩ অধ্যায়ে বর্ণিত হিসাব অনুসারে কন্ট্রাক্ট এরিয়া থেকে প্রাপ্ত পেট্রোবাংলার আয়ের অংশের মধ্যে কন্ট্রাক্টর কর্তৃক সরকারকে ইনকাম ট্যাক্স বাবদ দেয় অর্থ অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের প্রচলিত ইনকাম ট্যাক্স আইন এবং অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি অনুসারে কন্ট্রাক্টর-এর এক ক্যালেন্ডার বছরের মোট ইনকাম ট্যাক্স হিসাব করা হবে। পেট্রোবাংলা পেট্রোলিয়াম শেয়ারের অংশ থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে সরকারকে কন্ট্রাক্টর-এর দেয় ইনকাম ট্যাক্সের অর্থ পরিশোধ করবে। ক্যালেন্ডার বছর শেষ হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে পেট্রোবাংলা কন্ট্রাক্টরকে কন্ট্রাক্টর-এর পরিশোধিত ট্যাক্সের অফিসিয়াল রিসিপ্ট প্রদান করবে। ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ প্রচলিত নিয়মানুসারে রিসিপ্টে গৃহিত ট্যাক্সের অর্থের পরিমাণ ও অন্যান্য বিবরণ লিখে দিবে।

কন্ট্রাক্টের ১৯ অধ্যায়ে কন্ট্রাক্টর কর্তৃক দেয় ফি এবং বোনাসের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাইড্রোকার্বন-এর কমার্শিয়াল ডিসকভারি ঘোষণা করার অথবা পূর্বে আবিষ্কৃত আনডিসকভারড গ্যাস ক্ষেত্রের ডেভেলপমেন্ট প্লান অনুমোদনের ৩০ দিনের মধ্যে কন্ট্রাক্টর পেট্রোবাংলাকে দরপত্রে উল্লিখিত হারে (মিলিয়ন ইউএস ডলারে) ডিসকভারি বোনাস প্রদান করবে। ক্রমাগতভাবে ত্রিশ দিন উৎপাদনের পর কন্ট্রাক্টর তেলের দৈনিক উৎপাদনের হারের (প্রতিদিন ১০,০০০ ব্যারেল থেকে ১,০০,০০০ ব্যারেল) ভিত্তিতে উৎপাদিত তেলের জন্য যে হারে প্রডাকশন বোনাস প্রদান করবে তা দরপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লিখে জানাবে। প্রতি ক্যালেন্ডার বছরের শেষে কন্ট্রাক্টর পেট্রোলিয়াম সংশ্লিষ্ট গবেষণা উন্নয়নের জন্য বা পেট্রোবাংলা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য কাজের জন্য পেট্রোবাংলাকে কন্ট্রাক্টরের প্রফিট তেল/কনডেনসেট/এনজিএল থেকে প্রতি ব্যারেলে ৩ ইউএস সেন্ট হারে এবং প্রফিট গ্যাস থেকে প্রতি এমসিএফ এ ০.৪ সেন্ট হারে ফি প্রদান করবে। উপরে বর্ণিত ডিসকভারি বোনাস, প্রডাকশন বোনাস এবং গবেষণার জন্য দেয় অর্থ ১৩ অধ্যায়ে বর্ণিত কস্ট রিকভারির হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। চুক্তির মেয়াদকালীন সময়ে কন্ট্রাক্টর পেট্রোবাংলাকে প্রতি বছর ইউএস

ডলার ৫০,০০০ হারে সার্ভিস ফি প্রদান করবে। কন্ট্রাক্টর ১৩.৪ অধ্যায়ে বর্ণিত অপারেটিং কস্টের আওতায় দেয় সার্ভিস ফি রিকভার করতে পারবে।

কন্ট্রাক্টের ২০ অধ্যায়ে সম্পত্তি এবং উপাত্তের মালিকানা শর্ত সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম অপারেশনের প্রয়োজনে ক্রয়কৃত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে পেট্রোবাংলা। যতক্ষণ পর্যন্ত উপরোক্ত সম্পত্তি পেট্রোলিয়াম অপারেশনের কাজে ব্যবহৃত হবে ততক্ষণ এগুলো পুরোপুরিভাবে কন্ট্রাক্টর ব্যবহার করবে। কন্ট্রাক্ট-এর ব্যবহারের প্রয়োজন শেষ হলে সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকানা পেট্রোবাংলার কাছে হস্তান্তর করবে। ভাড়া করা বা লীজ নেয়া বা সাব-কন্ট্রাক্টরের সম্পত্তির মালিকানা পেট্রোবাংলাকে হস্তান্তর করতে হবে না। কন্ট্রাক্টর কর্তৃক পেট্রোলিয়াম অপারেশনের প্রয়োজনে সংগৃহীত বিভিন্ন অরিজিনাল ডাটা যেমন জিওলজিক্যাল, জিওফিজিক্যাল, জিওকেমিক্যাল, ড্রিলিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, ওয়েল লগ, প্রডাকশন এবং অন্যান্য উপাত্ত এবং এ সকল উপাত্তের বিশ্লেষণধর্মী তথ্যের মালিকানা পেট্রোবাংলার। তবে কন্ট্রাক্টর চুক্তিভুক্ত এলাকার জন্য সংগৃহিত এ সকল উপাত্ত ও তথ্য বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবে। কন্ট্রাক্টর যদি কোন চুক্তিকৃত এলাকার নির্দিষ্ট অংশ ছেড়ে দেয় তবে উক্ত এলাকার স্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে পেট্রোবাংলা। কন্ট্রাক্টর ছেড়ে দেয়া এক ব্লকে ব্যবহৃত অস্থাবর সম্পত্তি অন্য ব্লকে ব্যবহারের জন্য রাখতে পারবে।

কন্ট্রাক্টের ২১ অধ্যায়ে পেমেন্ট এবং কারেন্সি সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চুক্তি অনুসারে কন্ট্রাক্টর পেট্রোবাংলাকে নির্দিষ্টকৃত ব্যাংকে ইউএস ডলারে পাওনা পরিশোধ করবে। পেট্রোবাংলা কন্ট্রাক্টর-এর পাওনা ইউএস ডলারে অথবা কন্ট্রাক্টর-এর কাছে গ্রহণযোগ্য অন্য কারেন্সিতে বাংলাদেশের বাইরের নির্দিষ্টকৃত ব্যাংকে পরিশোধ করবে। আলোচনা সাপেক্ষে কন্ট্রাক্টর-এর মোট পাওনার নির্দিষ্টকৃত অংশ কন্ট্রাক্টর-এর স্থানীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য বাংলাদেশের নির্দিষ্টকৃত ব্যাংকে স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধ করতে পারবে। অর্থ পরিশোধের দিনে বিদ্যমান ডলার ও টাকার এক্সচেঞ্জ রেট অনুসারে পরিশোধকৃত টাকার পরিমাণ হিসাব করতে হবে। পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্ট থেকে পাওয়া এবং স্থানীয় চাহিদা মিটাবার জন্য বিক্রয়কৃত পেট্রোলিয়ামের মূল্য বাবদ পাওনা অর্থ কন্ট্রাক্টর কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়া বাইরের ব্যাংকে রাখতে পারবে। চুক্তির সময়কালীন সময়ে কন্ট্রাক্টর কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়া বাংলাদেশের বাইরের যে কোন ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করতে পারবে এবং সেখান থেকে পাওনা পরিশোধ করতে পারবে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কন্ট্রাক্টর বাংলাদেশের যে কোন ব্যাংকে ইউএস ডলার অথবা অন্য যে কোন কারেন্সিতে একাউন্ট পরিচালনা করতে পারবে। কোন নির্দিষ্ট মাস শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে পেট্রোবাংলা-কন্ট্রাক্টরকে এবং কন্ট্রাক্টর-পেট্রোবাংলাকে পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করবে।

কন্ট্রাক্টের ২২ অধ্যায়ে হিসাবের বই (Book of Account) এবং আর্থিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কন্ট্রাক্টরকে আন্তর্জাতিক পেট্রোলিয়াম

ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহৃত হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। হিসাবের বইতে চুক্তিকৃত এলাকায় সমাপ্ত কাজের বিবরণ, কাজের পরিমাণ ও খরচ, উৎপাদিত এবং সংরক্ষিত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণের হিসাবে থাকবে। কন্ট্রাক্টরকে নথিপত্র ইংরেজীতে লিখতে হবে এবং খরচের হিসাব মার্কিন ডলারে লিখতে হবে। কন্ট্রাক্টর প্রতি মাসে পেট্রোবাংলাকে পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ও সংরক্ষণের হিসাব প্রদান করবে এবং প্রতি ক্যালেন্ডার বছরের জন্য একটি ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাবের বিবরণী প্রণয়ন করবে। পেট্রোবাংলা কন্ট্রাক্টরের হিসাবের খাতা ও নথিপত্র অডিট করতে পারবে।

স্থানীয় চাহিদা মিটাবার জন্য কন্ট্রাক্টর ১৫% ডিসকাউন্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণে তেল সরবরাহ করবে; ২৩ অধ্যায়ে এর পদ্ধতিগত বিষয় সম্বন্ধে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পেট্রোবাংলার কর্মকর্তাদের পেট্রোলিয়াম অপারেশনের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে কন্ট্রাক্টর যে সকল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করবে সে বিষয়ে ২৪ অধ্যায়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কন্ট্রাক্টর cost recovery খাত থেকে এ ট্রেনিং এর খরচ উশুল করতে পারবে। চুক্তির শর্তানুসারে কন্ট্রাক্টর পেট্রোবাংলার কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা ছাড়াও পেট্রোবাংলার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছর এক লক্ষ ডলার অনুদান প্রদান করবে। অনুদানের অর্থ cost recovery হিসাবে গণ্য করা যাবে না। Research, records, inspection এবং confidentiatity সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে ২৫ অধ্যায়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কন্ট্রাক্টর নির্ভুল তথ্য সংরক্ষণ করবে। কন্ট্রাক্টর পেট্রোবাংলাকে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করবে। উভয় পক্ষ প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পাঁচ বছর পর পর্যন্ত গোপনীয়তার শর্ত বলবৎ থাকবে। দৈব দুর্বিপাকের কারণে চুক্তির শর্ত পালনের বাধ্যবাধকতা শিথিল করার বিষয় সম্বন্ধে ২৬ অধ্যায়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পেট্রোবাংলা এবং কন্ট্রাক্টর যে সকল কারণে চুক্তির পরিসমাপ্তি (terminate) করতে পারবে সে বিষয় সম্বন্ধে ২৭ অধ্যায়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

কন্ট্রাক্টের ২৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, চুক্তি সংশ্লিষ্ট আইনগত বিষয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আইনানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। পেট্রোবাংলা এবং কন্ট্রাক্টর এর মধ্যে চুক্তি নিয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে কিভাবে আলাপ আলোচনা এবং বিশেষজ্ঞ ও মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে বিরোধের মীমাংসা করা হবে সে বিষয়ে ২৯ অধ্যায়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পেট্রোবাংলা এবং কন্ট্রাক্টর একে অপরকে যে মাধ্যমে যোগাযোগ করবে এবং নোটিশ প্রদান করবে সে বিষয়গুলো সম্বন্ধে ৩০ অধ্যায়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পেট্রোবাংলা এবং কন্ট্রাক্টর যেসকল শর্তে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করতে পারবে সে বিষয় সম্বন্ধে ৩১ অধ্যায়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। চুক্তি বলবৎ হওয়ার তারিখ এবং যেসকল অবস্থায় চুক্তির শর্ত সংশোধন করা যাবে সে বিষয় সম্বন্ধে ৩২ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৯

বাংলাদেশে হাইড্রোকার্বন (তেল ও গ্যাস) অনুসন্ধান

৯.১ বাংলাদেশে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের ইতিহাস

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক কোম্পানির হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯১০ সালে সীতাকুণ্ডে। ১৯১০-১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে দু'টি আন্তর্জাতিক কোম্পানি (IPPC, BOC) মূল ভূখণ্ডে মোট ৬টি অনুসন্ধান কূপ খনন করে। কিন্তু কোন গ্যাস বা তেল ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে পারেনি। হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়কাল ছিল ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। এ সময়কালে (১৯৫৫-১৯৫৯) পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (PPL) দু'টি গ্যাস ক্ষেত্র (সিলেট ও ছাতক) আবিষ্কার করে। এ দু'টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ০.৫৩৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (সারণী ৫.১)। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানি (PSOC) পাঁচটি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা) আবিষ্কার করে। এ পাঁচটি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ৮.৭০ টিসিএফ। ১৯৬৯ সালে জাতীয় প্রতিষ্ঠান OGDC সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করে, যার উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ০.০৯৮ টিসিএফ। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত সময়ে মোট ৮টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় যাদের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ হলো ৯.৩৩২ টিসিএফ (Anon 1991)।

১৯৭৪ সালে পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর ১৯৭৪-৭৭ সময়ে ৬টি আন্তর্জাতিক কোম্পানি (আর্কো, অ্যাশল্যান্ড, কানাডিয়ান সুপেরিয়র অয়েল কোম্পানি, ইনা-নাফটাপলিন, নিপ্পন অয়েল কোম্পানি, ইউনিয়ন অয়েল) সমুদ্রাঞ্চলে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট-এর অধীনে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান করে এবং ১৯৭৭ সালে ইউনিয়ন অয়েল কোম্পানি কুতুবদিয়াতে একটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করে। এ গ্যাস ক্ষেত্রটির উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ০.৪৬৮ টিসিএফ। ১৯৮০-র দশকে পিএসসির অধীনে দু'টি আন্তর্জাতিক কোম্পানি (শেল পেট্রোলিয়াম এবং সিমিটার) হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেয়। এর মধ্যে সিমিটার ১৯৮৯ সালে সিলেট শহরের উপকণ্ঠে জালালাবাদ নামে একটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করে। এই গ্যাস ক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ০.৮১৫ টিসিএফ। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন দাতা সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় এবং পেট্রোবাংলার নিজস্ব অর্থায়ন ও তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে মোট ৭টি গ্যাস ক্ষেত্র (বেগমগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, ফেনী, কামতা, ফেঞ্চুগঞ্জ, নরসিংদী ও মেঘনা) আবিষ্কার হয়। এ গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ০.৭৭ টিসিএফ। ১৯৮৯ সালে দেশের নিজস্ব হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান কোম্পানি বাপেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাপেক্স ১৯৯৫ সালে

শাহবাজপুর এবং ১৯৯৬ সালে সালদা নদী গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করে। এ দুটি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ যথাক্রমে ০.৩৩৩ টিসিএফ ও ০.১৪০ টিসিএফ।

১৯৯৩ সালে পেট্রোলিয়াম পলিসি ঘোষণা করা হয়। প্রথম রাউন্ড অফ নেগোশিয়েশনের অধীনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানি যে সকল ব্লক এর জন্য প্রডাকশন শেয়ারিং চুক্তি করেছে সেগুলো হলো – অক্সিডেন্টাল (ব্লক ১২,১৩,১৪), কেয়ার্ণ এনার্জি এবং হলান্ড সি সার্চ (ব্লক ১৫,১৬), রেক্সউড-ওকল্যান্ড (ব্লক ১৭,১৮), ইউএমআইসি (ব্লক ২২)। এর মধ্যে কেয়ার্ণ এনার্জি ১৯৯৬ সালে বঙ্গোপসাগরে সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করে, যার মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ০.৮৪৮ টিসিএফ। অক্সিডেন্টাল/ইউনোকল ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে যথাক্রমে বিবিয়ানা ও মৌলভীবাজার গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করে। এ দু'টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ যথাক্রমে ২.৪০১ টিসিএফ এবং ০.৪০০ টিসিএফ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১-২০০০ সাল পর্যন্ত সময় মোট ১৪টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়, যার মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ৬.১৭৫ টিসিএফ। ১৯৯৭ সালে দ্বিতীয় রাউন্ড অফ বিডিং এর অধীনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানি যে সকল ব্লকের জন্য প্রডাকশন শেয়ারিং চুক্তি করেছে সেগুলো হলো - শেল-কেয়ার্ণ-বাপেক্স (ব্লক-৫ ও ১০), ইউনোকল-বাপেক্স (ব্লক ৭), তাল্লো-শেভরন-টেক্সাকো-বাপেক্স (ব্লক-৯)। মার্কস অয়েল এর সাথে ব্লক-১৯ ও ২০ এর জন্য দু'টি চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। তল্লো-পেট্রোনাসের সাথে ব্লক-১১ এর পিএসসি এর জন্য আলোচনা চলছে।

বাংলাদেশে মোট আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২২টি। এর মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১৫.৫০৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (সারণী ৫.২ দ্রষ্টব্য)। মোট ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা এবং বাপেক্সের আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ৯টি, যার মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১.২৪৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানির আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ১৩টি, যার মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১৪.২৬৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো মোট আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের ৬৯% এবং মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের ৯২% এর আবিষ্কারক। প্রযুক্তিগত ক্ষমতা, তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগের সক্ষমতা এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারে তুলনামূলকভাবে বেশি সফলতা অর্জন করেছে। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি বাংলাদেশের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম দফায় ১৯৭৪-৭৭ সময়কালে, দ্বিতীয় দফায় ১৯৮০ এর দশকে, তৃতীয় দফায় ১৯৯৩ এর পেট্রোলিয়াম পলিসি ঘোষণা করার পর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানি বাংলাদেশে হাইড্রোকার্বন উন্নয়নে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এর মধ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগের এবং পরের প্রথম

ও দ্বিতীয় দফায় স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলো তামাদি হয়ে গেছে। পেট্রোলিয়াম পলিসি ঘোষণা করার পর স্বাক্ষরিত প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টগুলো বর্তমানে চলমান আছে।

হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উন্নয়নে দেশের নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে বিষয়গুলো আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হলো – বাপেক্সের জন্য কয়েকটি সম্ভাবনাময়ী ব্লক সংরক্ষিত রাখা এবং বাপেক্সকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান, বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার প্রদান এবং প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা প্রদান।

৯.২ আন্তর্জাতিক কোম্পানির স্বত্বাধিকার পরিবর্তন

হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের বাজার দ্রুত পরিবর্তনশীল। ১৯৯৩-৯৫ সালে ফার্স্ট রাউন্ড অফ নেগোশিয়েশনের আওতায় প্রথম যে ৫টি আন্তর্জাতিক কোম্পানি পিএসসি স্বাক্ষর করেছিল ২০০১ সালে এসে তার প্রায় সকলে বাংলাদেশে তাদের মালিকানা স্বত্ব অন্য কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে। যেমন অক্সিডেন্টাল, ইউনোকলের কাছে ব্লক ১২,১৩,১৪; কেয়ার্ণ এনার্জি, শেলের কাছে ব্লক ১৫,১৬; রেক্সউড ওকল্যান্ড, তাল্লোর কাছে ব্লক ১৭,১৮ এবং ইউএমআইসি, ওসেন এনার্জির কাছে ব্লক ২২ এর স্বত্বাধিকার হস্তান্তর করে দিয়েছে। ভবিষ্যতেও হয়তবা এ ধরনের আরও পরিবর্তন আসবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে দেশের স্বার্থে ভবিষ্যতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন।

৯.৩ অক্সিডেন্টালের বাংলাদেশ ত্যাগ ও ইউনোকলের আগমন

Occidental ১৯৯৫ সালের ১১ জানুয়ারি তারিখে ১২, ১৩ এবং ১৪ নং ব্লকের জন্য পিএসসি স্বাক্ষর করেছিল। ১২ নং ব্লকে প্রথম তিন বছরে সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করার কারণে যথা নিয়মে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ১৩ এবং ১৪ নং ব্লকে প্রথম তিন বছরে কোন কূপ খনন না করার কারণে তাদের পিএসসি বাতিল করার কথা ছিল। পরবর্তীকালে অজানা কারণে এ দুটি ব্লকের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। Occidental চুক্তিকৃত এলাকায় বিনিয়োগে নিজেদের ঝুঁকির পরিমাণ কমাবার জন্য প্রথম ধাপে বিশ্বব্যাংকের অঙ্গসংস্থা আইএফসি এবং ইউনোকলকে অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে। Unocal ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে অক্সিডেন্টাল কোম্পানির চুক্তিকৃত ৩টি ব্লকের (১২, ১৩, ১৪) স্বত্বাধিকার খরিদ করে। এরপর Occidental বাংলাদেশ ত্যাগ করে। নিকট অতীতে বাংলাদেশে ইউনোকল-এর প্রথম আগমন হয় ১৯৯৬ সালে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স কর্তৃক আবিষ্কৃত, ১০নং ব্লকে অবস্থিত শাহাবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন এবং ভোলা-বরিশাল-খুলনা-কুষ্টিয়া পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ ও বিভিন্ন স্থানে ৪টি পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনসহ সমন্বিত ওয়েস্টার্ণ রিজিয়ন ইনটিগ্রেটেড প্রজেক্ট (WRIP) বাস্তবায়নের ইচ্ছা ব্যক্ত করে ইউনোকল সরকারের নিকট unsolicited প্রস্তাব দাখিল করে। ১৯৯৬ সালে অযাচিতভাবে রীপ প্রকল্পের প্রস্তাব দাখিলের পর ১৯৯৯ সালে

অক্সিডেন্টালের কাছ থেকে তিনটি ব্লকে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের অধিকার খরিদ করা বাংলাদেশে ইউনোকলের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসা করার ইচ্ছা অথবা গ্যাস সেক্টরের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা বলা যায়। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে অক্সিডেন্টালের তুলনায় ইউনোকলের ব্যবসায়িক অবস্থান বেশ ভাল। ইতোমধ্যে ইউনোকল মিয়ানমারে আবিষ্কৃত গ্যাস, পাইপলাইনের মাধ্যমে থাইল্যান্ডে রপ্তানি করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের গ্যাস সেক্টরে ইউনোকল-এর ক্রমবর্ধমান আগ্রহের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে একই পাইপ লাইনের মধ্যে মিয়ানমার, ভারতের ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের গ্যাস ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে রপ্তানি করে এ অঞ্চলের গ্যাস বাজার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করে দ্রুত অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো। দূর ভবিষ্যতে সুযোগ হলে ইউনোকল ট্রান্স-এশিয়ান গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, ভারত (ত্রিপুরা), বাংলদেশ, ভারত (পশ্চিমবঙ্গ), পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তুর্কমেনিস্তানকে সংযুক্ত করার চিন্তাভাবনা করছে। যে কারণে মে ১৯৯৯ সালে ইউনোকল কর্তৃক অক্সিডেন্টালের গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে তাদের স্থানীয় সহযোগীদের সহায়তায় বাংলাদেশে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, গোলটেবিল আলোচনার ব্যবস্থা করে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন লেভেলে তদবির করছে। দ্বিতীয় রাউন্ড অফ বিডিং এর অধীনে ইউনোকল ৭নং ব্লকের জন্য পিএসসি স্বাক্ষর করেছে।

৯.৪ কেয়ার্ণের বাংলাদেশ ত্যাগ ও শেলের আগমন

কেয়ার্ণ ১৯৯৪ সলে ১৫ এবং ১৬নং ব্লকে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান শুরু করে এবং ১৯৯৬ সালে ১৬ নং ব্লকে সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। দৈনিক পত্রিকার খবর অনুসারে কেয়ার্ণ এনার্জি সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রসহ ১৫ এবং ১৬ নং ব্লকের স্বত্বাধিকারের অংশ শেল কোম্পানির (SBED) কাছে হস্তান্তর করেছে। দ্বিতীয় রাউন্ড অফ বিডিং এর অধীনে শেল ৫নং এবং ১০ নং ব্লকের জন্য প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করেছে। শেল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বড় এবং প্রভাবশালী তেল কোম্পানি। যে কারণে ১৯৯৯ সালে কেয়ার্ণ-এর কাছ থেকে ১৫ এবং ১৬ নং ব্লকের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারতে গ্যাস রপ্তানি করে দ্রুত লাভবান হওয়ার জন্য ইউনোকলের ন্যায় একইভাবে প্রচার ও তদবির চালিয়ে যাচ্ছে।

৯.৫ প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট অনুসারে চুক্তিকৃত এলাকা পরিত্যাগকরণ

আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোকে যে পরিস্থিতিতে চুক্তিকৃত এলাকা পরিত্যাগ (relinquish) করতে হয় প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট-এর ৫ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বলা আছে (Petrobangla 1997)।

পিএসসি চুক্তির শর্তানুসারে ফার্স্ট রাউন্ড অফ নেগোশিয়েশন-এর আওতায় স্বাক্ষরিত পিএসসি-র অধীনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানির অবস্থান নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১৩নং ব্লকের অপারেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত ইউনোকল ইতোপূর্ব-আবিষ্কৃত জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে জাতীয় গ্যাস পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ করছে। ১২ নং ব্লকে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র বিবিয়ানা আবিষ্কার করেছে এবং উক্ত গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস মজুদের পরিমাণ মূল্যায়ন করেছে। ইউনোক্যাল ১৩ নং ব্লকের রত্না ও ১৪ নং ব্লকের মৌলভীবাজারে একটি করে কূপ খনন করে এবং মৌলভীবাজারে একটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। অনেক সম্ভাবনাময় ১৩ এবং ১৪ নং ব্লক থেকে ৫০% এলাকা পরিত্যাগ করার ইউনোকল-এর সিদ্ধান্ত অনেককে বিস্মিত করেছে। ইউনোকল একদিকে ১৩ নং এবং ১৪ নং ব্লকের ৫০% এলাকা ছেড়ে দিয়েছে আবার অন্যদিকে Second Round of Bidding-এর অধীনে ৭ নং ব্লক এ পিএসসি স্বাক্ষর করেছে। বর্তমানে শেল ১৬নং ব্লকের সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র থেকে জাতীয় গ্যাস পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ করছে। এবং দক্ষিণ সাঙ্গুতে কূপ খননের কাজ সম্পন্ন করেছে। ১৬নং ব্লকের ৫০% এলাকা ছেড়ে দিয়েছে। ১৫নং ব্লকে এখনও তাদের কোন সাফল্য নেই। অন্যান্য যে সকল কোম্পানি ১৭, ১৮ এবং ২২নং ব্লকে অনুসন্ধানের কাজ করছে তাদেরকেও অদূর ভবিষ্যতে পিএসসি'র শর্তানুসারে নির্দিষ্ট অংশ ছেড়ে দিতে হবে। পিএসসি চুক্তির শর্ত অনুসারে ইউনোকল এর ছেড়ে দেয়া ১২ নং ব্লকের ৩০%, ১৩ ও ১৪ নং ব্লকের ৫০% এবং শেল-কেয়ার্ণের ছেড়ে দেয়া ১৬ নং ব্লকের ৫০% এলাকা এখন পুরোপুরিভাবে উন্মুক্ত। সরকার/পেট্রোবাংলা ইচ্ছা করলে ছেড়ে দেয়া এ এলাকাগুলো পুনরায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য পরবর্তী রাউন্ডে বণ্টনের ব্যবস্থা নিতে পারে। দেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দল অবিলম্বে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে সম্পাদিত অসম তেল-গ্যাস চুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে একতরফাভাবে কোন চুক্তি বাতিল করা দেশের জন্য ক্ষতিকারক হবে। তবে পিএসসি-এর শর্ত ভঙ্গের আওতায় কোন চুক্তি বাতিলের সুযোগ আসলে বাতিল করা উচিত এবং কোন তদবির বা চাপের মুখে অযৌক্তিকভাবে সময় বৃদ্ধি করা উচিত নয়।

যে সকল কারণে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো চুক্তিকৃত এলাকা ছেড়ে দিচ্ছে তার বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল : সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে, ইউনোকল মনে করে যে গ্যাস রপ্তানি ছাড়া শুধু বাংলাদেশের চাহিদা হিসাব করলে জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত গ্যাসই যথেষ্ট। সে কারণে তারা ১২, ১৩ এবং ১৪ নং ব্লকের অংশ ছেড়ে দিয়েছে। ১২, ১৩ এবং ১৪ নং ব্লকের এলাকা ধরে রেখে চুক্তি অনুসারে অনুসন্ধান কূপ খনন করার চেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ড-এর অধীনে নতুন এলাকায় সময় নেয়া বিনিয়োগের দিক দিয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ। সম্ভবত সে কারণে একই কোম্পানি তাদের পুরাতন এলাকা ছেড়ে দিয়ে নতুন এলাকার জন্য চুক্তি করার চেষ্টা করছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলাদেশের হাইড্রোকার্বন ব্লকের আকার অনেক বড় (গড়ে প্রায় ১১,০০০ বর্গ কিলোমিটার)। সম্ভবত সে কারণে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো চুক্তিকৃত এলাকার নির্দিষ্ট অংশ ছেড়ে দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের ব্লক-এর আয়তন হল : offshore এর জন্য যুক্তরাজ্য ২০০-২৫০ বর্গ কিলোমিটার, নরওয়ে ৫০০ বর্গ কিলোমিটার, নেদারল্যান্ডস ৪০০ বর্গ কিলোমিটার, ডেনমার্ক ২১২ বর্গ কিলোমিটার, আয়ারল্যান্ড ২৫০ বর্গ কিলোমিটার। অন্যান্য কয়েকটি দেশের ব্লকের এলাকা : ভারত ১৫০০-৩০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, নেপাল ৫,৫০০ বর্গ কিলোমিটার, মিশর ১৫০-৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার, থাইল্যান্ড ২,০০০-৭,৫০০ বর্গ কিলোমিটার, ইন্দোনেশিয়া ৯,০০০-৩০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, চীন ১,০০০-৪,৫০০ বর্গ কিলোমিটার। উল্লেখিত তথ্যের আলোকে দেখা যায় বাংলাদেশের বর্তমানের ব্লকগুলোর গড় আয়তন অন্যান্য দেশের ব্লকের আয়তনের তুলনায় বড়। অতএব বাংলাদেশে ভবিষ্যতে ব্লক বন্টনের সময় ব্লকের সাইজ বর্তমানের চেয়ে ছোট আকারের করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিরপেক্ষ তথ্যের প্রয়োজন হলে UNCTAD-এর প্রকাশনা পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে (UNCTAD 1995)।

১০

বাংলাদেশে গ্যাস উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে সমন্বিতভাবে তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও বিতরণের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ অয়েল গ্যাস মিনারাল কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-কে পুনর্গঠন করে। পেট্রোবাংলার অধীনে বর্তমানে তেল ও গ্যাস সংশ্লিষ্ট মোট ৯টি প্রতিষ্ঠান আছে :

(ক) একটি এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রডাকশন কোম্পানি (BAPEX),
(খ) দু'টি গ্যাস প্রডাকশন কোম্পানি (BGFCL, SGFL),
(গ) একটি গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি (GTCL),
(ঘ) তিনটি ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (TGTDCL, BGSL, JGTDSL),
(ঙ) একটি রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি (RPGCL) এবং
(চ) একটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (WESGAS)।

পেট্রোবাংলার ৯টি কোম্পানি এবং দু'টি আন্তর্জাতিক অয়েল কোম্পানি (Unocal, SBED) বর্তমানে গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহে নিয়োজিত।

১০.১ গ্যাস-উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে বাংলাদেশে একটি দেশী (BAPEX) ও দু'টি আন্তর্জাতিক (Unocal, SBED) গ্যাস অনুসন্ধান-উৎপাদন কোম্পানি এবং দু'টি বাংলাদেশী গ্যাস-উৎপাদন কোম্পানি (BGFCL, SGFL) গ্যাস উৎপাদনে নিয়োজিত। ১৯৮৯ সালে পুনর্গঠনের শুরু থেকে পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানি BAPEX শুধুমাত্র গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত ছিল। সরকার ২০০১ সাল থেকে BAPEX-কে গ্যাস উৎপাদনের দায়িত্ব প্রদান করার পর কোম্পানিটি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রডাকশন কোম্পানি লিঃ (BAPEX) নামে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে BAPEX শ্রীকাইলে একটি অনুসন্ধান কূপ খনন; শাহবাজপুর ও ফেঞ্চুগঞ্জে দু'টি আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন এবং সালদা নদী গ্যাস ক্ষেত্র হতে গ্যাস উৎপাদন কাজে নিয়োজিত আছে। ২০০০ এবং ২০০১ সালে সালদা নদী গ্যাস ক্ষেত্রের গড় দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট এবং ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট। Shell/Cairn ১৯৯৮ সাল হতে সমুদ্রাঞ্চলে অবস্থিত সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উৎপাদন শুরু করেছে। ২০০০ সালে সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রের গড় দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ছিল ১১৯ মিলিয়ন ঘনফুট। Unocal ১৯৯৯ সালে জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রে গ্যাস উৎপাদন শুরু করেছে এবং দু'টি নতুন আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র (বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার) হতে গ্যাস উৎপাদনের

অপেক্ষায় আছে। ২০০০ সালে জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রের দৈনিক গড় গ্যাস উৎপাদন ছিল ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ (BGFCL) পেট্রোবাংলার অধীনস্থ সর্ববৃহৎ গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানি। BGFCL এর অধীনে মোট আটটি গ্যাস ক্ষেত্র আছে (বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, তিতাস, নরসিংদী, মেঘনা, বেগমগঞ্জ, কামতা ও ফেনী)। এর মধ্যে পাঁচটিতে (বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, তিতাস, নরসিংদী ও মেঘনা) উৎপাদন চলছে, একটিতে (বেগমগঞ্জ) উৎপাদন চালানো হয় নি এবং দু'টিতে (কামতা, ফেনী) উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। ২০০০ সালে BGFCL এর দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ছিল ৫৪১.৩ মিলিয়ন ঘনফুট। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত কয়েকটি গ্যাস ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৮২ সালে পেট্রোবাংলার অধীনে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ (SGFL) স্থাপন করা হয়। SGFL এর অধীনে পাঁচটি গ্যাস ক্ষেত্র আছে (কৈলাশটিলা, রশিদপুর, সিলেট, বিয়ানীবাজার ও ছাতক)। এর মধ্যে ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রে উৎপাদন বন্ধ আছে এবং বাকিগুলোতে উৎপাদন চলছে। ২০০০ সালে SGFL এর দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ছিল ১৭১.৮ মিলিয়ন ঘনফুট।

১০.২ গ্যাস পরিবহন ব্যবস্থাপনা

গ্যাস পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ১৯৯৩ সালে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ (GTCL) নামে আলাদা একটি কোম্পানি গঠন করা হয়। এ কোম্পানি শুধুমাত্র গ্যাস পরিবহন পাইপলাইন নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। বর্তমানে GTCL কোম্পানির মালিকানায় যে গ্যাস ট্রান্সমিশন পাইপলাইন রয়েছে তা হলো :

(ক) কৈলাশটিলা থেকে আশুগঞ্জ পর্যন্ত ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ১৮৮ কিলোমিটার নর্থ-সাউথ পাইপলাইন,

(খ) আশুগঞ্জ থেকে বাখরাবাদ পর্যন্ত ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৫৮ কিলোমিটার এ-বি পাইপলাইন এবং

(গ) এলেঙ্গা থেকে নলকা/বাঘাবাড়ি পর্যন্ত ২০/২৪/৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৬৩ কিলোমিটার পাইপলাইন।

জিটিসিএল-এর ব্যবস্থাপনাধীন পাইপলাইনগুলোর মোট দৈর্ঘ্য ৩০৯ কিলোমিটার। বর্তমানে ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ হবিগঞ্জ-আশুগঞ্জ পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলছে।

১০.৩ গ্যাস পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য ১৯৬৪ সালে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (TGDCL) স্থাপন করা হয়। বৃহত্তর ঢাকা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ভৌগলিক এলাকা এ কোম্পানির সেবা প্রদান এলাকার আওতাধীন। তিতাস গ্যাস কোম্পানি বর্তমানে প্রায় ৬১০

কিলোমিটার ট্রান্সমিশন পাইপলাইন এবং প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইনের মাধ্যমে দেশের মোট ব্যবহৃত গ্যাসের ৭০% গ্যাস গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করছে। বৃহত্তর চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লা অঞ্চলে গ্যাস ট্রান্সমিশন এবং বিক্রয়ের জন্য ১৯৮০ সালে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্‌টেমস লিঃ (BGSL) নামে একটি আলাদা কোম্পানি গঠন করা হয়। বর্তমানে বাখরাবাদ গ্যাস কোম্পানি ২৪৮ কিলোমিটার ট্রান্সমিশন পাইপলাইন, ২৪২ কিলোমিটার লোটারাল পাইপলাইন এবং ৩০০০ কিলোমিটার ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইনের মাধ্যমে দেশের মোট ব্যবহৃত গ্যাসের প্রায় ২০% গ্যাস গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করছে। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে গ্যাস ট্রান্সমিশন, ডিস্ট্রিবিউশন এবং বিক্রয়ের জন্য ১৯৮৬ সালে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্‌টেম লিঃ (JGTDSL) নামে একটি আলাদা কোম্পানি গঠন করা হয়। বর্তমানে জালালাবাদ কোম্পানি ৩২৩ কিলোমিটার গ্যাস ট্রান্সমিশন এবং প্রায় ১০০০ কিলোমিটার ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইনের মাধ্যমে দেশের মোট ব্যবহৃত গ্যাসের প্রায় ৬% গ্যাস গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করছে। বঙ্গবন্ধু বহুমুখী যমুনা সেতুর পশ্চিম তীরে অবস্থিত দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে (রাজশাহী বিভাগে) গ্যাস বিতরণ ও বিক্রয়ের জন্য স্থাপিত WESGAS কোম্পানি ৪% গ্যাস গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করছে। আমদানিকৃত পেট্রোলের পরিবর্তে যানবাহনে দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার প্রচলনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৬ সালে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ (RPGCL) নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়।

১০.৪ সার্বিক গ্যাস ব্যবস্থাপনা

পেট্রোবাংলা বাংলাদেশের গ্যাস ব্যবহারের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট এর অধীনে কর্মরত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানির (Unocal, Shell) সাথে পেট্রোবাংলা গ্যাস ক্রয়ের জন্য Take or Pay চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তির শর্তানুসারে পেট্রোবাংলা আইওসি এর কাছ থেকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস ক্রয় করতে বাধ্য; নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণ না করলেও চুক্তির শর্তানুসারে গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য। এ কারণে পেট্রোবাংলা গ্যাসের চাহিদা মিটাবার সময় অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রথমে আইওসি-এর নির্দিষ্ট পরিমাণের গ্যাস সরবরাহ গ্রহণের ব্যবস্থা করে এবং পরে বাকি চাহিদা দেশের নিজস্ব গ্যাস-উৎপাদন কোম্পানিগুলো (BAPEX, BGFCL, SGFL) থেকে গ্রহণ করে। পেট্রোবাংলা বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্যাস উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণ কোম্পানির মধ্যে গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণ কোম্পানির মাধ্যমে গ্যাস বিক্রি করে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। সংগৃহীত

রাজস্ব সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সরকার, আইওসি এবং পেট্রোবাংলার সংশ্লিষ্ট কোম্পানির মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করে।

১০.৫ Unocal কোম্পানির ওয়েস্টার্ণ রিজিয়ন ইনটিগ্রেটেড প্রজেক্ট (WRIP)

বিদেশী বিনিয়োগের সাহায্যে আজকাল Build-Own-Operate (BOO), Build-Own-Operate and Transfer (BOOT) এবং Build Operate and Transfer (BOT) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের চুক্তির অধীনে গ্যাস পাইপলাইন, পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রভৃতি অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। BOO চুক্তিতে বিনিয়োগকারী বা ঠিকাদার নিজস্ব খরচে প্রকল্পে নির্মাণ কাজ শেষ করবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পরিচালনা করবে এবং নির্দিষ্ট ট্যারিফের বিনিময়ে সেবা প্রদান করবে। BOOT চুক্তিতে বিনিয়োগকারী ঠিকাদার প্রকল্প নির্মাণের পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালনা করবে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মালিকানা হস্তান্তর করে দিয়ে চলে যাবে। BOT চুক্তিতে বিনিয়োগকারী/ঠিকাদার প্রকল্প নির্মাণের নির্দিষ্ট সময়ে পরে প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব ট্রান্সফার করে দিয়ে চলে যাবে। মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের ১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত শর্ত অনুসারে কন্ট্রাক্টের যে পাইপলাইন নির্মাণ করবে তা BOT নীতিতে পরিচালিত হবে। পেট্রোবাংলা সবসময় পাইপলাইনের মালিক থাকবে, কন্ট্রাক্টর কখনও পাইপলাইনের মালিকানা স্বত্ব পাবে না। কস্ট রিকভারি শেষ হয়ে গেলে পেট্রোবাংলা পাইপলাইন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। দেশের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে BOO চুক্তিতে পাইপলাইন এবং কনটেইনার পোর্ট নির্মাণের চুক্তি করা উচিত নয়। অত্যন্ত শক্তিশালী দেশের এ সকল কোম্পানি কোনমতে আইনগত সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে দেশের জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী পুঁজি এবং প্রযুক্তিগত সাম্রাজ্যবাদ স্থাপন করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। তারা শতাব্দীকাল ধরে এ সকল প্রকল্পের লাভ চুষে নিতে থাকবে। এ প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমাদের দেশে ব্যবসা করতে এসে পরবর্তীতে কি করেছিল তা সকলের মনে থাকার কথা।

উপরে বর্ণিত মন্তব্যের সূত্রে ইউনোকাল কর্তৃক বহুল আলোচিত WRIP সম্বন্ধীয় কিছু আলোচনা উপস্থাপন করা হল। ১৯৯৫ সালে জাতীয় কোম্পানি BAPEX ভোলার শাহবাজপুরে একটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করে। শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস ইন প্লেস ০.৫১৪ টিসিএফ এবং মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ০.৩৩৩ টিসিএফ। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে ইউনোকাল, BAPEX/পেট্রোবাংলা-এর সাথে শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে। এপ্রিল ১৯৯৬ এ ইউনোকাল পেট্রোবাংলার কাছে রীপ প্রকল্পের ধারণা উপস্থাপন করে। মে ১৯৯৬ BAPEX/Unocal শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে জয়েন্ট স্টাডি এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করে। সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ এ ইউনোকল প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ করে। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ তারিখে জ্বালানি মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার কাছে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর

বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট এর কাছে জয়েন্ট স্টাডির প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখে উচ্চ পর্যায়ে সচিব কমিটি রীপ প্রকল্প রিভিউ করে। ২০ জানুয়ারি ১৯৯৭ তারিখে জ্বালানি মন্ত্রণালয় রীপ প্রকল্পের জন্য লেটার অব ইনটেন্ট স্বাক্ষর করে। ৬ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে ইউনোকাল জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রকল্পের কমার্শিয়াল টার্মস উপস্থাপন করে। ১৮ জুন ১৯৯৭ তারিখে বিপিডিবি এবং ইউনোকাল Project Definition Understanding স্বাক্ষর করে। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে পেট্রোবাংলা এবং ইউনোকাল শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট অনুস্বাক্ষর করে। ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে ইউনোকাল টেন্ডার করার জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের যাবতীয় কাগজপত্র এবং চুক্তি মন্ত্রণালয়ের কাছে দাখিল করে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ উচ্চ পর্যায়ের সচিব কমিটি জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কমিটিকে চুক্তিটি রিভিউ করে কাজ সম্পন্ন করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে। মে ১৯৯৮ তারিখে জ্বালানি মন্ত্রণালয়, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত লেটার অফ ইনটেন্ট-এর মেয়াদ বাড়ায়।

রীপ এর প্রথম পর্যায়ে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছিল তা হলো –

(১) BAPEX/পেট্রোবাংলার সাথে যৌথ উদ্যোগে শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন করা হবে এবং যেখানে BAPEX এর অংশীদারিত্ব থাকবে ১৫%;

(২) GTCL/পেট্রোবাংলার সাথে যৌথ উদ্যোগে ভোলা-বরিশাল-খুলনা পর্যন্ত ১৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ লাইন নির্মাণ করা হবে এবং পাইপলাইনে জিটিসিএল এর অংশ থাকবে ২০%;

(৩) ভোলাতে ২০ মেগাওয়াট এবং বরিশালে ৭০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন simple cycle পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ করা হবে।

প্রথম পর্যায়ে কার্যক্রমের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩২০ মিলিয়ন ডলার যা ইউনোকাল সম্পূর্ণ বহন করবে। প্রথম পর্যায়-এর ধারাবাহিকতায় রীপ এর দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছিল তা হলো –

(৪) প্রথম পর্যায়ে বরিশালে স্থাপিত ৭০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্টকে combined cycle এ রূপান্তরিত করার মাধ্যমে অতিরিক্ত ৩০ মেগাওয়াট পাওয়ার উৎপাদন ব্যবস্থার সংযোজন;

(৫) খুলনাতে ২১০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন;

(৬) খুলনা থেকে ভেড়ামারা পর্যন্ত ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ;

(৭) গোপালগঞ্জ পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ;

(৮) গোপালগঞ্জে ২০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ইউএস ডলার ৩৮০ মিলিয়ন। উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে ইউনোকাল রীপ এর জন্য সর্বমোট ইউএস ডলার ৭০০ মিলিয়ন বিনিয়োগ করে তদ্বারা – (ক) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন করবে; (খ) ১৫০ কিমি দীর্ঘ ২৪ ইঞ্চি গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করবে; (গ)

৩৩০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ করবে। রীপ বাস্তবায়নের জন্য সরকার/পেট্রোবাংলা চুক্তি সম্পাদন করলে ১৫ মাসের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজের বাস্তবায়ন শুরু করবে। প্রতিটি component এর জন্য আলাদা চুক্তি হবে এবং আলাদাভাবে গঠিত কোম্পানি নির্দিষ্ট অংশের নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। ইউনোকাল এর মতে ভোলা থেকে খুলনা পর্যন্ত প্রস্তাবিত ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ লাইন নির্মাণ করা হলে ভবিষ্যতে সেকেন্ড রাউন্ড অফ বিডিং-এর অধীনে অতিরিক্ত গ্যাস আবিষ্কৃত হলে সে গ্যাস পরিবহনের জন্য এ পাইপলাইন ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ জেনে শুনে ইউনোকাল অতিরিক্ত সাইজের পাইপলাইন নির্মাণ করার প্রস্তাব করেছে। এর ফলে অহেতুক প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। রীপ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে বর্তমানে যে পরিমাণ উত্তোলনযোগ্য গ্যাস আছে তা দিয়ে প্রথম পর্যায়ে ভোলার ২০ মেগাওয়াট, বরিশালে ১০০ মেগাওয়াট এবং খুলনায় নবনির্মিত ১০০ মেগাওয়াট বার্জমাউন্টেড পাওয়ার প্লান্ট ২০ বছর চলবে। ভবিষ্যতে শাহাবাজপুরে অতিরিক্ত গ্যাস পাওয়া গেলে খুলনায় নির্মিতব্য ২১০ মেগাওয়াট এবং বিপিডিবি এর পাওয়ার প্লান্টে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ইউনোকাল এর তথ্য বিবরণী থেকে জানা যায় যে রীপ বাস্তবায়নের ফলে খুলনা পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করা হলে বাংলাদেশের যে উপকার হবে তা হলো –

(ক) স্বল্প সময়ের মধ্যে শাহাবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন;
(খ) পশ্চিমাঞ্চলের পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য আমাদানীকৃত জ্বালানি তেলের ব্যবহার হ্রাস বাবদ বছরে ৭০ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয়;
(গ) পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তার জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানি (প্রাকৃতিক গ্যাস) সরবরাহ;
(ঘ) কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বরিশাল ও খুলনায় ৩৫০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্টে ১৯৯৮ সালে ৫৮১ কোটি টাকার আমদানীকৃত তেল ব্যবহার করা হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুধুমাত্র বর্তমানে স্থাপিত পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোতে গ্যাস সরবরাহ করা হলে শাহবাজপুরের গ্যাসে ১৩ বছর চলবে। ইউনোকাল এর প্রস্তাবিত ভোলার (২০ মেগাওয়াট), বরিশালের (১০০ মেগাওয়াট) এবং খুলনার বার্জমাউন্টেড (১০০ মেগাওয়াট) সহ বর্তমানের ৩৫০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোতে গ্যাস সরবরাহ করা হলে শাহবাজপুরের গ্যাসে মাত্র ৮ বছর চলবে। ভাবতে অবাক লাগে যে গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত না হয়ে কিভাবে এ ধরনের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হল? এ কারণে ইউনোকাল তাদের প্রস্তাবিত পাওয়ার প্ল্যান্ট চালাবার জন্য গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের সাথে আলাদা চুক্তি করতে চেয়েছে। রীপ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার/পেট্রোবাংলা/বিপিডিবি এর সাথে যে চুক্তিগুলো করতে চেয়েছে তা হলো –

(১) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট;
(২) পাইপলাইন বিডিং এগ্রিমেন্ট;
(৩) গ্যাস ট্রান্সমিশন এগ্রিমেন্ট;

(৪) গ্যাস পারচেজ এন্ড সেলস এগ্রিমেন্ট;
(৫) পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট;
(৬) গ্যাস সাপ্লাই এগ্রিমেন্ট;
(৭) ইমপ্লিমেন্টেশন এগ্রিমেন্ট।

রীপ সম্বন্ধে যেসব বিরূপ সমালোচনা হয়েছে তা উপস্থাপন করা হলো। জুলাই ১৯৯৭ তারিখে সেকেন্ড রাউন্ড অব বিডিং এর অধীনে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের পর ইউনোকাল এর কাছ থেকে রীপ-এর unsoliciated offer বিবেচনার জন্য গ্রহণ করায়, সেকেন্ড রাউন্ড অব বিডিং-এ অংশগ্রহণকারী অন্যান্য আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো সরকারের সমালোচনা করেছে (ডেইলী স্টার, ২২ জুলাই ১৯৯৯)। রীপ সম্বন্ধে বিশ্বব্যাংক বলেছে যে, সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া এ ধরনের প্রকল্প বিবেচনা করা উচিত নয়। এ প্রকল্প বাস্তবতা বর্জিত। বিশ্বব্যাংক জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করলেও রীপ-এর জন্য প্রস্তাবিত বিশাল প্রকল্প ব্যয়ের কারণে এ মন্তব্য করে (দৈনিক ভোরের কাগজ, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)। ১৯৯৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে ভ্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এনার্জি ডেলিগেশন এর সদস্যরা মত প্রকাশ করেছিলেন যে বাংলাদেশের রীপ চুক্তি স্বাক্ষরের আগে সতর্কতার সাথে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করা উচিত। ডেলিগেশন-এর সদস্যরা মত প্রকাশ করেছিলেন যে রীপ-এর ন্যায় complex and unusual প্রস্তাব যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশের expertise নেই (ডেইলী স্টার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)।

পেট্রোবাংলার বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, ইউনোকাল এর সাথে অসম চুক্তি স্বাক্ষর করা হলে বাংলাদেশ ২ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পেট্রোবাংলার রিভিউ কমিটির মতামত নিম্নে উপস্থাপন করা হল –

(১) প্রকল্পের সমস্ত ঝুঁকি বাংলাদেশ সরকারকে নিতে হবে;
(২) ইউনোকাল তাদের বিনিয়োগের জন্য সরকারের কাছে গ্যারান্টি চেয়েছে;
(৩) ইউনোকাল শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের উত্তোলিত গ্যাস বাংলাদেশের কাছে আন্তর্জাতিক বাজার দরে (প্রতি এমসিএফ জন্য ২.৫ ডলার) বিক্রি করতে চায় অথচ তাদের স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তারা অন্যান্য ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (IPP)-এর কাছে যে দামে গ্যাস বিক্রি করার চুক্তি করা হয়েছে (প্রতি এমসিএফ জন্য ২.৪০ ডলার) তার পরিবর্তে সরকার বিপিডিবি কে যে দামে গ্যাস বিক্রি করে (প্রতি এমসিএফ জন্য ১.১৭ ডলার) সে দামে গ্যাস পেতে চায়;
(৪) ইউনোকাল-এর oversize পাইপলাইনের জন্য প্রতি ১০০০ ঘনফুট (১ এমসিএফ) গ্যাস পরিবহনের জন্য ১.০০ ডলার পরিবহন চার্জ চায় (বর্তমানে দেশীয় কোম্পানি জিটিসিএল প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাস পরিবহনের জন্য টাকা ৬.৩২ হারে পরিবহন চার্জ পায়)।

পেট্রোবাংলার রিভিউ কমিটি ইউনোকাল কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাব সংশোধনের যে প্রস্তাব দিয়েছিল তা হলো –

(ক) বাংলাদেশ/পেট্রোবাংলা রীপ অন্তর্ভুক্ত পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহের ঝুঁকির জন্য কোন গ্যারান্টি দেবে না। অর্থাৎ শাহবাজপুরের গ্যাস শেষ হলে পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প পরিচালনার জন্য গ্যাস সরবরাহের ঝুঁকি ইউনোকালকে গ্রহণ করতে হবে।

(খ) GTCL-কে কোন বিনিয়োগ ছাড়া ২০% এর মালিকানার অধিকার দিতে হবে;

(গ) Build-Own-Operate (BOO) ভিত্তিতে ঐ পাইপলাইন নির্মাণ করা হলে তাতে জিটিসিএল এর মালিকানা থাকবে না তাই জিটিসিএল-কে মালিকানার অংশীদারীত্ব দিয়ে Build Operate and Transfer (BOT) ভিত্তিতে পাইপলাইন পরিচালনা করতে হবে;

(ঘ) ১৫০ কিলোমিটার পাইপলাইনের জন্য ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের oversize পাইপলাইন নির্মাণের প্রয়োজন নেই, যদি ইউনোকাল এরপরও ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপলাইন নির্মাণ করতে চায় তবে ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপলাইনের মূল্য ধরে গ্যাস পরিবহনের ট্যারিফ হিসাব করতে হবে। কমিটির মতে ১৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণের ব্যয় ১০ কোটি ডলারের বেশি হবে না, অথচ প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ কোটি ডলার;

(ঙ) GTCL বর্তমানে ১০০০ ঘনফুট গ্যাস পরিবহনের জন্য টাকা ৬.৩২ পরিবহন ট্যারিফ পায় সে তুলনায় Unocal এর প্রস্তাবিত পরিবহন ব্যয় প্রতি ১০০০ ঘনফুটের জন্য ১ ডলার অনেক বেশি।

(চ) ইউনোকালের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বৃটিশ আইন এবং রিভিউ কমিটি বাংলাদেশী আইনের কার্যকারিতার কথা বলেছে।

বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি সহযোগিতা চুক্তির অধীনে প্রাপ্ত অনুদানের অর্থে নিয়োগকৃত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপদেষ্টা কোম্পানি মেসার্স পারসন্স ইউনোকালের রীপ প্রকল্প সম্বন্ধে এপ্রিল ২০০০ জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে যে প্রতিবেদন দাখিল করেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল – প্রস্তাবিত প্রকল্পের অধিকাংশ শর্তই "বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে নয়"। প্রকল্পটি জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ। শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত গ্যাস না পেলে পুরো প্রকল্পটি ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রকল্পের অধিকাংশ ঝুঁকিই বাংলাদেশের ঘাড়ে বর্তাবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুসারে রীপ সম্বন্ধে মেসার্স পারসন্স জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার পর ইউনোকাল এবং একটি প্রভাবশালী মহল পারসন্সের দেয়া নেতিবাচক মতামত পরিবর্তনের জন্য জোর তদবির চালিয়েছিল (দৈনিক ভোরের কাগজ, ৩ এপ্রিল ২০০০)। ইউনোকাল ঘোষণা দিয়েছিল যে, রীপ বাস্তবায়ন না হলে এ কোম্পানি বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আর বিনিয়োগ করবে না।

১৪ জুন ২০০০ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় রীপ প্রকল্পটি স্থগিত করা হয় এবং শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়নের দায়িত্ব BAPEX-কে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। (WRIP) প্রকল্পটি স্থগিত না করে পুরাপুরিভাবে বাতিল করে দেয়া উচিত ছিল।

১১

এনার্জির মূল্য নির্ধারণ

১১.১ এনার্জির (গ্যাস, তেল ও বিদ্যুতের) মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বিতর্ক

বাজার অর্থনীতির যুগে মূল্য পরিশোধ করে পণ্য কিনতে কেউ প্রশ্ন তোলে না। গত ২৫-৩০ বছরে ঢাকার কোন কোন স্থানে জমির দাম ১০০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিয়ে কোন প্রতিবাদ নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি এবং/অথবা ডলারের তুলনায় টাকার অবমূল্যায়নের জন্য আমাদের দেশের দোকানে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে ভোক্তারা কোন প্রতিবাদ করে না। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি এবং টাকার অবমূল্যায়নের জন্য সরকার দেশে তেলের মূল্য বৃদ্ধি করলে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। তেমনিভাবে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করা হলেও রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং সাধারণ মানুষের মাঝে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ঝড় উঠাই স্বাভাবিক – যেহেতু তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য পণ্য, অন্যদিকে জমি ও স্বর্ণ বিত্তবান মানুষের ভোগের সামগ্রী। কথাটা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু বিস্ময় লাগে যে, এই বিত্তবানেরাও যখন এনার্জির মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদের সময় সামনের কাতারে এসে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশের অতীত ও বর্তমানে ক্ষমতাসীন সব সরকারকে রাজনৈতিক কারণে এনার্জির (তেল, গ্যাস, বিদ্যুতের) মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের সময় খুবই বিব্রত হতে দেখা গেছে এবং দেখা যায়। মূল্য বৃদ্ধি করা হলে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হবে, জনপ্রিয়তা কমে যাবে এ সকল কারণে সরকার এনার্জির মূল্য বৃদ্ধিতে ইতস্তত বোধ করেন। যে কারণে অনেক ভেবেচিন্তে মূল্য বৃদ্ধির যথাযথ সময় নির্ধারণ করা হয়। যেমন বাজেটের সময় কর বৃদ্ধির কারণে অনেক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিকভাবে সরকার সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সে কারণে সরকার কৌশলগতভাবে তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য অনেক সময় বাজেটের সময় না বাড়িয়ে পরবর্তীতে সুবিধাজনক এক সময় মন্ত্রীসভার অনুমোদনক্রমে প্রজ্ঞাপন জারি করে বৃদ্ধি করা হয়। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে প্রধানত গ্যাস এবং তেল ও জলশক্তি ব্যবহার করা হয়। সে কারণে তেল ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বাড়বে। একথা জানা থাকা সত্ত্বেও সরকার কখনও একই সাথে তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ান না। এক এক ধরনের এনার্জির মূল্য এক এক সময় বৃদ্ধি করা হয়। রাজনৈতিক প্রতিবাদের তীব্রতার মাত্রা সীমিত করার লক্ষ্যে এ কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে। অতীতের এনার্জির মূল্য বৃদ্ধির সময়কাল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার পারতপক্ষে নির্বাচনের বছর এনার্জির দাম বাড়াতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন না। পাছে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ভোটের সময় তাদেরকে

পরাজিত করে। আবার নতুন নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বছরে জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে এনার্জির মূল্য বৃদ্ধি করে নি। কখনও কখনও সম্ভব হলে ক্ষমতা গ্রহণের দ্বিতীয় বছর সময়কাল পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি করা এড়িয়ে গেছে।

রাজনৈতিক কারণে যথাসময়ে বিভিন্ন প্রকার এনার্জির দাম না বাড়ানোর কারণে যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা হল এনার্জি সরবরহাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, ভোক্তারা সস্তা দামে এনার্জি ব্যবহারের সুযোগ পেলে অদক্ষতার সাথে এনার্জি ব্যবহারের চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক দুর্বল অবস্থার কারণে এনার্জি ইউটিলিটির পক্ষে আশানুরূপভাবে নতুন গ্রাহকদের এনার্জি সরবরাহ দেয়া সম্ভব হয় না। এনার্জি ইউটিলিটিগুলোর ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা হ্রাস পায়।

অনেক শিল্প কারখানার মালিকদেরকে এনার্জির মূল্য বৃদ্ধির বিপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলতে শোনা যায় যে, এনার্জির মূল্য বৃদ্ধি করা হলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় দেশের রপ্তানি পণ্য মার খাবে। এ যুক্তিটি সহজভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, গ্যাস নেটওয়ার্কের বাইরে অবস্থিত দেশের অনেক শিল্পকারখানা আমদানীকৃত তেলকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে আভ্যন্তরীণ বাজারে গ্যাস ব্যবহৃত একই ধরনের শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতা করে বাজারে টিকে আছে। ধারণা করা হয় যে তেলকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত শিল্পকারখানাগুলো উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চদামে এনার্জি ক্রয় করেও লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছে। শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এনার্জির দামের চেয়ে রিলায়্যাবল বা নিশ্চিত এনার্জি সরবরাহ পাওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ গত ২-৩ বছরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় অনেক শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব মূলধন দিয়ে ছোট জেনারেটর ক্রয় করে বেশি দামে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে শিল্পকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালানো যদি লাভজনক না হত তবে এতদিনে অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেত। ছোট জেনারেটরে তেল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে অনেক ব্যয় সাপেক্ষ। যার ফলে বেশি দামে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে উৎপাদন খরচে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ঘনত্ব অনুসারে তাদের লাভের পরিমাণ কমছে। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে এনার্জি ইউটিলিটিগুলো যথাযথ দাম বাড়িয়ে যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারত তবে গ্রাহকরা বর্তমান অবস্থার চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভবান হত। অতএব রাজনৈতিক কারণে এনার্জির দাম না বাড়ানো স্বল্প মেয়াদকালে জনপ্রিয় মনে হলেও দীর্ঘ মেয়াদকালে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য মঙ্গলজনক নয়।

এনার্জির মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি হল যে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ গ্যাস ও বিদ্যুতের ভোক্তা। তাদের সুবিধা ভোগের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এনার্জির মূল্য কম রাখার কোন যুক্তি নেই। এনার্জির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ

করার পর Cross-Subsidy-এর মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত অগ্রাধিকার সেক্টর (কৃষি) এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এনার্জির মূল্য স্থির রাখার অর্থ হচ্ছে বর্তমান ব্যবহারকারীদের মাঝে এনার্জির ব্যবহার সীমিত রাখা। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের স্বার্থে এ ধরনের স্থবির উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা উচিত নয়। এ কারণে দেশের উন্নয়নের সার্থে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনেক স্পর্শকাতর বিষয়ের ন্যায় এনার্জির মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমঝোতা একান্ত কাম্য।

এনার্জির মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি সংসদে আইন পাশ করে যথাযোগ্য একটি রেগুলেটরি কমিশনের কাছে দায়িত্ব প্রদান করা হলে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের গঠন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হল।

১১.২ ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (FERC), ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জির আওতায় একটি ইনডিপেনডেন্ট কমিশন। এ কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের গ্যাস ইন্ডাস্ট্রি, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ এবং তেলের পাইপ লাইন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম রেগুলেট করা। ১৯৭৭ সালে ১লা অক্টোবর আইনের মাধ্যমে FERC এর সৃষ্টি করা হয় এবং একই সাথে ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত ফেডারেল পাওয়ার কমিশন-এর কার্যক্রম অবলুপ্ত করা হয়। ফার্কের মোট কমিশনারের সংখ্যা পাঁচ জন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের সুপারিশ অনুসারে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক পাঁচ বছর মেয়াদকালের জন্য staggered ভাবে এ পাঁচ জন কমিশনার নিয়োগ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ একই সাথে সকল কমিশনারদেরকে মনোনয়ন প্রদান করা হয় না। একজন কমিশনারের রেগুলেটরি বিষয়ে একটি ভোট দেয়ার অধিকার আছে। মোট পাঁচজন কমিশনারের মধ্যে তিন জনের বেশি কমিশনার কোন একটি রাজনৈতিক দলের (ডেমোক্রাট এবং রিপাবলিকান দল) নমিনেশনে মনোনীত হতে পারে না। মনোনীত এবং নিয়োগপ্রাপ্ত পাঁচ জন কমিশনারের যে কোন একজনকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কমিশনের চেয়ারপারসন এবং প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেন। ফার্ক সাধারণত প্রতি মাসে দু'বার সভায় মিলিত হয় এবং কমিশনের সভা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এবং সভার কার্যক্রম টেলিভিশনেও সম্প্রচার করা হয়। বিভিন্ন এনার্জি ইউটিলিটি কর্তৃক দেয় নির্ধারিত ফিসের অর্থ দিয়ে কমিশনের ব্যয় নির্বাহ করা হয় (FERC 1996)।

বাংলাদেশের ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে (NEP) এনার্জি সেক্টরের উন্নয়নের স্বার্থে মূল্য নির্ধারণসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজন অনুসারে নিয়মানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ন্যাশনাল এনার্জি অথরিটি (NEA) স্থাপনের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে দেশী ও বিদেশী কনস্যালট্যান্ট নিয়োগ করে গ্যাস রেগুলেটরি কমিশন এবং বিদ্যুৎ সেক্টরের জন্য পাওয়ার রেগুলেটরি কমিশন স্থাপনের বিষয়ে দাতা সংস্থার সহযোগিতায় একাধিক রিপোর্ট ও আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে রেগুলেটরি কমিশন স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায়। এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদীর্ঘ আশি বছরের রেগুলেটরি কমিশনের গঠন, প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করে দেখা যায় :

(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে ফেডারেল পাওয়ার কমিশন সৃষ্টি করা হয় এবং ১৯৭৭ সালে পাওয়ার কমিশন অবলুপ্ত করে গ্যাস, বিদ্যুৎ, তেলের রেগুলেটরি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশেও গ্যাস এবং বিদ্যুতের জন্য আলাদা আলাদা রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি না করে ন্যাশনাল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন নামে একটি স্বতন্ত্র কমিশন স্থাপন করা উচিত। গ্যাস ও বিদ্যুতের জন্য আলাদা আলাদা রেগুলেটরি কমিশন সৃষ্টি করা হলে প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

(খ) অহেতুক রাজনৈতিক সংঘাত এড়াবার জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সুপারিশক্রমে যোগ্য ব্যক্তিদের রেগুলেটরি কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা উচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া উচিত।

(গ) সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাবার লক্ষ্যে বিভিন্ন রেগুলেটরি বিষয় বিবেচনার সময় ইউটিলিটিজগুলেরা ওপর ধার্য নির্দিষ্ট ফিসের অর্থ দিয়ে কমিশনের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(ঘ) গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ সরবরাহে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সর্বসাধারণের প্রকাশ্য শুনানীর মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

দেশে এনার্জির মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি বিতর্কিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এনার্জির মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক এবং ভোক্তাদের সম্যক ধারণার অভাব। সংশ্লিষ্ট সকলে যদি মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতেন তাহলে বোধহয় মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বিতর্কের তীব্রতা কিছুটা কম হত। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১১.৩ গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের প্রচলিত পদ্ধতি

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান কমার্শিয়াল জ্বালানি সম্পদ। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে গ্যাস ব্যবহার করা হলেও এখনও পর্যন্ত গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের জন্য কোন স্বীকৃত এবং স্বচ্ছ পদ্ধতির প্রচলন করা হয়নি।

১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে পরিকল্পিতভাবে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৭৩-৭৮ সময় কালের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল প্রণীত হয়। উক্ত দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্য যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে নির্ধারণ করা হয়। এই পরিকল্পনা দলিলে অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, গ্যাসের উত্তোলন, পরিবহন ও বিতরণের অর্থনৈতিক দিক যথাযথভাবে বিবেচনা করে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হবে (GOB 1973)। পরবর্তীতে কালের ক্রমানুসারে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০), দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫), তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০), চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৫-২০০০) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। সব সময়ই গ্যাসের যথাযথ মূল্য নির্ধারণের জন্য সরকারের ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা-ই আছে।

১৯৭৪ সাল থেকে শুরু করে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশে গ্রাহক পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য সারণী ১১.১ এবং ১১.২-এ দেখানো হয়েছে। সারণীর উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ১৯৯৪ সালের তুলনায় ১৯৯৮ সালে ১৫% এবং ১৯৯৮ সালের তুলনায় ২০০০ সালে গ্যাসের মূল্য ১৫% বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে বর্তমানে প্রচলিত গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিতে সরকার যখন ভাল মনে করেন তখন বিদ্যমান গ্যাসের দামের শতকরা কিছু অংশ যেমন ১৫% বৃদ্ধি করে গ্যাসের নতুন মূল্য নির্ধারণ করেন। পদ্ধতি বোঝার জন্য প্রথমে ১৯৯৪ এর পরে ১৯৯৮ সালে মূল্য বৃদ্ধির পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১৯৯৪ সালের ১ মার্চ থেকে কার্যকর মূল্য বৃদ্ধির পর সরকার পেট্রোবাংলাকে প্রয়োজনবোধে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর থেকে গ্রাহক শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতি বছর সর্বোচ্চ ৫% পর্যন্ত গ্যাসের মূল্য পুনর্নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ৫% এর অধিক মূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সরকারের অনুমোদন নিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। পর্যায়ক্রমে ৫% হারে মূল্য বৃদ্ধি না করে ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৮ থেকে গ্যাসের মূল্য একবারে গড়ে ১৫% বৃদ্ধি করা হয়েছে। অথচ সরকারের ১৯৯৪ সালে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে পেট্রোবাংলা প্রতি বছর ৫% হারে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করলে অথবা পেট্রোবাংলাকে মূল্য বৃদ্ধি করতে দেয়া হলে গ্যাস কোম্পানিগুলো আর্থিকভাবে লাভবান হত, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি হত এবং হঠাৎ করে একবারে ১৫% বৃদ্ধির চেয়ে প্রতি বছর ৫% হারে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে গ্রাহকরাও কম অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। কিন্তু নীতিনির্ধারকদের কাছে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি আর্থিক দিকের চেয়ে রাজনৈতিক দিক দিয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অতীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক সরকার জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ অর্থবছরে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করে

সারণী ১১.১ : গ্রাহক পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য (টাকা/প্রতি ঘনমিটার)

মূল্য বৃদ্ধির তারিখ	বিদ্যুৎ	সার	শিল্প	বাণিজ্যিক	চা-শিল্প	ইটখোলা (মৌসুমী)	গৃহস্থালি			ক্যাপটিভ পাওয়ার
							মিটারযুক্ত	এক বার্ণার (প্রতি মাসে)	দুই বার্ণার (প্রতি মাসে)	
১৯/৬/৭৪	০.১৩	০.১৩	০.২৫	০.৪২	-	-	০.৪২	১৫.০০	২৮.০০	-
১/১২/৭৭	০.১৮	০.১৮	০.৩২	০.৪৬	-	-	০.৪৬	১৬.০০	৩০.০০	-
২/৬/৭৯	০.২২	০.২২	০.৫৭	০.৬০	-	-	০.৫৭	২০.০০	৩৬.০০	-
৭/৬/৮০	০.২৭	০.২৭	০.৬৪	০.৬৭	-	-	০.৬৪	২২.০০	৪০.০০	-
৭/৬/৮১	০.৩৩	০.৩৩	০.৯৮	০.৯৯	-	-	০.৭১	২৫.০০	৪৫.০০	-
১/৭/৮২	০.৩৭	০.৩৭	১.০৯	১.০৯	-	-	০.৯৫	৩৫.০০	৬৫.০০	-
৩০/৬/৮৩	০.৪১	০.৪১	১.২৭	১.২৭	-	-	১.২০	৪৫.০০	৮০.০০	-
২৭/৬/৮৪	০.৪৬	০.৪৬	১.২৭	১.৬০	-	১.৮০	১.২০	৪৫.০০	১০০.০০	-
৩০/৬/৮৫	০.৫৫	০.৫৫	১.৫৩	১.৯২	-	২.১৬	১.৪৪	৬০.০০	১১০.০০	-
২৮/৬/৮৬	০.৬৭	০.৬৭	১.৮৪	২.৩১	-	২.৭৭	১.৫৮	৬৬.০০	১৩০.০০	-
১৮/৬/৮৭	০.৮৮	০.৮৮	১.৮৪	৩.০০	২.৫৫	২.৭৭	১.৯৮	৮০.০০	১৫০.০০	-
১/৭/৮৮	১.০১	১.০১	২.১২	৩.৪৫	২.৯৪	৩.১৮	১.৯৮	৯২.০০	১৭০.০০	-
১/৭/৮৯	১.১৭	১.০১	২.৪৭	৩.৮৮	২.৯৪	-	২.৩০	১০০.০০	১৯৫.০০	-
১/৭/৯০	১.৩৪	১.১৬	২.৮৪	৪.৪৭	৩.৩৮	-	২.৬৪	১১৫.০০	১৯৫.০০	-
১/৭/৯১	১.৩৮	১.২০	৩.০১	৪.৭৪	৩.৫৫	৩.৭৫	২.৬৪	১১৫.০০	১৯৫.০০	-
১/৫/৯২	১.৫২	১.৩২	৩.৩১	৪.৭৪	৩.৮৯	৪.১২	২.৯০	১২৬.০০	২১৫.০০	-
১/৩/৯৪	১.৬৮	১.৪৬	৩.৬৪	৫.২১	৪.০০	৪.৫৩	২.৯০	১৬০.০০	২৫০.০০	২.১২
১/১২/৯৮	১.৯৩	১.৬৮	৪.২০	৬.০০	৪.৬০	৫.২০	৩.৩৫	১৮৫.০০	২৯০.০০	৩.০৫
১/৯/০০	২.২২	১.৯৩	৪.৮৩	৬.৯০	৫.২৯	৫.৯৮	৩.৮৫	২১০.০০	৩৩০.০০	৩.৫০

উৎস : পেট্রোবাংলা

সারণী ১১.২ : গ্রাহক পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য (টাকা/প্রতি ১০০০ ঘনফুট)

মূল্য বৃদ্ধির তারিখ	বিদ্যুৎ	সার	শিল্প	বাণিজ্যিক	চা-শিল্প	ইটখোলা (মৌসুমী)	গৃহস্থালি			ক্যাপটিভ পাওয়ার
							মিটারযুক্ত	এক বার্ণার (প্রতি মাসে)	দুই বার্ণার (প্রতি মাসে)	
১৯/৬/৭৪	৪.৫৯	৪.৫৯	৮.৮৩	১৪.৮৩	-	-	১৪.৮৩	১৫.০০	২৮.০০	-
১/১২/৭৭	৬.৩৫	৬.৩৫	১১.৩০	১৬.২৪	-	-	১৬.২৪	১৬.০০	৩০.০০	-
২/৬/৭৯	৭.৭৭	৭.৭৭	২০.১২	২১.১৮	-	-	২০.১২	২০.০০	৩৬.০০	-
৭/৬/৮০	৯.৫৩	৯.৫৩	২২.৫৯	২৩.৬৫	-	-	২২.৫৯	২২.০০	৪০.০০	-
৭/৬/৮১	১১.৬৫	৮.৩৫	২৪.৭৯	২৫.০৫	-	-	১৭.৯৬	২৫.০০	৪৫.০০	-
১/৭/৮২	১৩.০৬	১৩.০৬	৩৮.৪৮	৩৮.৪৮	-	-	৩৩.৫৪	৩৫.০০	৬৫.০০	-
৩০/৬/৮৩	১৪.৪৭	১৪.৪৭	৪৪.৮৩	৪৪.৮৩	-	-	৪২.৩৬	৪৫.০০	৮০.০০	-
২৭/৬/৮৪	১৬.২৪	১৬.২৪	৪৪.৮৩	৫৬.৪৮	-	৬৩.৫৪	৪২.৩৬	৪৫.০০	১০০.০০	-
৩০/৬/৮৫	১৯.৪২	১৯.৪২	৫৪.০১	৬৭.৭৮	-	৭৬.২৫	৫০.৮৩	৬০.০০	১১০.০০	-
২৮/৬/৮৬	২৩.৬৫	২৩.৬৫	৬৪.৯৫	৮১.৫৪	-	৯৭.৭৮	৫৫.৭৭	৬৬.০০	১৩০.০০	-
১৮/৬/৮৭	৩১.০৬	৩১.০৬	৬৪.৯৫	১০৫.৯০	৯০.০২	৯৭.৭৮	৬৯.৮৯	৮০.০০	১৫০.০০	-
১/৭/৮৮	৩৫.৬৫	৩৫.৬৫	৭৪.৮৪	১২১.৭৯	১০৩.৭৮	১১২.২৫	৬৯.৮৯	৯২.০০	১৭০.০০	-
১/৭/৮৯	৪১.৩০	৩৫.৬৫	৮৭.১৯	১৩৬.৯৬	১০৩.৭৮	-	৮১.১৯	১০০.০০	১৯৫.০০	-
১/৭/৯০	৪৭.৩০	৪০.৯৫	১০০.২৫	১৫৭.৭৯	১১৯.৩১	-	৯৩.১৯	১১৫.০০	১৯৫.০০	-
১/৭/৯১	৪৮.৭১	৪২.৩৬	১০৬.২৫	১৬৭.৩২	১২৫.৩২	১৩২.৩৮	৯৩.১৯	১১৫.০০	১৯৫.০০	-
১/৫/৯২	৫৩.৬৬	৪৬.৬০	১১৬.৮৪	১৬৭.৩২	১৩৭.৩২	১৪৫.৪৪	১০২.৩৭	১২৬.০০	২১৫.০০	-
১/৩/৯৪	৫৯.৩০	৫১.৫৪	১২৮.৪৯	১৮৩.৯১	১৪১.২০	১৫৯.৯১	১০২.৩৭	১৬০.০০	২৫০.০০	৭৪.৮৪
১/১২/৯৮	৬৮.১৩	৫৯.৩০	১৪৮.২৬	২১১.৮০	১৬২.৩৮	১৮৩.৫৬	১১৮.২৬	১৮৫.০০	২৯০.০০	১০৭.৬৭
১/৯/০০	৭৮.৩৭	৬৮.১৩	১৭০.৫০	২৪৩.৫৭	১৮৬.৭৪	২১১.০৯	১৩৫.৯১	২১০.০০	৩৩০.০০	১২৩.৫৫

উৎস : পেট্রোবাংলা

নি। তেমনিভাবে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণকারী রাজনৈতিক সরকার জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ১৯৯৮ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধরে রাখেন।

১৯৯৪ সলের ১লা মার্চ থেকে কার্যকর গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্যাসের একক প্রতি গড় মূল্য ছিল প্রতি ঘনমিটারের জন্য টাকা ১.৯০ বা প্রতি এক হাজার ঘনফুটের জন্য টাকা ৫৪.০। ১৯৯৮ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর গ্যাসের একক প্রতি গড় মূল্য হয়েছে প্রতি ঘনমিটারের জন্য টাকা ২.১৯ বা প্রতি এক হাজার ঘনফুটের জন্য টাকা ৬২.০।

গ্রাহকদের কাছে গ্যাস বিক্রি করে প্রাপ্ত রাজস্ব বন্টনের হিসাব চিত্র ১১.১-এ দেখানো হয়েছে। প্রতি একক গ্যাসের মূল্য CP=১ টাকা হলে প্রাপ্ত রাজস্বের সরকার পায় ৫৫% (GOS=০.৫৫) এবং পেট্রোবাংলা/কোম্পানিসমূহ পায় ৪৫% (COS=০.৪৫%)। সরকারের পাওনা ৫৫% এর মধ্যে ৪১.৯৬% সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি (SD=০.৯৩২৪x COS=০.৯৩২৪ x০.৪৫=০.৪১৯৬) এবং ১৩.০৪% মূল্য সংযোজন কর (VAT=(SD+COS)x০.১৫ =০.১৩০৪) হিসাবে সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা হয়। পেট্রোবাংলার পাওনা ৪৫% অর্থের ৪.০% অর্থ এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি বাপেক্স পায় (ECS=০.০৪), ২.৫% অর্থ হাইড্রোকার্বন ফান্ডে (HFS=০.০২৫) এবং বাকি ৩৮.৫% অর্থ প্রডাকশন, ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি সমূহের ব্যয় নির্বাহের জন্য (PTDCS=০.৩৮৫) রাখা হয়। বিভিন্ন কোম্পানির ব্যয় নির্বাহের জন্য সংরক্ষিত অর্থ (PTDCS=০.৩৮৫) প্রডাকশন, ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির মধ্যে ৩০:৩০:৪০ অনুপাতে বণ্টন করা হয়। সে অনুসারে প্রডাকশন কোম্পানি ব্যয় নির্বাহের জন্য পায় ১১.৫৫% (PCS=০.৩x০.৩৮৫ =০.১১৫৫), ট্রান্সমিশন কোম্পানি পায় ১১.৫৫% (TCS=০.৩x০.৩৮৫=০.১১৫৫) এবং ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি পায় ১৫.৪% (DCS=০.৪x০.৩৮৫=০.১৫৪)। বন্টনের একই আনুপাতিক হারে প্রডাকশন কোম্পানি হাইড্রোকার্বন ফান্ডের ০.৭৫% (HFSP=০.৩x০.০২৫=০.০০৭৫), ট্রান্সমিশন কোম্পানি হাইড্রোকার্বন ফান্ডের ০.৭৫% (HFST=০.৩x০.০২৫=০.০০৭৫) এবং ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি হাইড্রোকার্বন ফান্ডের ১.০% (HFSD=০.৪x০.০২৫=০.০১) পায়। প্রডাকশন কোম্পানি ব্যয় নির্বাহের অংশ এবং হাইড্রোকার্বন ফান্ডের অংশ হিসাবে মোট হিস্যা পায় ১২.৩% (PCM=PCS+HFSP=০.১১৫৫ +০.০০৭৫=০.১২৩)। ট্রান্সমিশন কোম্পানি ব্যয় নির্বাহের অংশ এবং হাইড্রোকার্বন ফান্ডের অংশ হিসাবে মোট হিস্যা পায় ১২.৩% (TCM=TCS+HFST =০.১১৫৫+০.০০৭৫=০.১২৩)। ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ব্যয় নির্বাহের অংশ এবং হাইড্রোকার্বন ফান্ডের অংশ হিসাবে মোট হিস্যা পায় ১৬.৪% (DCM=DCS+HFSD=০.১৫৪+০.০১ =০.১৬৪)।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে গ্যাস বিক্রি করে প্রাপ্ত মোট রাজস্বের বন্টনের পদ্ধতি নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

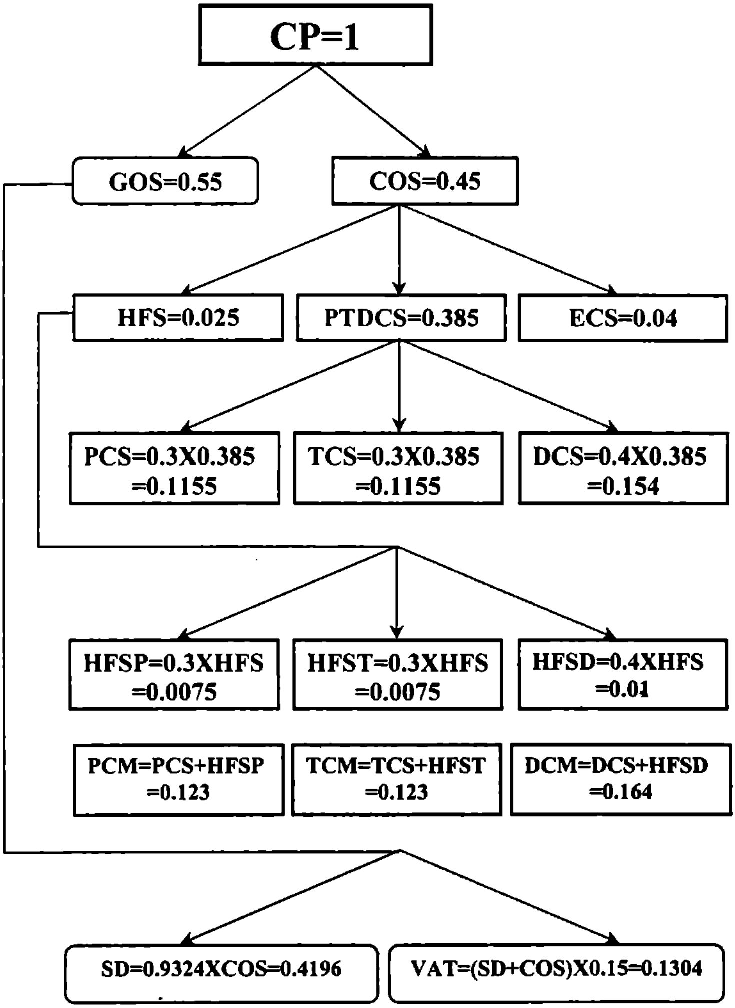
CP=1
GOS=0.55
COS=0.45
HFS=0.025
PTDCS=0.385
ECS=0.04
PCS=0.3X0.385
=0.1155
TCS=0.3X0.385
=0.1155
DCS=0.4X0.385
=0.154
HFSP=0.3XHFS
=0.0075
HFST=0.3XHFS
=0.0075
HFSD=0.4XHFS
=0.01
PCM=PCS+HFSP
=0.123
TCM=TCS+HFST
=0.123
DCM=DCS+HFSD
=0.164
SD=0.9324XCOS=0.4196
VAT=(SD+COS)X0.15=0.1304

চিত্র ১১.১ : গ্যাস বিক্রি করে প্রাপ্ত রাজস্বের বন্টন

মোট উৎপাদিত/বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ VG ঘন মিটার, প্রতি ঘন মিটার গ্যাসের দাম CP টাকা।

গ্যাস বিক্রি করে প্রাপ্ত মোট রাজস্ব, GR=VG x CP।

সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি খাতে পাওনা মোট রাজস্ব, TSD=SD x GR=০.৪১৯৬ x GR।

মূল্য সংযোজন কর খাতে পাওনা মোট রাজস্ব, TVAT=VAT x GR = ০.১৩০৪ x GR।

এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি, বাপেক্স এর পাওনা মোট রাজস্ব TECS=ECS x GR=০.০৪ x GR।

প্রডাকশন কোম্পানির পাওনা মোট রাজস্ব TPCS=PCS x GR=০.১১৫৫ x GR।

প্রডাকশন কোম্পানির হিস্যা হিসাবে পাওনা মোট রাজস্ব প্রডাকশন কাজে সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করতে হবে।

ট্রান্সমিশন কোম্পানির পাওনা মোট রাজস্ব TTCS=TCS x GR=০.১১৫৫ x GR।

ট্রান্সমিশন কোম্পানির হিস্যা হিসাবে পাওনা মোট রাজস্ব ট্রান্সমিশন কাজে সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করতে হবে।

ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির পাওনা মোট রাজস্ব TDCS=DCS x GR=০.১১৫৫ x GR।

ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির হিস্যা হিসাবে পাওনা মোট রাজস্ব ডিস্ট্রিবিউশন কাজে সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করতে হবে।

কোন নির্দিষ্ট কোম্পানির আয়ের অর্থ থেকে কোম্পানির বিভিন্ন খাতের ব্যয় পরিশোধ করার পর যদি কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে তবে সে উদ্বৃত্ত অর্থের ওপর নির্দিষ্ট হারে (৪০%) রাষ্ট্রকে কর্পোরেট ট্যাক্স প্রদান করতে হয়। কর্পোরেট ট্যাক্স প্রদানের পর যদি নীট লাভ থাকে তখন সেখান থেকে কোম্পানির মালিক হিসাবে রাষ্ট্রকে ডিভিডেন্ড প্রদান করতে হয়। বিভিন্ন খাতের পাওনা পরিশোধের পর যদি কোন কোম্পানির উদ্বৃত্ত কোন অর্থ না থাকে তাহলে সে কোম্পানিকে কর্পোরেট ট্যাক্স এবং ডিভিডেন্ড প্রদান করতে হয় না।

বাংলাদেশে বর্তমানে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের জন্য যেমন খুশী তেমন এবং যখন ইচ্ছা তখন শীর্ষক যে পদ্ধতিটি প্রচলিত আছে তা সহজ গাণিতিক হিসাবে ঠিক মনে হলেও অর্থনৈতিক হিসাব অনুসারে ঠিক নয়। গ্যাসের প্রচলিত মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি এবং গ্যাস বিক্রি করা অর্থের বণ্টন পদ্ধতির দুর্বলতা নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় :

(ক) যেহেতু অনেকটা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে গ্যাসের নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয় সেহেতু এ মূল্য বৃদ্ধির ফলে কোম্পানিগুলোর আর্থিক অবস্থা কি হবে তা যত্নের সাথে বিবেচনা করা হয় না। যে বিষয়টি এখানে বেশি গুরুত্ব

পায় তা হল গ্যাস সেক্টর থেকে প্রাপ্ত সরকারের মোট রাজস্ব আয় ঠিক রাখা অথবা বৃদ্ধি করা।

(খ) অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কোম্পানির প্রাপ্য হিস্যা বণ্টন করা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রডাকশন, ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কাজে নিয়োজিত কোম্পানিগুলোর মধ্যে যথাক্রমে ৩০%, ৩০%, ৪০% হারে হিস্যা বণ্টন করা হয়। গ্যাস বিক্রি করে প্রাপ্ত মোট রাজস্ব (১০০%) থেকে সরকারি খাতে ৫৫% এবং বাপেক্সের হিস্যা ৪% বাদে উপরোক্ত অনুপাতে কোম্পানিগুলোর পাওনা হিসাব করা হলে প্রডাকশন কোম্পানি ১২.৩% (৪১%x০.৩), ট্রান্সমিশন কোম্পানি ১২.৩% (৪১%x০.৩) এবং ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ১৬.৪% (৪১%x০.৪) পায়। একই শ্রেণীভুক্ত (প্রডাকশন, ট্রান্সমিশন, ডিস্ট্রিবিউশন) একাধিক কোম্পানিকে সমহারে গ্যাসের দামের অংশ বিতরণ অর্থনৈতিক দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা প্রতিটি কোম্পানির কার্যক্রম এবং আর্থিক ব্যয় এক নয়। একারণে বছর শেষে বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত কোম্পানিগুলোর লাভ বা ক্ষতির হিসাব বাস্তব ক্ষেত্রে কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা সূচকের প্রতিফলন নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনুমানের ভিত্তিতে হিস্যা বণ্টনের কারণে কোন কোন কোম্পানি কোটি কোটি টাকা সিস্টেম লস থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে লাভ দেখাতে সক্ষম হয়। আবার কোন কোন কোম্পানি সিস্টেম লস না থাকা সত্ত্বেও বছরের পর বছর লোকসান দেখাতে বাধ্য হয় এবং ব্যাংক থেকে টাকা ধার করে কোম্পানির ব্যয় মিটাতে হয়।

(গ) ওয়াকার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড (WPPF অ্যাক্ট ১৯৬৮ এবং ১৯৮৫) অনুসারে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোন কোম্পানি লাভ করলে উক্ত কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা লাভের ৫% দিতে হয়। এর ফলে কোন কোম্পানির সিস্টেম লস থাকা সত্ত্বেও কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা লাভের ৫% পেতে থাকে। সিস্টেম লস না হলে সে টাকাটা সরকার ডিভিডেন্ড হিসাবে পেত পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে সিস্টেম লসের ক্ষতি সরকারকে বহন করতে হয়, সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

(ঘ) বাংলাদেশে সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে মাটির নিচে প্রাপ্ত গ্যাস সম্পদের মালিক প্রজাতন্ত্র। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত গ্যাসের মূল্যের হিস্যা বণ্টন পদ্ধতিতে গ্যাসের কোন সম্পদ মূল্য ধরা হয়নি। সংবিধান বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে মত দিতে পারেন যে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন গ্যাস সম্পদকে মূল্যহীন ধরে গ্যাসের গ্রাহক পর্যায়ের মূল্য নির্ধারণ করা কতটা যুক্তিসঙ্গত? বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় মিটাবার জন্য সম্পূরক কর ও মূল্য সংযোজন কর ধার্য করে গ্যাসের গ্রাহক পর্যায়ের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু সম্পদ হিসাবে গ্যাসের কোন মূল্যই ধরা হয় নি।

(ঙ) গ্যাস বিক্রি করা মোট রাজস্ব আয়ের অতি সামান্য অংশ (২.৫%) কোম্পানিগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য হাইড্রোকার্বন ফান্ডে সংরক্ষণ করে কোম্পানিগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হয়। এ অর্থ কোম্পানিগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে স্বাধীনতার প্রায় তিন দশক পরেও এ রকম একটি নাজুক পদ্ধতি চালু থাকলো কিভাবে? খারাপ হোক আর ভাল হোক একবার একটা পদ্ধতি চালু হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট সকলে সে পদ্ধতি চালু রাখতে ইচ্ছুক হয় এবং নতুন পদ্ধতি যতই যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন তা গ্রহণ করতে নানা অজুহাত তুলে ধরে। আর যে সকল সুবিধাবাদী গোষ্ঠী এ দুর্বল পদ্ধতির ফল ভোগ করে আসছে তারা নিজ স্বার্থে এ পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতা করে। দৃঢ় রাজনৈতিক প্রত্যয় এবং সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে আন্তরিক রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া এ ধরনের সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই মুশকিল। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদেরকে প্রথমে অনেক ধৈর্যের সাথে সমস্যা অনুধাবন করতে হবে।

১১.৪ গ্যাসের মূল্য নির্ধারণে আর্থ-সামাজিক দিক

গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের সময় আর্থ-সামাজিক দিক বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক দ্বিমুখী; একটি প্রত্যক্ষ এবং অপরটি পরোক্ষ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিষয়গুলো আলোচনায় গুরুত্ব পায় এবং পরোক্ষ বিষয়গুলো কম গুরুত্ব পায় এবং অনেক ক্ষেত্রে আলোচিত হয় না। প্রকৃত পক্ষে গ্যাস সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় বিষয়ই গুরুত্বের সাথে আলোচিত হওয়া উচিত। এ কারণে প্রত্যক্ষ বিষয়ে আলোচনা করার আগে পরোক্ষ বিষয়ের আলোচনা করা শ্রেয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য গ্যাস সেক্টর সরকারের কাছে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় সেক্টর। কেননা এ সেক্টর থেকে সরকার বছরে গড়ে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে এবং সে অর্থ সরকার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করে। গ্যাস সেক্টর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব অন্য সেক্টরে বিনিয়োগের আগে সরকারের গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের বিষয় বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এমনটা যেন না হয় যে খাদ্যাভাবে সোনার ডিম দেয়া রাজহাঁসটি (গ্যাস সেক্টর) ডিম দেয়া বন্ধ করে দেয়।

অতীতে গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নের জন্য যথাসময় পর্যাপ্ত অর্থ প্রাপ্তির অভাবে গ্যাস সেক্টরে সংকট দেখা দেয়ার ঘটনা ঘটেছিল। গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নের প্রয়োজন মিটানোর পর অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে তা গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করেই মিটাতে হবে - গ্যাস সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ বা মন্থর করে নয়। গ্যাস সেক্টর থেকে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার আর একটি উপায় হচ্ছে সিস্টেম লসের নামে চুরি বন্ধ করা। অনেক সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক যোগসূত্রে শক্তিশালী গোষ্ঠীর চাপে কোম্পানিগুলোর

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সিস্টেম লস বন্ধের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারেন না। ক্রমাগতভাবে সিস্টেম লসের নামে রক্ত ক্ষয় হতে থাকলে সোনার ডিম দেয়া রাজহাঁসটি এক সময় রক্তশূন্যতার জন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে। অর্থনীতি এবং একাউন্টিং অত্যন্ত স্বচ্ছ বিজ্ঞান। এখানে গোজামিল বা ধামাচাপার কোন সুযোগ নেই। গ্যাস সেক্টরের আয়-ব্যয়-বিনিয়োগ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দিকগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এবারে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আর্থিক বিবেচনায় গ্যাস ক্ষেত্রের নিকটবর্তী গ্রাহকদের কাছে গ্যাস সরবরাহ খরচ কম এবং দূরবর্তী গ্রাহকদের কাছে গ্যাস সরবরাহ খরচ বেশি। প্রতিটি এলাকার সুষম উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে গ্যাস ক্ষেত্র থেকে দূরে ও কাছে অবস্থিত একই শ্রেণীর গ্রাহকদের জন্য গ্যাসের মূল্য সমান রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন গ্রাহক শ্রেণীর জন্য গ্যাসের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি ঘন মিটারে গ্যাসের নির্ধারিত মূল্যের ক্রমানুসারে এ সম্বন্ধে বিবরণ ও মন্তব্য উপস্থাপন করা হল (সারণী ১১.১)। দেশের কৃষি উৎপাদনের জন্য ন্যূনতম দামে সার সরবরাহ করার প্রয়োজনে সার উৎপাদনের জন্য গ্যাসের মূল্য সবচেয়ে কম টাকা ১.৬৮/ঘনমিটার নির্ধারণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দেশের ৬টি রাসায়নিক সার কারখানায় মোট গ্যাসের ২০-২৫% গ্যাস ব্যবহৃত হয়। বড় গ্রাহক হিসাবে সারকারখানায় গ্যাসের সরবরাহ ও বিতরণ ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। যে কারণে আর্থিক বিবেচনায়ও সার কারখানায় সরবরাহকৃত প্রতি একক গ্যাসের দাম সাধারণ গ্রাহকদের তুলনায় কম হওয়াটা যৌক্তিক। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গ্যাসের গড় মূল্য প্রতি ঘনমিটার টাকা ২.১৯। সার উৎপাদনের জন্য প্রতি ঘন মিটার গ্যাসের মূল্য টাকা ১.৬৮ নির্ধারণের ফলে অন্য শ্রেণীর গ্রাহকদের কাছে অধিক মূল্যে গ্যাস বিক্রি করে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। সার কারখানায় যে গ্যাস সরবরাহ করা হয় তার এক অংশ কাঁচামাল হিসাবে এবং অপর অংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সার কারখানায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে (বিপিডিবি) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরবরাহকৃত গ্যাসের দামের সমান (প্রতি ঘনমিটার টাকা ১.৯৩) হওয়া উচিত।

বাংলাদেশে ব্যবহৃত মোট গ্যাসের ৪৫-৫০% এর অধিক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দেশের ৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন বিদ্যুৎ ইউনিটে ব্যবহৃত হয়। দেশে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের প্রায় ৮০% গ্যাস থেকে উৎপাদিত হয়। দেশের শিল্পখাতসহ অন্যান্য খাতের উন্নয়ন এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিবেচনা করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে টাকা ১.৯৩। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাসের দাম মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচের ৪৩%। এ কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম টাকা

১.৬৮ থেকে টাকা ১.৯৩ তে বৃদ্ধির জন্য বিদ্যুতের মূল্য ৬.৫% বৃদ্ধি করা উচিত। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গড় দামের তুলনায় কিছু কম দামে গ্যাস বিক্রির কারণে অন্য শ্রেণীর গ্রাহকদের কাছে অপেক্ষাকৃত অধিক দামে গ্যাস বিক্রি করে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য গ্যাসের মূল্য, গড় গ্যাসের মূল্য টাকা ২.১৯ প্রতি ঘনমিটার হওয়া বেশি যুক্তিসঙ্গত হত।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুতের অভাবের কারণে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য শুল্কমুক্ত জেনারেটর আমদানির অনুমতি প্রদান এবং শিল্পকারখানার জন্য নির্ধারিত দামের (টাকা ৪.২০/ঘনমিটার) চেয়ে কম দামে ক্যাপটিভ জেনারেশনের জন্য প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম টাকা ৩.০৫ নির্ধারণ করেছেন। বর্তমান অবস্থায় শিল্পকারখানার বিদ্যুৎ চাহিদা মিটাবার প্রয়োজনে এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত।

গৃহস্থালি কাজে মিটারযুক্ত গ্রাহকদের জন্য গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে টাকা ৩.৩৫ প্রতি ঘনমিটার। বিভিন্ন কমিউনিটি কিচেন (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিরক্ষা বিভাগ, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি, সরকারি শিশুসদন এর মেস ও ক্যান্টিনে রান্নার কাজে ব্যবহৃত গ্যাস) মিটারযুক্ত গ্যাসের গৃহস্থালি গ্রাহক। অনেক লোকের খাবার একত্রে রান্না করা হলে economy of scale এর benefit পাওয়া যায়। যে কারণে এ শ্রেণীর গ্রাহককে টাকা ৩.৩৫ হারে গ্যাস সরবরাহ করা হলে একদিকে গ্রাহকরা উপকৃত হন। অন্যদিকে এ সকল গ্রাহকরা বিকল্প জ্বালানি হিসাবে কাঠ ব্যবহার না করার কারণে দেশ পরিবেশগত দিক দিয়ে লাভবান হয় এবং কেরোসিন ব্যবহার না করার কারণে কেরোসিন আমদানি না করার জন্য রাষ্ট্রের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়।

গৃহস্থালি কাজে মিটারবিহীন গ্যাসের মাসিক বিল সিঙ্গেল বার্ণারের জন্য টাকা ১৮৫.০০ এবং ডাবল বার্ণারের জন্য টাকা ২৯০.০০ ধার্য করা হয়েছে। গৃহস্থালি কাজে মিটারযুক্ত ব্যবহারকারীদের গ্যাসের হার হচ্ছে প্রতি ঘনমিটার টাকা ৩.৩৫। যদি একজন মিটার বিহীন সিঙ্গেল বার্ণারের গ্রাহককে মিটারের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার করতে হত তাহলে মাসে দেয় টাকা ১৮৫ টাকার বিনিময়ে তিনি ৫৫.২ ঘনমিটার বা গড়ে তিনি প্রতিদিন ১.৮৪ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার করতে পারতেন। এক বার্ণারে গড়ে গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ প্রতি ঘণ্টায় ০.৩৫ ঘনমিটার। হিসাব মতে প্রতিদিনের প্রাপ্য গ্যাস দিয়ে একটি সিঙ্গেল বার্ণার ৫.২৫ ঘন্টা (১.৮৪ ÷ ০.৩৫) জ্বালানো সম্ভব হত। একটি ডাবল বার্ণারের প্রতি ঘণ্টায় গড় গ্যাস ব্যবহারের ক্ষমতা ০.৫৮ ঘনমিটার। যদি একজন ডাবল বার্ণারের গ্রাহককে মিটারের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার করতে হত তাহলে মাসে দেয় টাকা ২৯০ টাকার বিনিময়ে তিনি ৮৬.৬ ঘনমিটার বা গড়ে তিনি প্রতিদিন ২.৯০ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার করতে পারতেন। উপরোক্ত হিসাব অনুসারে প্রতিদিনের প্রাপ্য গ্যাস দিয়ে একটি ডাবল বার্ণার ৫ ঘণ্টা (২.৯০÷০.৫৮) জ্বালানো সম্ভব হত। উপরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে একজন মিটার বিহীন গ্রাহক প্রতিদিন গড়ে ৫ ঘণ্টা গ্যাসের বার্ণার জালাবেন এ হিসাব ধরে সিঙ্গেল বার্ণার ও ডাবল বার্ণারের মাসিক বিল

নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি দিয়াশলাই-এর কাঠি বাঁচাবার জন্য মিটারবিহীন গ্যাসের গ্রাহকরা গড়ে প্রতিদিন কত ঘণ্টা গ্যাস জ্বালান তা সকলের জানা। বাংলাদেশে ১৯৯৯ সালে গ্যাসের মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল প্রায় ৯.০ লক্ষ। এর মধ্যে বেশি সংখ্যক গ্রাহকই (প্রায় ৮.৭৫ লক্ষ গ্রাহক) গৃহস্থালি কাজে গ্যাস ব্যবহার করেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে গৃহস্থালি কাজের জন্য গ্যাস সরবরাহ করা গ্যাস কোম্পানির জন্য অলাভজনক। এর অর্থ হচ্ছে এই লক্ষ লক্ষ গ্যাস ব্যবহাকারীদের গ্যাস সরবরাহ করতে যে বিনিয়োগ করতে হয় তা উঠিয়ে আনতে গ্যাস কোম্পানির বহু বছর সময় লাগে। অন্য দিক দিয়ে মিটারবিহীন গ্যাস সরবরাহ গ্যাস সেক্টরে সিস্টেম লসের একটি কারণ। গ্যাস বিতরণ কোম্পানি প্রডাকশন ও ট্রান্সমিশন কোম্পানির কাছ থেকে মিটারের মাধ্যমে মেপে গ্যাস ক্রয় করে। এরপর বিতরণ কোম্পানি বিভিন্ন মিটারযুক্ত গ্রাহকদের কাছে বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণের সাথে প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা বার্ণার জ্বলবে এ হিসাব বিবেচনা করে গৃহস্থালি গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ নির্ধারণ করে। ক্রয় মিটার অনুসারে গ্রহণকৃত মোট গ্যাসের পরিমাণ থেকে মিটারের মাধ্যমে বিক্রিত সকল গ্রাহকদের গ্যাসের পরিমাণ ও অনুমানের ভিত্তিতে হিসাব করা গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত মোট গ্যাসের পরিমাণ বিয়োগ করে যে পরিমাণ গ্যাসের হিসাবে পাওয়া যায় না সে পরিমাণ গ্যাসকে হিসাবের খাতায় সিস্টেম লস হিসাবে দেখানো হয়।

যেহেতু সিস্টেম লসের গ্যাসের দামের হিসাবের টাকা সরকারকে লস হিসাবে দেখাবার সুযোগ আছে সে কারণে সিস্টেম লস কমাবার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। পৃথিবীতে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে মাপা ছাড়া গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের জন্য গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশনের নজির আর দ্বিতীয়টি নেই। সিস্টেম লস কমাবার উদ্দেশ্যে গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করা হলে পাল্টা যুক্তি আসে যে গৃহস্থালি মিটার ক্রয় করতে এবং মিটার রিডিং লিখে এনে বিল করতে যে ব্যয় হবে তার চেয়ে বর্তমানে প্রচলিত মিটারবিহীন গ্যাস বিক্রির ব্যবস্থা কোম্পানির জন্য লাভজনক। এ যুক্তির বিপক্ষে যুক্তি হল যে প্রতি গৃহস্থালি গ্রাহকের জন্য আলাদা আলাদা মিটার বসানোর পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী অনেক গৃহস্থালি গ্রাহকদের জন্য এলাকা ভিত্তিতে একটি গ্যাস মিটার স্থাপন করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অথবা প্রতিষ্ঠানকে মিটারের রিডিং অনুসারে গ্যাস কোম্পানিকে বিল পরিশোধের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব এলাকার মধ্যে নিজস্ব ব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে অথবা no loss no profit অনুসারে বিভিন্ন গৃহস্থালি গ্রাহকদের বিল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থা প্রচলন করা হলে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির গৃহস্থালি গ্রাহকের সংখ্যা কমবে এবং সিস্টেম লস কমার কারণে রাজস্ব আয় বাড়বে।

উদাহারণস্বরূপ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির বিতরণ এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এ মোট ২৪টি মিটারযুক্ত এবং ২০০টিরও বেশি মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহক আছে। তিতাস কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসে

প্রতিটি গ্রাহকের নামের তালিকা অনুসারে ২২৪টি বিল প্রেরণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টস অফিস বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে সরাসরি ২২৪টি বিলের দাবীকৃত টাকা তিতাস গ্যাস কোম্পানিকে পরিশোধ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বসবাসকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনের বিল থেকে সিঙ্গেল বার্ণার, ডবল বার্ণার হিসাবে নির্ধারিত বিলের টাকা কেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট একাউন্টে জমা করে। প্রস্তাব অনুসারে তিতাস গ্যাস কোম্পানি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বা একাধিক মাস্টার মিটার বসায়ে গৃহস্থালির মিটার রেট (প্রতি ঘনমিটারে টাকা ৩.৩৫) অনুসারে বিল দাবি করতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্তমান প্রচলিত ২২৪টি বিলের পরিবর্তে একটি বা দুইটি মাষ্টার মিটারের পরিমাপ অনুসারে গ্যাসের বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুসারে তিতাস গ্যাস কোম্পানির বিল পরিশোধ করে দিবে। অন্যদিকে বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুসারে বাসায় বসবাসকারীদের বেতনের বিল থেকে গ্যাস বিল কেটে রাখবে। এ ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে অহেতুক গ্যাস বার্ণার জ্বালিয়ে রাখার কারণে সিস্টেম লস হলে তার দায়ভার বিশ্ববিদ্যালয়কে বহন করতে হবে। অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিস্টেম লস কমাবার জন্য নিজস্ব এলাকায় অবস্থিত গ্যাস গ্রাহকদের জন্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ন্যায় আলাদা আলাদা মিটার লাগাবার ব্যবস্থা করবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্তমানে মোট ৪টি ক্রয় মিটারের মাধ্যমে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (DESA) এর কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে সরাসরি ডেসা-কে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে। অন্য দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মিটার এবং নিজস্ব মিটার রিডারের মাধ্যমে আবাসিক এলাকার প্রতিটি বাসার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের আলাদা বিদ্যুৎ বিল প্রণয়ন করে বেতন বিলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খরচের টাকা আদায় করে থাকে। রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (REB) এর অধীনে পরিচালিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (PBS) গুলোর কার্যক্রমও একইভাবে পরিচালিত হয়। একটি নির্দিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এলাকার আওতাধীন বিদ্যুতের সিস্টেম লসের দায়ভার উক্ত সমিতির আওতাধীন সকল গ্রাহকদের বহন করতে হয়। এর ফলে সরকার বা আরইবিকে সিস্টেম লসের দায়ভার বহন করতে হয় না। গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি নির্ধারণের সাথে সাথে গ্যাসের বিল সংগ্রহ ও পরিশোধের প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি দেয়ার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতির বিবেচনায় গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারকারীদের রান্নার কাজে মাসিক জ্বালানি খরচের হিসাব পর্যালোচনা করে মিটারবিহীন গ্যাস গ্রাহকদের মাসিক হার নির্ধারণ করা উচিত। গ্যাস সরবরাহ এলাকার বাইরে একটি পরিবারকে জ্বালানি কাঠ দিয়ে রান্না করা হলে মাসে ৫ মন জ্বালানি কাঠের দাম বাবদ টাকা ৫০০-৬০০ ব্যয় করতে হয়। কেরোসিন দিয়ে রান্না করলে প্রতি মাসে ২৫ লিটার কেরোসিন বাবদ মাসে টাকা ৩৭৫-৪০০ ব্যয় করতে হয়,

এলপিজি দিয়ে রান্না করলে প্রতি মাসে ১.৫ সিলিন্ডার এলপিজি বাবদ টাকা ৩৭৫ ব্যয় করতে হয় (যদি নিয়মিতভাবে পাওয়া যায়)। এমতাবস্থায় মিটারবিহীন গ্যাস ব্যবহারকারীদের জন্য সিঙ্গেল বার্ণারে প্রতি মাসে টাকা ১৮৫.০০ এবং ডবল বার্ণারে প্রতি মাসে টাকা ২৯০ বিল নির্ধারণ করা কতটা যুক্তিসঙ্গত তা পাঠকের বিবেচনার জন্য রেখে দিলাম।

গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের সময় অনুমান করা হয় যে, অপেক্ষকৃত নিম্ন আয়ভুক্ত গ্রাহক সিঙ্গেল বার্ণার এবং উচ্চ আয়ভুক্ত গ্রাহক ডবল বার্ণার ব্যবহার করবেন। এ কারণে সিঙ্গেল বার্ণারের মাসিক বিল কম। মিটারবিহীন গ্রাহকদের প্রায় ৬২% সিঙ্গেল বার্ণার এবং ৩৮% ডবল বার্ণার ব্যবহার করে থাকেন। গ্যাস কোম্পানির মাঝেমাঝে নিরপেক্ষ সার্ভের মাধ্যেমে নিরূপণ করা উচিত যে, যে সকল গ্রাহক সিঙ্গেল বার্ণার ব্যবহারের জন্য আবেদন করে গ্যাস নিয়েছে তারা বাস্তবে পরবর্তীতে ডবল বার্ণার বা একাধিক বার্ণার ব্যবহার করছে কি-না? এ ধরনের অবৈধ গ্যাস ব্যবহারও সিস্টেম লসের কারণ হতে পারে।

গৃহস্থালি কাজে গ্যাস সরবরাহের আর্থ-সামাজিক দিক আলোচনার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা থেকে প্রায়শই বাদ পড়ে যায়। হাজার হাজার গরীব পরিবার গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন লাইনের আশে পাশে বাস করেও গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ পায় না। গ্যাস কোম্পানির বর্তমানে প্রচলিত নিয়মে জমির মালিক বা স্থায়ী ঠিকানার বাসিন্দা না হওয়ার কারণে তাদেরকে গৃহস্থালি কাজে গ্যাস সংযোগ দেয়ার কোন নিয়ম নেই। অথচ একটু আন্তরিকতার সাথে চিন্তা করলে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং নিয়মনীতির পাশাপাশি গরিব-সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও নিয়মনীতি অনুমোদন করে গরিব মানুষদেরকে নির্ধারিত মূল্যে রান্নার জন্য গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব। গ্যাস কোম্পানির লক্ষ লক্ষ গৃহস্থালি গ্যাস গ্রাহক মিটারবিহীন গ্যাস ব্যবহারের সুযোগে বার্ণার জ্বালিয়ে রেখে লক্ষ লক্ষ ঘনফুট গ্যাস অপচয় করছে। কোন কোন শিল্প মালিকরা গ্যাস মিটারকে বাইপাস করে অবৈধ গ্যাস ব্যবহার করছে। আন্তর্জাতিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি (KAFCO)-কে বিশেষ মূল্য সুবিধা দিয়ে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে এ বিষয়গুলো মোটেই অজানা নয়। সিস্টেম লস নামে একটি শব্দ ব্যবহার করে হিসাবের খাতায় গোজামিল দেয়ার প্রথা বহু বছর ধরে চলে আসছে। অথচ বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করে গরিব পরিবারকে নির্ধারিত মূল্যে গ্যাস সরবরাহের প্রশ্ন উঠলে অনেক অসুবিধার অজুহাত দেখিয়ে সিদ্ধান্ত না নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দারিদ্র্য দূরীকরণের আলোচনা উঠলে ইনিয়ে-বিনিয়ে কত সুন্দর কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে গরীবদের সুন্দরভাবে বাঁচার সুযোগ করে দেয়ার প্রশ্ন আসলে পকেট থেকে দু'একটা টাকা দান করে দায়িত্ব পালন করা হয়েছে বলে মনকে সান্ত্বনা দেয়া হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নির্বাচনের আগে ভোটের জন্য গরিবদের দাম অনেক বাড়ে। তখন অর্থের বিনিময় গণতন্ত্র ক্রয় করা হয়। কিন্তু নির্বাচনের পরে গরিবরা মূল্যহীন

হয়ে পড়ে। সে কারণেই গরিবদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের চিন্তা চেতনায় ভাটা পড়ে।

শিল্পকারখানা এবং ইটখোলায় সাংবাৎসরিক ব্যবহারের জন্য প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য টাকা ৪.২০। শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত বিকল্প জ্বালানি ফার্নেস অয়েল-এর দাম প্রতি লিটার টাকা ৫.০ এবং ইট খোলায় ব্যবহৃত কয়লার দাম প্রতি টন টাকা ২৫০০-৩০০০। তাপ প্রদানের পরিমাপ অনুসারে গ্যাস, ফার্নেস অয়েল এবং কয়লার দাম যথাক্রমে টাকা ১০৯/গিগাজুল, টাকা ১২৭/গিগাজুল, টাকা ৯৩/গিগাজুল। তুলনামূলক হিসাবে গ্যাস থেকে প্রাপ্ত তাপের মূল্য ফার্নেস অয়েল-এর চেয়ে কম এবং কয়লার চেয়ে বেশি। মৌসুমী ইট খোলার জন্য প্রতি ঘনফুট গ্যাসের মূল্য টাকা ৫.২০, যা সাংবাৎরিক ইটখোলার গ্যাসের দামের চেয়ে ২৪% বেশি। মৌসুমী ইটখোলায় গ্যাস সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপনের বিনিয়োগের খরচ উঠাবার জন্য ২৪% বেশি দাম যুক্তিযুক্ত। মৌসুমী ইট খোলার মালিকরা নির্ধারিত গ্যাসের দাম বেশি মনে করলে কম দামে কয়লা কিনে জ্বালানির প্রয়োজন মিটাতে পারবে।

চা বাগানে ব্যবহারের জন্য প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য টাকা ৪.৬০। চা বাগানগুলো বিচ্ছিন্ন যায়গায় অবস্থিত হওয়ায় এগুলোতে গ্যাস সরবরাহের অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ শিল্পাঞ্চলে গ্যাস-অবকাঠামোর জন্য বিনিয়োগের চেয়ে কম লাভজনক। সম্ভবত সে কারণে শিল্পকারখানার জন্য নির্ধারিত প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম টাকা ৪.২০ এর পরিবর্তে চা বাগানের জন্য প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম টাকা ৪.৬০ নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক কার্যে (হোটেল, রেস্তোরাঁ, বেকারী, সাবান কারখানা ইত্যাদি) জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে টাকা ৬.০০ (টাকা ২৩২/গিগাজুল)। এক্ষেত্রে সম্ভবত ধারণা করা হয়েছে এ সকল ব্যবহারকারী প্রয়োজনে গ্যাসের দামের খরচ সহজেই ভোক্তাদের ওপর চালিয়ে দিতে পারে। এছাড়া এ সকল ব্যবহারকারী ইচ্ছা করলে এর চাইতে কম দামে বিকল্প জ্বালানি হিসাবে ফার্নেস অয়েল (টাকা ১২৭/গিগাজুল), জ্বালানি কাঠ (টাকা ২০০/গিগাজুল) এবং কয়লা (টাকা ৯৩/গিগাজুল) ব্যবহার করতে পারে। বাস্তবে দেখা যায় যে অনেক হোটেল ও রেস্তোরাঁর মালিকরা পরিবেশগত কারণে বিকল্প জ্বালানি হিসাবে বেশি দামের কেরোসিন (টাকা ৪৪৬/গিগাজুল) ব্যবহার করে।

গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের সময় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক দিক বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। তবে গ্যাস সেক্টরের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে গ্যাস সেক্টরের আর্থিক অবস্থা এবং উন্নয়নকে অবহেলা করে কোনভাবেই আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত হবে না। ২টি আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি ইতোমধ্যে তাদের উত্তোলিত গ্যাস সরবরাহ শুরু করেছে। প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট-এর শর্তানুসারে কোম্পানি দুইটির সরবরাহকৃত গ্যাসের পাওনা বিল নির্ধারিত দামে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হচ্ছে এবং হবে। এমতাবস্থায় সুনির্দিষ্ট এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে গ্রাহক

পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ এবং সিস্টেম লস বন্ধ করে যথাসময়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে গ্যাসের মূল্য আদায় করা আগের তুলনায় অনেক বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। বর্তমানে প্রচলিত "যেমন খুশি তেমন এবং যখন ইচ্ছা তখন" গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির পদ্ধতি অনুসরণ করা চলতে থাকলে যে কোন সময় গ্যাস সেক্টরে বড় ধরনের আর্থিক বিপর্যয় ঘটতে পারে।

১১.৫ আন্তর্জাতিক কোম্পানির গ্যাস সরবরাহ ও প্রচলিত পদ্ধতিতে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ

১৯৯৮ সালে শেল সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র থেকে এবং ১৯৯৯ সালে ইউনোকল জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে প্রডাকশন শেয়ারিং চুক্তির অধীনে গ্যাস সরবরাহ শুরু করে। দু'টি আন্তর্জাতিক কোম্পানি ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে মোট ব্যবহৃত গ্যাসের যথাক্রমে ১২.৩% এবং ২১.৪% সরবরাহ করেছে। পিএসসি চুক্তির আওতায় ইউনোকল কর্তৃক জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে সরবরাহকৃত গ্যাসের কূপমুখে ক্রয় মূল্য (wellhead price of gas) সিঙ্গাপুর বাজারে (FOB Singapore) HSFO-এর তাপানুপাতিক দামের ৭৫% এবং সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র থেকে শেল কেয়ার্ণ কর্তৃক সরবরাহকৃত গ্যাসের ক্রয় মূল্য হচ্ছে HSFO-এর সিঙ্গাপুরের তাপানুপাতিক দামের ৯৩.৭৫%। সিঙ্গাপুরের বাজারে HSFO-এর দামের মাত্রাহীন উঠানামার ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যা এড়াবার জন্য পিএসসি চুক্তিতে জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য HSFO-এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেয়া হয়েছে যথাক্রমে প্রতি টন ৭০ ডলার এবং ১৪০ ডলার; সে অনুসারে তাপানুপাতিক হিসাবে জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদিত প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাসের দাম হয় যথাক্রমে ১.৪২৪ ডলার এবং ২.৮৪৮ ডলার। সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য HSFO সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেয়া হয়েছে যথাক্রমে প্রতি টন ৭০ ডলার এবং ১২০ ডলার; সে অনুসারে তাপানুপাতিক হিসাবে সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদিত প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাসের দাম হয় যথাক্রমে ১.৭৮০ ডলার এবং ৩.০৫১ ডলার। জালালাবাদ ও সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রের ১০০০ ঘনফুট গ্যাসের কূপমুখে দামের গড় (average wellhead price of gas) হয় যথাক্রমে ২.১৩৬ ডলার এবং ২.৪১৬ ডলার।

পিএসসির শর্তানুসারে সরকার/পেট্রোবাংলা এবং IOC এর মধ্যে উত্তোলিত গ্যাস বণ্টনের indicative হিসাব চিত্র ১১.২-এ দেখানো হয়েছে। প্রথমে কূপমুখে গ্যাস (WG)-কে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যথা কস্ট রিকভারি অংশ ৫৫% (CRF=০.৫৫) এবং প্রফিট অংশ ৪৫% (PF=০.৪৫)। কস্ট রিকভারি অংশের পুরোটাই আন্তর্জাতিক কোম্পানি পায়। প্রফিট গ্যাসের ৭০% সরকার পায় অর্থাৎ সরকার মোট উত্তোলিত গ্যাসের ৩১.৫% (GSP=০.৭০x০.৪৫=০.৩১৫) পায়। প্রফিট গ্যাসের ৩০% আন্তর্জাতিক কোম্পানি পায় অর্থাৎ কোম্পানি মোট উত্তোলিত গ্যাসের ১৩.৫% (CSP=০.৩০x০.৪৫=০.১৩৫) পায়। আন্তর্জাতিক কোম্পানি কস্টরিকভারি এবং প্রফিট অংশ বাবদ মোট গ্যাসের ৬৮.৫% (CSG=CRF+CSP=০.৫৫+০.১৩৫ =

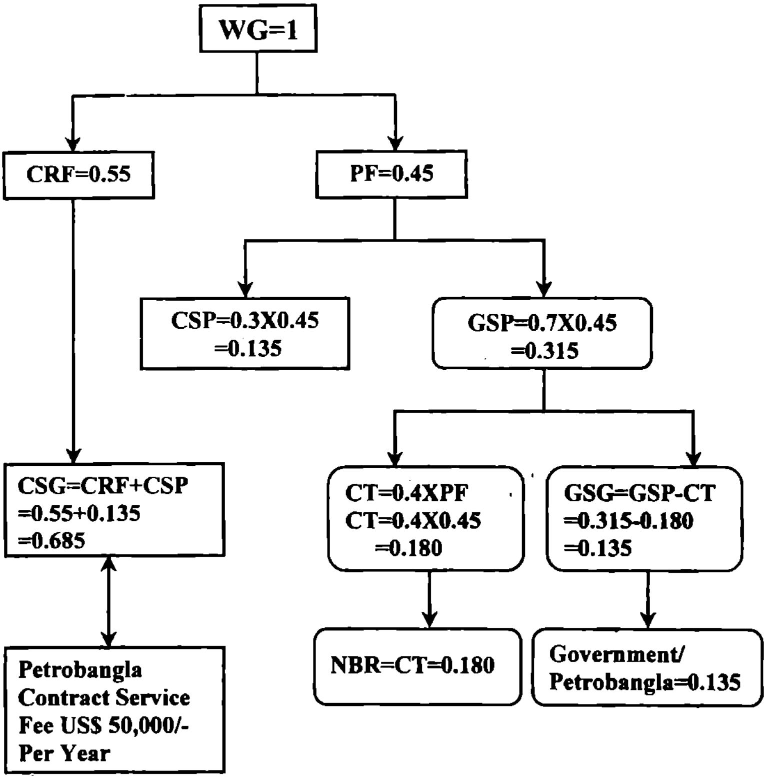
WG=1
CRF=0.55
PF=0.45
CSP=0.3X0.45
=0.135
GSP=0.7X0.45
=0.315
CSG=CRF+CSP
=0.55+0.135
=0.685
CT=0.4XPF
CT=0.4X0.45
=0.180
GSG=GSP-CT
=0.315-0.180
=0.135
Petrobangla
Contract Service
Fee US$ 50,000/-
Per Year
NBR=CT=0.180
Government/
Petrobangla=0.135

চিত্র ১১.২ঃ পিএসসির শর্তানুসারে সরকার ও আন্তর্জাতিক কোম্পানির মধ্যে গ্যাস বন্টনের Indicative হিসাব

০.৬৮৫) পায়। সরকারের প্রাপ্ত ৩১.৫% থেকে লাভের ওপর ৪০% হারে কর্পোরেট ট্যাক্স দিতে হয়। কর্পোরেট ট্যাক্স হিসাবে দেয়া অর্থ মোট গ্যাসের ১৮.০% (CT=০.৪০xPF=০.৪০x০.৪৫=০.১৮) ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত খাতে জমা হয় (NBR=CT=০.১৮)। কর্পোরেট ট্যাক্স পরিশোধের পর সরকার/পেট্রোবাংলা গ্যাস সম্পদের মালিক হিসাবে ১৩.৫% (GSG=GSP-CT =০.৩১৫-০.১৮০=০.১৩৫) পায়। সরকার নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে রাষ্ট্রের পাওনা ১৩.৫% গ্যাসের জন্য যেকোন মূল্য নির্ধারণ করে নিতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক কোম্পানির পাওনা ৬৮.৫% গ্যাসের জন্য পিএসসি চুক্তি অনুসারে সিঙ্গাপুরের বাজার দর অনুসারে Take or Pay শর্তে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। Take or Pay চুক্তির শর্ত হচ্ছে যে ক্রেতা যদি চুক্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ গ্রহণ করতে অপারগ হয় তবুও চুক্তিকৃত গ্যাসের পরিমাণের ৮০% এর দাম পরিশোধ করতে হয়। পেট্রোলিয়াম সেক্টরে Take or Pay একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পদ্ধতি। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির প্রাপ্য গ্যাসের অংশের মূল্য পরিশোধ করতে হয় সে কারণে সিঙ্গাপুরের বাজারে হাইসালফার ফার্নেস অয়েলের দাম বৃদ্ধি পেলে এবং/অথবা ডলারের তুলনায় টাকার মানের অবমূল্যায়ন হলে সরকারকে গ্যাসের গ্রাহক পর্যায়ের মূল্য বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

১৯৯৪ সালের ১লা মার্চের পর সরকার ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য ১৫% হারে বৃদ্ধি করেছিল। এর ফলে প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাসের গড় দাম টাকা ৫৪.০০ থেকে টাকা ৬২.০০ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১লা সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখ থেকে পুনরায় বিদ্যমান গ্রাহক পর্যায়ের গ্যাসের মূল্য ১৫% বৃদ্ধির জন্য ১৫ আগস্ট ২০০০ তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাসের গড় দাম টাকা ৭১.০০ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সরবরাহকৃতক গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি যত্নের সাথে মূল্যায়ন না করে প্রচলিত পদ্ধতিতে অনেকটা অনুমানের ভিত্তিতে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য ১৫% বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে মনে হয়। গ্যাসের এ মূল্য বৃদ্ধি পেট্রোবাংলার ওপর কি প্রভাব ফেলবে তা বিবেচনা করা হয়েছে বলে মনে হয় না। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হওয়ার কারণে পেট্রোবাংলা প্রায় ৪০০ কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে।

ভবিষ্যতে দেশে গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাবার জন্য আন্তর্জাতিক কোম্পানির গ্যাসের ব্যবহার যত বৃদ্ধি পাবে সিঙ্গাপুরে HSFO-এর মূল্য বৃদ্ধি এবং ডলারের তুলনায় টাকার অবমূল্যায়নের বিষয়গুলো আরও বেশি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির বিষয় আলোচনায় আসলে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় তাহল আমাদের গ্যাস আমরা আন্তর্জাতিক দামে ক্রয় করব কেন? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো যখন তেল ও

গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তাদের (শেয়ার হোল্ডারদের) বিনিয়োগকৃত অর্থের লাভজনকতা বিবেচনার জন্য উত্তোলিত তেল ও গ্যাসের মূল্য জানা প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অতীতে ও বর্তমানে বিদ্যমান ক্রুড অয়েলের দাম এ ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জানা। এতদসংশ্লিষ্ট ট্রেড জার্নালে নিয়মিতভাবে ক্রুড অয়েলের মূল্য প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের কোন নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক মূল্য নেই। তবে তেলের আন্তর্জাতিক মূল্যের সাথে সূচক ধরে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ সম্বন্ধে আগাম ঘোষণা না দিলে আন্তর্জাতিক কোম্পানির পক্ষে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসুবিধা হয়ে পড়ে। এ কারণে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে বাংলাদেশে কোন আন্তর্জাতিক কোম্পানি গ্যাস আবিষ্কার করলে সে গ্যাস সরকার হাইসালফার ফার্নেস অয়েলের সাথে নির্দিষ্টকৃত (indexed) মূল্যে বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয় করবে।

আন্তর্জাতিক কোম্পানির পাওনা গ্যাসের মূল্য পরিশোধের জন্য পেট্রোবাংলা গ্যাস ডেফিসিট ফান্ড (gas deficit fund) নামে একটি আলাদা ফান্ড সৃষ্টি করেছে। দেশীয় কোম্পানিগুলো কর্তৃক উৎপাদিত গ্যাসের গ্রাহক পর্যায়ে দামের একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্যাস ডেফিসিট ফান্ডে জমা করা হয়। আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর মোট উৎপাদিত গ্যাস বিক্রি করে যে রাজস্ব পাওয়া যায় তার সাথে গ্যাস ডেফিসিট ফান্ডের অর্থ যোগ করে আন্তর্জাতিক কোম্পানির পাওনা (গ্যাসের মূল্য) পরিশোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সংবাদপত্রের খবর অনুসারে এভাবে সংগৃহিত অর্থ আন্তর্জাতিক কোম্পানির মোট পাওনা পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নয়। যথাযথ হিসাব করে গ্যাসের গ্রাহক পর্যায়ের মূল্য নির্ধারণ করে সে অনুসারে সংগৃহিত অর্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের (সরকার, দেশীয় কোম্পানি, আন্তর্জাতিক কোম্পানি) মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আন্তর্জাতিক কোম্পানির গ্যাস বাজারজাত করার জন্য বর্তমানে সৃষ্ট আর্থিক সমস্যার জন্য অনুমানভিত্তিক অস্বচ্ছ মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি এবং যখন ইচ্ছা তখন মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত দায়ী।

১১.৬ গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের স্বীকৃত পদ্ধতি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের জন্য কস্ট প্লাস প্রফিট (cost plus profit) এবং প্রাইস-ক্যাপ (price cap) এই দু'ধরনের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কস্ট প্লাস পদ্ধতির মূল বিষয় হল যে গ্রাহক পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণের সময় প্রথমে গ্যাস সরবরাহে নিয়োজিত প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব খরচ এবং রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রফিট/লাভ (রেট অব রিটার্ণ অন ইনভেস্টমেন্ট) যোগ করে কোম্পানি সমূহের সার্ভিস চার্জ নিরূপণ করা হয়। পরবর্তী পদক্ষেপে কোম্পানির সার্ভিস চার্জের সাথে সরকারকে দেয় ট্যাক্স যোগ করে গ্যাসের গ্রাহক পর্যায়ের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। গ্যাস বিক্রি করা পর আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারকে দেয় ট্যাক্স পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট অর্থ মূল্য নিরূপণের সময়

হিসাবকৃত বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ অনুসারে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির মধ্যে বণ্টন করা হয়। কস্ট প্লাস প্রফিট পদ্ধতিতে গ্যাস কোম্পানিসমূহ যখন মূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে। রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ নিয়মানুসারে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে (public hearing) গ্যাসের নতুন মূল্য নির্ধারণ করে। প্রাইস ক্যাপ-পদ্ধতিতে প্রথমবার প্রকাশ্যে আলাপ আলোচনা করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে National Retail Price Index-এর মূল্য সূচকের পরিবর্তনের আনুপাতিক হারে কোম্পানিসমূহের সার্ভিস চার্জ পরিবর্তন করে তার সাথে সরকারের নির্দিষ্টকৃত ট্যাক্স যোগ করে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। উভয় প্রকার মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতির সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা উভয়ই রয়েছে। সে কারণে এক এক দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতি অনুসারে এক এক ধরনের পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের জন্য ১৯৯৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের জন্য কস্ট প্লাস প্রফিট পদ্ধতির অনুরূপ একটি পদ্ধতি সুপারিশ করে ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করে। কমিটির প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত বাংলাদেশের জন্য গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ : বাংলাদেশের জাতীয় কোম্পানিগুলো কর্তৃক উত্তোলিত গ্যাসের জন্য কোন wellhead price নির্দিষ্ট করা নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো কর্তৃক উত্তোলিত গ্যাসের জন্য wellhead price নির্দিষ্ট করা আছে। অন্যদিকে জাতীয় কোম্পানিগুলো কর্তৃক উৎপাদিত গ্যাসের জন্য সরকারকে ট্যাক্স বাবদ সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ও মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো কর্তৃক উৎপাদিত গ্যাসের জন্য সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি দিতে হয় না, শুধুমাত্র মূল্য সংযোজন কর দিতে হয়। এ কারণে উক্ত প্রতিবেদনে প্রথম ধাপে বাংলাদেশের বিভিন্ন দেশীয় গ্যাস কোম্পানির সার্ভিস চার্জের সাথে সরকারি ট্যাক্স যোগ করে দেশীয় কোম্পানির সরবরাহকৃত গ্যাসের মোট মূল্য হিসাব করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে আন্তর্জাতিক কোম্পানি কর্তৃক মোট সরবরাহকৃত গ্যাসের মোট মূল্যের সাথে (wellhead price) উক্ত গ্যাসের পরিবহন ও বিতরণ খরচ যোগ করে গ্যাসের সরবরাহ খরচ নিরূপণ করা হয়েছে। গ্যাসের সরবরাহ খরচের সাথে মূল্য সংযোজন কর যোগ করে আন্তর্জাতিক কোম্পানির গ্যাসের মোট মূল্য হিসাব করা হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপে হিসাবকৃত যথাক্রমে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানির সরবরাহকৃত গ্যাসের মূল্য যোগ করে বাংলাদেশে সরবরাহকৃত মোট গ্যাসের মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে। মোট গ্যাসের মূল্যকে সরবরাহকৃত মোট গ্যাসের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে প্রতি একক পরিমাণ গ্যাসের গ্রাহক পর্যায়ের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে (Anon 1997)। সরকার এই কমিটির সুপারিশ বিবেচনা না করে ১লা সেপ্টেম্বর ২০০০ সাল থেকে অনুমানের ভিত্তিতে

গ্যাসের বিদ্যামন মূল্য ১৫% হারে বৃদ্ধি করে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য পুনর্নির্ধারণ করে। এ সিদ্ধান্তের পরিণাম সম্বন্ধে ওপরের অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৭ জ্বালানির তেলের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রাসাঙ্গিক আলোচনা

বাংলাদেশে ২০০১ সালে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি তেলের চাহিদা ছিল প্রায় ৩৪ লক্ষ টন। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) বিভিন্ন ধরনের গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় ক্রুড অয়েল এবং পেট্রোলিয়াম প্রডাক্ট আমদানি করে সরবরাহের ব্যবস্থা করে। বিপিসি এবং তেল বিতরণ ও বাজারজাত করার সাথে যারা প্রতক্ষ্যভাবে জড়িত তারা তেলের মূল্য হিসাব করার জন্য যে সব নিয়ামক বিবেচনা করা হয় সেগুলোর সাথে পরিচিত। যেমন আন্তর্জাতিক বাজার থেকে তেল আমদানি করার পর তেলের এফওবি দামের সাথে কি হারে ফ্রেইট চার্জ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সার্ভিস চার্জ, লাইটারেজ চার্জ, ইমপোর্ট ডিউটি, মূল্য সংযোজন কর, ডেভেলপমেন্ট সারচার্জ, প্রসেসিং কস্ট, রিফাইনিং মার্জিন যোগ করে রিফাইনারিতে পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের খরচ হিসাব করতে হয় এবং এই খরচের সাথে ডিউটি, ভ্যাট, মার্কেটিং কোম্পানির মার্জিন, ফ্রেইট, ট্রানজিট খরচ, ডিলারের কমিশন যোগ করে গ্রাহক পর্যায়ে পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় সংশ্লিষ্ট সকলের তা জানা। সরকার কখন কেন তেলের মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে এ বিষয়গুলোর সাথে জনগণ পরিচিত নয়। সে কারণে যখনই তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হয় তখনই জনগণ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনটি প্রধান পেট্রোলিয়াম পণ্যের (অকটেন, ডিজেল, কোরোসিন) নির্ধারিত দাম সারণী ১১.৩-এ দেখানো হয়েছে। সাধারণ ভোক্তার বোঝার সুবিধার জন্য ইদানীংকালে পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

সরকার ১৯৯৭ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখে যখন জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয় তখন ঐ বাড়ানো নিয়ে হরতালসহ অনেক প্রতিবাদ হয়েছিল। তৎকালীন জ্বালানি মন্ত্রী সংবাদপত্রের মাধ্যমে বক্তব্য রেখেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড অয়েলের (অপরিশোধিত তেল) দাম বৃদ্ধির কারণে (প্রতি ব্যারেল ২০ ডলার) তখন অভ্যন্তরীণ বাজারে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন জ্বালানিমন্ত্রী তখন বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড অয়েলের দাম কমলে অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের দাম কমানো হবে। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড অয়েলের দাম অনেক কমে গেলেও জনগণের কাছে দেয়া সে অঙ্গীকার রক্ষা করা হয়নি। দেশে জ্বালানি তেল আমদানি ও বিতরণে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা বিপিসি-এর পুঞ্জীভূত লোকশান শোধ করে লাভ করার সুযোগ প্রদানের জন্য সম্ভবত সরকারের পক্ষে ওয়াদা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সরকার অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে বিপিসি-এর লোকসান হয়েছিল ৪২৭ কোটি টাকা। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে বিপিসি গড়ে প্রতি ব্যারেল ১৭.৩২ ডলার দরে

সারণী ১১.৩ : পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনের খুচরা দাম

তারিখ	প্রতি লিটারের দাম টাকায়			টাকা/ডলার	প্রতি লিটারের দাম ডলারে		
	পেট্রোল	ডিজেল	কেরোসিন		পেট্রোল	ডিজেল	কেরোসিন
৬-৫-৭২	১.১৬	০.৬৯	০.৪৮	৭.৩০	০.১৮	০.০০৯	০.০৭
৭-১১-৭৩	১.৯৮	০.৮৮	০.৭৮	৭.৮৭	০.২৫	০.১১	০.১০
১৬-২-৭৪	৩.১২	১.৩২	১.৩২	৭.৯৬	০.৩৯	০.১৭	০.১৭
১০-৬-৭৫	৪.০৭	১.৮৩	১.৮৩	৮.৮৭	০.৪৬	০.২১	০.২১
৫-৩-৭৬	৪.৫১	১.৯৯	১.৯৯	১৫.০৫	০.৩০	০.১৩	০.১৩
১২-১১-৭৯	৭.৯৭	৩,০২	৩,৯২	১৫.৪৯	০.৫১	০.১৯	০.১৯
২১-৭-৮০	১০.২০	৪.৯৫	৩.৮৮	১৬.২৬	০.৬৩	০.৩০	০.২৪
২৮-৭-৮১	১১.১১	৫.২০	৫.২০	২০.০৭	০.৫৫	০.২৬	০.২৬
১-৭-৮২	১৪.০৩	৭.২২	৭.২২	২৩.৮০	০.৫৯	০.৩০	০.৩০
১-৭-৮৪	১৪.৬৭	৭.২২	৭.২২	২৫.৯৬	০.৫৭	০.২৮	০.২৮
২৭-৬-৮৬	১২.৮৮	৬.৭১	৬.৭১	২৯.৮৯	০.৪৩	০.২২	০.২২
১-১-৯০	৭.৫১	৬.৭১	৬.৭১	৩২.৯২	০.২৩	০.২০	০.২০
৪-১০-৯০	১৪.০০	১৩.৭১	১৩.৭১	৩৫.৬৮	০.৩৯	০.৩৮	০.৩৮
১-৭-৯২	১৩.৭০	১৩.৭০	১৩.৭০	৩৯.১৩	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫
১-৭-৯৪	১৩.৭০	১২.৭০	১২.৭০	৪০.৪৩	০.৩৪	০.৩১	০.৩১
৯-৮-৯৭	২১.০০	১২.৯৫	১২.৯৫	৪৪.৬৫	০.৪৭	০.২৯	০.২৯
১৪-৮-০০	২৩.০০	১৫.৫০	১৫.৫০	৫৪.১৫	০.৪২	০.২৯	০.২৯

উৎস : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

অপরিশোধিত তেল আমদানি করে পরিশোধনের পর বাজারজাত করেছে; সে বছরে বিপিসি-এর লোকসান হয়েছিল ৩০০ কোটি টাকা। ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে বিপিসি গড়ে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল ১৩.৭৮ ডলার দরে আমদানি করে পরিশোধনের পর বাজারজাত করেছে; সে বছরে বিপিসি-এর লাভ হয়েছিল ২০০ কোটি টাকা। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বিপিসি গড়ে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানি করে ২৫.৮২ ডলারে। এ বছর জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি জরুরি হয়ে পড়লেও সরকার যথাসময় জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি না করার কারণে সে বছরে বিপিসি ১,৬৩৩ কোটি টাকা লোকসান করে (সারণী ১১.৪)। খবরে প্রকাশ বিপিসি ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা ধার করে জরুরি প্রয়োজন মিটিয়েছে। ২০০০ সালের আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ব্যারেল ক্রুড অয়েলের দাম ৩৫ ডলারের বেশী হয়ে গেলে সরকারের পক্ষে তেলের দাম বাড়ানো ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। এ প্রসঙ্গে ২৯ আগস্ট ২০০০ তারিখ জাতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সাথে মত বিনিময়কালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বাধ্য হয়েই জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। এ ছাড়া জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির অন্যান্য কারণগুলো হচ্ছে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে মার্কিন ডলারের সাথে বেশ কবার টাকার অবমূল্যায়ন। ২২ আগস্ট ২০০০ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনের এক আলোচনা অনুষ্ঠানে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির অন্য আরও একটি কারণ হিসাবে বলেছেন, প্রতিবেশী দেশ ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দাম অপেক্ষকৃত কম হলে বাংলাদেশ থেকে জ্বালানি তেল পাচার হয়ে ভারতে চলে যায়। ভারতে বিদ্যমান জ্বালানি তেলের মূল্যের সাথে সমতা রেখে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে তেল পাচার কমে যাবে। বাংলাদেশের জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রতিবেশী দেশে তেল পাচার হওয়া কতটুকু দায়ী তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

উপরে বর্ণিত কারণে ১৯ আগস্ট ১৯৯৭ তারিখের তুলনায় তিন বছর পর ১৬ আগস্ট ২০০০ তারিখে জ্বালানি তেলের গড় মূল্য বৃদ্ধি যুক্তিসঙ্গত। সামনে নির্বাচন রয়েছে জেনেও সরকার জনপ্রিয়তা হারাবার ঝুঁকি নিয়ে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে হঠাৎ করে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ত তার তুলনায় বর্তমানে যে প্রভাব পড়বে তার ক্ষতিকারক দিক কম। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও যে পদ্ধতিতে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি। জুন মাসে চলতি অর্থবছরের বাজেট অনুমোদনের সময় জাতীয় সংসদে আলোচনা করে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে খুব ভাল হতো। সেটা যখন করা হল না তখন অন্তত ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে শুরু হওয়া সংসদ অধিবেশনে আলাপ-আলোচনা করে দাম বৃদ্ধি করা হলেও ভাল হত। সম্মানিত জনপ্রতিনিধিগণ নিজ নিজ এলাকার জনগণের কাছে তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারতেন। প্রায়শই মহান সংসদকে

সারণী ১১.৪ : বিপিসির দেয়া রাজস্ব এবং মুনাফা ও লোকসানের বিবরণ (কোটি টাকায়)

বিবরণ	৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-০০
সরকারকে দেয়া রাজস্ব	৭৭৩.০	১২৪০	১৪৯৬	১৫১২	১৫৭৮	১৭৬২	১৯২৪	২২০২	২৫৫২	২৬৬৮
করপূর্ব মুনাফা লোকসান (-)	৫৫৩.৮৪	৭৯৬.৩৭	৭৫৮.১৬	৯১৮.২৬	২৪১.৪৫	১৩৩.৫৪	-৪২৭.৪৫	-৩০০	২০০	-১৬৩৩
(রাজস্ব/মোট বিক্রিত পণ্য) %	৩৩.৮%	৪৮.৮%	৫৯.৩%	৫৮.৭%	৫৫.২%	৫৬.৬%	৫৮.৫%	৫৭.০%	৬১.০%	৫১.৬%

উৎস : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

সকল ক্ষমতা ও জবাবদিহিতার কেন্দ্র বলা হলেও জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির সময় এ বিষয়টির দিকে তেমন যত্নের সাথে খেয়াল রাখা হয়নি। ২২ আগস্ট ২০০০ তারিখের অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ টেলিভিশনের আলোচনা অনুষ্ঠানে আলোচকগণ বলেছেন যে, বিভিন্ন সেক্টরে তেলের এ মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব তেমন পড়বে না। এ ধরনের সাদামাটা জবাবের পরিবর্তে স্পষ্ট হিসাব দিলে ভাল হত। ২৮ আগস্ট ২০০০ তারিখ রাস্তায় বেবী ট্যাক্সিতে চড়তে গিয়ে ২০% ভাড়া বৃদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করলে চালক বললেন, তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাই বর্ধিত ভাড়া। এ সুযোগে বাস, লঞ্চ ও অন্যান্য যন্ত্রচালিত যানবাহনের ক্ষেত্রে যার যে রকম ইচ্ছা সে ভাবে দাম বাড়িয়েছে এবং এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝগড়া-বিবাদের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এক রিক্সাওয়ালাকে বর্ধিত ভাড়া চাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে রিক্সাওয়ালা বললেন যে সব কিছুর দাম বেড়েছে তাই তিনি বর্ধিত ভাড়া চাচ্ছেন। ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এ মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণার সাথে সাথে সরকার যদি জ্বালানি ব্যবহারকারী বিভিন্ন সেক্টরে কত হারে মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে হিসাব করে জানাতেন তাহলে রাস্তাঘাটে বচসা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি এড়ানো যেত।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিপিসি-এর লাভ লোকসানে বিপিসির কোন ভূমিকাই ছিল না এবং নেই। সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যখন খুশী জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়। তারই ফলশ্রুতিতে বিপিসিকে লাভ অথবা লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়। তেলের মূল্য বৃদ্ধির আলোচনার সময় বিপিসির লোকসানের বিষয় আলোচনায় আসলেও তেল বিক্রির অর্থ থেকে সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব পেয়ে থাকে সে বিষয়ও জনগণকে জানানো উচিত। ১৯৯০-৯১ থেকে শুরু করে ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত সময়কালে বিপিসি কর্তৃক সরকারকে বিভিন্ন বছরে যে পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করা হয়েছে এবং বিপিসির কর পূর্ব মুনাফা ও লোকসানের হিসাব সারণী ১১.৪-এ দেখানো হয়েছে।

১৯৯৭ ও ১৯৯৮ পর পর দু'বছর বিপিসি লোকসান করার পর বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের আমদানি, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য সাবেক কেবিনেট সচিব এইচ. টি. ইমামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। সূত্র মতে, জ্বালানি খাত বেসরকারি পর্যায়ে ছেড়ে দিতে হলে বিদ্যমান পেট্রোলিয়াম আইন '৭৪, বিপিসি অধ্যাদেশ ১৯৭৬ ও বিপিসি বিধিমালায় সংশোধনী আনা প্রয়োজন হবে। এ জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে এ সম্পর্কিত একটি খসড়া আইন পর্যালোচনা করা হয়েছে। জ্বালানি খাতের বেসরকারিকরণ সম্পর্কিত খসড়া আইনে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, সংরক্ষণ, বিপণন ও বন্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বিপিসির বর্তমান রেগুলেটরি ক্ষমতাসহ স্টেটিওটরি মর্যাদা বিলুপ্ত করে এটিকে একটি রেগুলেটরি বডিতে রূপান্তর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তা ছাড়া উক্ত খসড়া আইনে আন্তর্জাতিক বাজারদরের পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ বাজারে পেট্রোলিয়াম পণ্যসমূহের মূল্য প্রতি মাসের তৃতীয় সোমবার

পর্যালোচনা করে পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বর্তমানে প্রচলিত মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি পরিত্যাগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে বিপিসি-এর মতামত হচ্ছে যে, মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর আহরণ, সংরক্ষণ পরিশোধন, বন্টন ও বিপণন সংশ্লিষ্ট কোন কোন খাত পরীক্ষামূলকভাবে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে, তবে গোটা পেট্রোলিয়াম বাণিজ্য বেসরকারিকরণ যৌক্তিক হবে না। সেরকম করা হলে তা সরকার ও জনগণের স্বার্থ পরিপন্থী হবে এবং এক অশুভ ফল বয়ে আনবে।

মূল্য হিসাবের স্বচ্ছ পদ্ধতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণে যথাসময় জ্বালানি তেলের মূল্য পুনর্নির্ধারণের অনুমতি না দেয়ার কারণে বিপিসিকে উপর্যুপরি কয়েক বছর লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আবার সেই লোকসানকে অজুহাত হিসাবে দেখিয়ে বিপিসি কার্যক্রমকে প্রাইভেটাইজ করার প্রক্রিয়া জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। দেশের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। শান্তিকালীন সময়ে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে বিপিসিকে প্রাইভেটাইজ না করে প্রস্তাবিত আইনের চিন্তা অনুসারে তেলের মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব একটি রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের কাছে ছেড়ে দিয়ে প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে জ্বালানি তেলের মূল্য পুনর্নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হলে একদিকে বিপিসিকে লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে না এবং অন্যদিকে জাতীয় স্বার্থও সংরক্ষিত থাকবে।

১৯ আগস্ট ১৯৯৭ এর তুলনায় ১৬ আগস্ট ২০০০ তারিখ থেকে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি তেলের প্রতি লিটারের মূল্য নিম্নলিখিত হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে : কেরোসিন ১২.৯৫ টাকা থেকে ১৫.৫০ টাকা (১৯.৬৯% বৃদ্ধি), ডিজেল ১২.৯৫ টাকা থেকে ১৫.৫০ টাকা (১৯.৬৯% বৃদ্ধি), পেট্রোল ২১.০০ টাকা থেকে ২৩.০০ টাকা (৯.৫% বৃদ্ধি), অক্টেন ২৩.০০ টাকা থেকে ২৫.০০ টাকা (৮.৭% বৃদ্ধি), ফার্নেস অয়েল ৫ টাকা থেকে ৬.৫০ টাকা (৩০% বৃদ্ধি), জেট ফুয়েল ১৬.৬২ টাকা থেকে ১৯.০০ টাকা (১৪.৩২% বৃদ্ধি)। দেশের সবচেয়ে নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারেগুলো প্রধানত রাতে ঘরে বাতি জ্বালাবার জন্য কেরোসিন ব্যবহার করে। সে জন্য পেট্রোলের তুলনায় কেরোসিনের দাম কম রাখা হয়েছে। যেহেতু অতি সহজে কেরোসিনের সাথে ডিজেল মিশানো যায়। ডিজেল মিশ্রিত কেরোসিন মটরগাড়িতে ব্যবহার করলে ডিজেল গাড়ির ইঞ্জিনের ক্ষতি হয় সে কারণে ডিজেলের দাম পেট্রোলের কাছাকাছি না রেখে কেরোসিনের সমান রাখা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ কাজে ডিজেল ব্যবহৃত হয় সে কারণেও ডিজেলের দাম কম রাখা হয়েছে। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ডিজেলের বর্তমান দামের পরিবর্তে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দামে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে সেচ কাজ করলে খরচ কম পড়ে। পেট্রোল ও অকটেন অপেক্ষাকৃত উচ্চ আয়ভুক্ত পরিবারেরা ব্যবহার করে সে কারণে পেট্রোল ও অকটেনের দাম কেরোসিন ও ডিজেলের দামের চেয়ে বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের বেশির ভাগ এলাকায়

শিল্প-কারখানায় ব্যবহারের জন্য এখন পর্যন্ত প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত শিল্প-কারখানায় জ্বালানি হিসাবে ফার্নেস অয়েল ব্যবহার করা হয়। সরকার ফার্নেস অয়েলের দাম ৩০% বৃদ্ধি করে প্রতি লিটারের দাম ৬.৫০ টাকায় নির্ধারণ করেছে। এ হিসাব অনুসারে ফার্নেস অয়েল ব্যবহারকারী একটি শিল্প-কারখানার প্রতি গিগাজুল ($১০^৯$ জুল) জ্বালানির খরচ পড়ে টাকা ১৬১.২৮। অন্যদিকে ১ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখ থেকে শিল্প-কারখানায় ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের বর্ধিত মূল্য হবে প্রতি কিউবিক মিটার টাকা ৪.৮৩। এ হিসাব অনুসারে গ্যাস ব্যবহারকারী একটি শিল্প-কারখানার প্রতি গিগাজুল ($১০^৯$ জুল) জ্বালানির খরচ পড়বে টাকা ১৩৯.৪৬। অর্থাৎ একটি গ্যাস ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ফার্নেস অয়েল ব্যবহারকারী জ্বালানির জন্য ১৫.৬% বেশী অর্থ ব্যয় করতে হবে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত একই ধরনের শিল্প-কারখানার মধ্যে সুষম প্রতিযোগিতার সুযোগ প্রদানের জন্য শিল্প-কারখানার জন্য নির্ধারিত প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যের সাথে সমতা রেখে প্রতিলিটার ফার্নেস অয়েলের মূল্য টাকা ৬.৫০-এর পরিবর্তে টাকা ৫.৬০-এ নির্ধারণ করা হলে ভাল হত। আমাদের দেশে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির সময় রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বিষয়গুলো যেভাবে গুরুত্ব পায় আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলো সেভাবে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় না। দেশের মানুষের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোর প্রতি আন্তরিকভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তেলের চেয়ে পানির দাম বেশি; কেননা সে সকল দেশে যত সহজে তেল পাওয়া যায় তত সহজে সুপেয় পানি পাওয়া যায় না। সমুদ্রের লোনা পানি তেল জ্বালিয়ে বাষ্পায়িত করে সে বাষ্প ঠাণ্ডা করে খাবার পানি তৈরী করা হয়, যে কারণে ঐ সকল দেশে পানির দাম বেশী। একবার একটি খবরে দেখা গিয়েছিল যে কোন কোন আন্তর্জাতিক কোম্পানি উত্তর অথবা দক্ষিণ মেরুতে জমে থাকা বিশাল আকারের বরফের খণ্ড সমুদ্রে ভাসিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর উপকূলে নিয়ে এসে সংরক্ষণাগারে বরফ গলিয়ে খাবার পানি উৎপাদনের ব্যবস্থা করবে। মধ্যপ্রাচ্যে তেলের তুলনায় পানির দুষ্প্রাপ্যতা সে অঞ্চলে পানির বেশি মূল্য হওয়ার কারণ তা অতি সহজে সকলের কাছে বোধগম্য। যে বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হয় তাহলো ইদানীংকালে বাংলাদেশেও কোন কোন ক্ষেত্রে সুপেয় পানি ও তেলের দাম প্রায় সমান। সম্প্রতি মূল্য বৃদ্ধির পর ১ লিটার কেরোসিন অথবা ১ লিটার ডিজেলের দাম টাকা ১৫.৫০। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন দোকানে প্লাস্টিকের বোতলে ১ লিটার সুপেয় পানির দাম টাকা ১৫.০০। বোতলের পানির এ উচ্চ দামের জন্য কোন প্রতিবাদ হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

১২

বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি ও বিভিন্ন প্রকার চাপ ও প্রচার

১৯৯৩ সালে পেট্রোলিয়াম পলিসি প্রণয়নের সময় মূল্যায়ন করা হয় যে, সে সময় দেশের অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাস (১০.৪৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট) ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি চাহিদা মিটাবার জন্য যথেষ্ট নয়। এ প্রেক্ষাপটে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য (ক) ২০০০ সাল থেকে শুরু করে দেশে গ্যাস উত্তোলনের গড় দৈনিক মাত্রা ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুটে সীমিত রাখার এবং (খ) ভবিষ্যতে গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে হাইড্রোকার্বন অন্বেষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে ১৯৯৩ সালে ঘোষিত পেট্রোলিয়াম পলিসিতে এবং ১৯৯৬ সালে ঘোষিত ন্যাশনাল এনার্জী পলিসিতে গ্যাস রপ্তানির কোন সুযোগ রাখা হয়নি। দেশের জ্বালানি নীতিতে গ্যাস রপ্তানির সুযোগ নেই জেনে প্রথম রাউন্ড অব নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানি বাংলাদেশে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উন্নয়নের জন্য প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করে। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে প্রথম রাউন্ড অব নেগোসিয়েশনের আওতায় চুক্তিকৃত দু'টি আন্তর্জাতিক কোম্পানি বাংলাদেশে মোট তিনটি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র (সাঙ্গু, বিবিয়ানা ও মৌলভীবাজার) আবিষ্কার করে যার ফলে মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ৩.৬৪৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পায়। এ গ্যাস ক্ষেত্র তিনটি আবিষ্কার এবং প্রডাকশন শেয়ারিং কন্টাক্ট এর মূল স্বত্বাধিকারী কোম্পানির পরিবর্তে বেশি প্রভাবশালী কোম্পানির আগমনের ফলে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো এবং তাদের সহযোগীরা পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য নানা ধরনের প্রচারণা চালায়। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সময় কালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে এ ধরনের কিছু প্রচারণার সংকলন এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১২.১ আন্তর্জাতিক কোম্পানির প্রভাব ও প্রতিপত্তি

১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর হঠাৎ করে বাংলাদেশ সফরে আসেন। তার বাংলাদেশ সফরের পিছনে ইঙ্গ-মার্কিন কোম্পানি কেয়ার্ণ এনার্জি পিএলসি এবং ব্রাউন এন্ড রুটস-এর প্রভাব ছিল বলে মনে করা হয়। ১৯৯৭ সালে ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর-এর সামনে একটি পিএসসি স্বাক্ষরিত

হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন বাংলাদেশের তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মেরিল, হেলিবার্টন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডিক চেনী, কেয়ার্ণের প্রধান নির্বাহী বিল গ্যামেল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ জানুয়ারি, ১৯৯৭)। দেশের প্রচার মাধ্যম তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের সফরকে একটি অসাধারণ ঘটনা বলে প্রচার করেছিল। এরপর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সরকার প্রধানদের সভায় অংশগ্রহণের জন্য এডিনবরাতে গেলে তিনি কেয়ার্ণের হেড অফিস উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জনাব ফ্রাংক ওয়াইজনার এবং জনাব ডেভিড মেরিল-এর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের বিজনেস ডেলিগেশন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেন। জনাব ওয়াইজনার ও জনাব মেরিল ইতোপূর্বে যথাক্রমে ভারতে এবং বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন (ডেইলী স্টার ১৯৯৭)। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে, শেখ হাসিনার ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় মার্কিন বিনিয়োগকারীদের সাথে আলোচনার সময় বাংলাদেশে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জনাব ডেভিড মেরিল, তখন এনরন কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার (এশিয়া) উপস্থিত ছিলেন (দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)।

১২.২ অতিরিক্ত গ্যাস প্রাপ্তির প্রচার

অক্টোবর ১৯৯৯ সালে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে দেখা যায় যে বৃটিশ-ডাচ আন্তর্জাতিক কোম্পানির উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করে দাবি করেছেন যে, এ পর্যন্ত তাদের পাওয়া বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তারা বুঝতে পেরেছেন যে বাংলাদেশে বর্তমানে মজুদ ১৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুটের অতিরিক্ত অন্তত ২৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যাবে। এবং তাও নাকি রক্ষণশীল হিসাব। অর্থাৎ বাস্তবে মজুদের পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। এসব বিদেশী কোম্পানির বড় কর্মকর্তাদের সব কথার মূল কথা হচ্ছে সরকারকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস রপ্তানির অনুমতি দিতে রাজী করানো। বিদেশী কোম্পানির প্রতিনিধিরা গ্যাস রপ্তানির তদ্বির নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাদের বক্তব্য ছিল যে দু'এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত না নিলে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ এ সুযোগ হারাবে। এ যুক্তি খণ্ডন করে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন যে, নিকটবর্তী বাজারে গ্যাস সঞ্চালনের খরচ কম হলে বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানির সুযোগ সব সময়ই থাকবে। বাংলাদেশের একজন বিশেষজ্ঞ বিদেশী কোম্পানির কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করেন যে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর অনুমান ভিত্তিক গ্যাস সম্পদের হিসাবের ভিত্তিতে যদি পাইপ লাইনের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি শুরু করা হয় এবং পরবর্তীকালে অতিরিক্ত ২৫ টিসিএফ গ্যাস না পাওয়া যায় তাহলে কি হবে? এর উত্তরে বিদেশী কোম্পানির

প্রতিনিধিরা বলেছেন যে, এটা বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসে ঠিক করতে হবে। তখন বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞরা পাল্টা প্রশ্ন করেন যে, তা হলে আন্তর্জাতিক কোম্পানি কোন তথ্য, উপাত্তের ভিত্তিতে গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাব দিচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে তারা বিব্রতবোধ করেন। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্রিটিশ-ডাচ কোম্পানির কর্মকর্তারা ছাড়াও আন্তর্জাতিক মার্কিন কোম্পানির কর্মকর্তরাও অনুমানের ভিত্তিতে গ্যাসের অতিরিক্ত মজুদ ৫৫ টিসিএফ ঘোষণা করে গ্যাস রপ্তানির জোর প্রচারণা চালিয়েছে। অতিরিক্ত গ্যাস প্রাপ্তির বিষয়ে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১২.৩ কাফনায় বৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের ভূয়া খবর

৩ জুন ১৯৯৯ তারিখে ডেইলী ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় খবর বের হয়েছিল যে, অক্সিডেন্টাল সিলেটের কাফনায় একটি বৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে যার ফলে বাংলাদেশে মোট গ্যাস মজুদের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮০ টিসিএফ। বিদেশের পত্রপত্রিকায়ও এ খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানানো হয়েছে যে, কাফনায় গ্যাস নেই, খবরটি ভুয়া (ডেইলী স্টার ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, দৈনিক প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ১৯৯৯)।

১২.৪ গ্যাস রপ্তানির আকর্ষণীয় হিসাব

একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানির বড় কর্মকর্তা দাবি করেছেন যে বাংলাদেশ প্রতি ১০০০ ঘনফুট ৩ ডলার দরে ৬ টিসিএফ গ্যাস পাইপ লাইনের মাধ্যমে রপ্তানি করে ৮০০ মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারে (ডেইলি স্টার ৮ অক্টোবর ১৯৯৯)। কত বছরে ৬ টিসিএফ গ্যাস রপ্তানি করা হবে এবং গ্যাস রপ্তানির আয় থেকে বাংলাদেশ নীট কত পাবে তা বলা হয়নি। ২০ বছরে ৬ টিসিএফ গ্যাস রপ্তানি করলে বছরে ০.৩ টিসিএফ গ্যাস রপ্তানি করে ৯০০ মিলিয়ন ডলার গ্রস আয় করা সম্ভব। ৩০ বছরে ৬ টিসিএফ গ্যাস রপ্তানি করা হলে বছরে ০.২ টিসিএফ গ্যাস রপ্তানি করে ৬০০ মিলিয়ন ডলার গ্রস আয় করা সম্ভব। বাংলাদেশ যদি গ্যাস রপ্তানি আয়ের ৫০% পায় তবে প্রতি বছর ০.৩ টিসিএফ এবং ০.২ টিসিএফ হারে গ্যাস রপ্তানি করা হলে বছরে নীট হিস্যা পেতে পারে যথাক্রমে ৪৫০ মিলিয়ন ডলার এবং ৩০০ মিলিয়ন ডলার।

১২.৫ দ্বিতীয় রাউন্ড অফ বিডিং এর দরপত্র মূল্যায়নের বিবরণ

১৫ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে দ্বিতীয় রাউন্ড অফ বিডিং-এর জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ছিল ১৫ জুলাই ১৯৯৭ সাল। ন্যাশনাল এনার্জী পলিসি এর III, ২.১ ধারা অনুসারে দরপত্র দাখিলের ছয় মাসের মধ্যে হাইড্রোকার্বণ অনুসন্ধানের জন্য অংশগ্রহণকারী কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করা হবে। বিতর্কিত দরপত্রগুলো সম্বন্ধে নয় মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয় রাউন্ড অফ বিডিং-এ ১৫টি ব্লকের মধ্যে ১২টি ব্লকের জন্য ২১টি আন্তর্জাতিক কোম্পানি ৩৭টি দরপত্র দাখিল

করে। অক্টোবর ১৯৯৭ সালে সরকার আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে গঠিত ৮ সদস্যের কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন : পেট্রোবাংলার পরিচালক (মাইনস এবং মিনারালস), পরিচালক (প্লানিং) এবং পরিচালক (ফাইন্যান্স), পেট্রোবাংলার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পর্যায়ের তিনজন কর্মকর্তা এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ বাংলাদেশের ডাইরেক্টর জেনারেল (ডেইলী স্টার, ১৫ অক্টোবর ১৯৯৭)। ২১ অক্টোবর ১৯৯৭ তারিখে দ্বিতীয় রাউন্ড অফ বিডিং-এ অংশগ্রহণকারী কোম্পানির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে, সরকার ঘোষিত পিএসসি-এর ধারা পরিবর্তন করে অংশগ্রহণকারী কোম্পানিগুলোকে গ্যাস রপ্তানির অনুমতি দেয়ার চিন্তা করছে। (ডেইলী স্টার, ২১ অক্টোবর ১৯৯৯)

জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবের নেতৃত্বে গঠিত ৮ সদস্যের কমিটি প্রায় ৯ মাস ধরে আলোচনা চালানোর পর উক্ত কমিটি পাঁচ সচিবের সমন্বয়ে গঠিত বিনিয়োগ কমিটির কাছে সেকেন্ড রাউন্ড অফ বিডিং-এর দরপত্রের মূল্যায়ন রিপোর্ট দাখিল করে। বিনিয়োগ-কমিটি বিভিন্ন সময় আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সরকারের ওপর মার্কিন ও বৃটিশ কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত থাকে। সরকার দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, দেশের স্বার্থের বিপরীতে চাপের মুখে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না। ১৯৯৭ সালে জুলাই মাসে দরপত্র আহবানের এক বছর পর ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে ৯টি বিদেশী কোম্পানির কাছে ৫টি ব্লক বরাদ্দ দেয়ার জন্য লেটার অফ ইনটেন্ট ইস্যু করা হয়। ৩ এবং ৬নং ব্লকের জন্য এনরণ ও অকল্যান্ড; ৫ নং ব্লকের জন্য শেল ও কেয়ার্ণ; ৭ নং ব্লকের জন্য ইউনোকল ও ট্রাইটন; ৮নং ব্লকের জন্য পানজিয়া। এছাড়া সরকার টাল্লোকে চিঠি দিয়ে জানায় যে, ৯নং ব্লকের জন্য শেভরণ ও টেক্সাকোর সাথে এবং ১১নং ব্লকের জন্য মবিল ও পেট্রোন্যাস-এর সাথে যৌথভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে। ১০ নং ব্লকের জন্য সরকার ইউনোকলকে তাদের মূল দরপত্র পরিবর্তন করতে সুযোগ দেয় বলে অভিযোগ করে শেল ও কেয়ার্ণ উক্ত ব্লকের জন্য পরবর্তীতে দরপত্র দাখিল করে। ১৯ এবং ২০ নং ব্লকের জন্য মার্স্ক অয়েল-এর প্রস্তাব পরে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত হয়। ৪ এবং ২১ নং ব্লকের জন্য কোন কোম্পানিকে নির্বাচিত করা হয়নি। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ জুলাই ১৯৯৮, ডেইলী স্টার, ২৯ জুলাই ১৯৯৮)

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরকে সামনে রেখে ফেব্রুয়ারি ২০০০ মাসে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে পিএসসি নিয়ে জোরেশোরে আলোচনা শুরু করা হয়। ৯টি ব্লকে ৮টি বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে আলোচনার জন্য পেট্রোবাংলা ব্যবস্থা গ্রহণ করে (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০০)। ভারতে গ্যাস রপ্তানির প্রশ্নে প্রচণ্ড মার্কিন চাপের মুখে পড়েছে সরকার। এ বিষয়টি সুরাহা না হলে প্রয়োজনে বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সফর অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে বলে কূটনৈতিক সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে। আমেরিকা সফররত বাংলাদেশের জ্বালানি

সচিব এ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন বলে সূত্রটি দাবি করে (দৈনিক সংগ্রাম, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০০)। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখের খবরে প্রকাশ যে, দ্বিতীয় দফা বিডিং-এর মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কন্টাক্ট-এর শর্ত শিথিল করে জ্বালানি মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো রপ্তানির সিদ্ধান্তের আগে বরাদ্দকৃত ব্লকে সাইসমিক সার্ভে ও অনুসন্ধান কূপ খননের উদ্যোগে নেবে না। এ প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে, রপ্তানির সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে অনুসন্ধানের শর্ত ছাড়া উৎপাদন বন্টন চুক্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একাধিক সূত্র এ ব্যাপারে প্রশাসনের উচচপর্যায়ের এক কর্মকর্তাকে মূলত দায়ী করেছেন। দ্বিতীয় দফা মডেল পিএসসি অনুযায়ী চুক্তি করতে ব্যর্থ হয়েই সরকারকে বুঝিয়ে অকার্যকর চুক্তির উদ্যোগ নিয়েছেন। পেট্রোবাংলার একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন যে, এ সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় নিয়েছে তাদের কিছু করার নেই। (দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০০)

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সফরকে সামনে রেখে জ্বালানি মন্ত্রণালয় "ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ সংরক্ষণ প্রেক্ষিত, পরিস্থিতি ও করণীয়" এ মর্মে পেট্রোবাংলার কাছে একটি প্রতিবেদন চাইলে পেট্রোবাংলা কর্তৃপক্ষ মত প্রকাশ করে যে, ভবিষ্যৎ চাহিদার জন্য প্রয়োজনীয় মজুদ যথেষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়ার আগে গ্যাস রপ্তানির বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত নয়। (দৈনিক বাংলার বাণী, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০০)

খবরে প্রকাশ যে, মডেল পিএসসির শর্ত শিথিল করে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোকে সুযোগ দেয়া হচ্ছে যে ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে গ্যাস রপ্তানির অনুমতি পাওয়া গেলে কোম্পানিগুলো গ্যাস রপ্তানি শুরু করতে পারবে। ৯ নং ব্লকে দরপত্র দাখিলকারী তিন কোম্পানির কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় অদূর ভবিষ্যতে গ্যাস রপ্তানির অনুমতি পাওয়া যাবে এমন গ্রীণ সিগনালের প্রেক্ষিতে পিএসসি স্বাক্ষরে সম্মত হয়। (দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০০)

১২, ১৩, ১৪ নং ব্লকে কর্মরত মার্কিন কোম্পানি ইউনোকল-এর চেয়ারম্যান দি ইকনোমিক টাইমস, কলিকাতার সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে ইউনোকল ১.২ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে বাংলাদেশ থেকে সমুদ্র পথে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে অথবা স্থলপথে কলিকাতা হয়ে দিল্লী পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করবে। তার কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে ভারতে গ্যাস রপ্তানির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করছে। (ডেইলী স্টার, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০০)।

১ মার্চ ২০০০ তারিখে পেট্রোবাংলা ৮নং ব্লকের জন্য পাঞ্জিয়ার সাথে পিএসসি অনুস্বাক্ষর করে (ডেইলী স্টার, ২ মার্চ, ২০০০)। ৮ মার্চ তারিখে ৯নং ব্লকের জন্য টাল্লো, শেভরন ও টেক্সকোর সঙ্গে পিএসসি অনুস্বাক্ষর করে (দৈনিক ভোরের কাগজ, ১০ মার্চ, ২০০০)। ১১ মার্চ ২০০০ তারিখে পাঁচ বছরের নিষ্ক্রিয়তার শর্ত মেনে নিয়ে মার্কিন কোম্পানি ইউনোকলের সাথে ৭নং ব্লকের জন্য পিএসসি অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে

(দৈনিক প্রথম আলো, ১২ মার্চ, ২০০০)। ২০শে মার্চ ২০০০ প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফর চূড়ান্ত হওয়ার পর তার সফরকালে অন্তত তিনটি পিএসসি স্বাক্ষরের জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয় পেট্রোবাংলাকে জরুরি ভিত্তিতে প্রস্তুতি নিতে বলে। সে অনুযায়ী পেট্রোবাংলার আলোচক দল সুদীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে চেপে রাখা পিএসসিগুলোর মধ্যে তিনটি পিএসসি নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা শুরু করে এবং ইউনোকলকে ৭ নং ব্লকের জন্য, তাল্লোকে ৯ নং ব্লকের জন্য দরপত্র দাখিলের সময় বর্ণিত শর্ত শিথিল করে পিএসসি স্বাক্ষরের জন্য ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে ৮ নং ব্লকে পাঞ্জিয়ার সাথে দরপত্র দাখিলের সময় বর্ণিত শর্তানুসারে পিএসসি স্বাক্ষরে সম্মত করে চুক্তিগুলো অনুস্বাক্ষর করা হয়।

১২.৬ যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশে সফর সম্বন্ধে

২০০০ সালে ২০ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন একদিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশে এ প্রথম সফর। যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ উভয় দেশের জন্য প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বাংলাদেশ ভ্রমণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বাংলাদেশে তার সফর যদি লাভবান মনে না করতেন তাহলে শুধু শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য বাংলাদেশে আসতেন না। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের এ সফরের পিছনে বাংলাদেশে কর্মরত মার্কিন আন্তর্জাতিক কোম্পানির পরোক্ষ প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশের গ্যাস বিদেশে রপ্তানির পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে বদ্ধপরিকর। ১৯৯৯ সালে সহযোগিতা চুক্তির অধীনে আরদ্ধ স্টাডিগুলো সমাপ্ত হওয়ার আগেই বাংলাদেশের গ্যাস রিজার্ভের পরিমাণ নিরূপণের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ জরিপ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সফরের সময় আর একটা চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা ছিল। এসব সহযোগিতার মূল কথা বাংলাদেশে প্রচুর গ্যাস আছে, বাংলাদেশের গ্যাসের চাহিদা নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানির একচ্ছত্র আধিপত্য দিতে হবে ইত্যাদি আরও কত কি? এ জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে বুঝাবার জন্য কয়েকমাস পর পর এনার্জি সেক্টরের বিভিন্ন পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের খরচায় নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় জ্বালানি সম্মেলন অংশগ্রহণ করছে। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি বিশেষ তহবিল বরাদ্দ করেছে। এ সব কিছু হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা হাসিল করার কৌশল।

বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন প্রস্তাব করেন যে মার্কিন অর্থায়নে সে দেশের একটি কোম্পানি বাংলাদেশে ভূ-কম্পন জরিপ চালাবে। বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রকৃত মজুদ সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এ জরিপ চালানো হবে। বৈঠকের সূত্রে আরো জানা গেছে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে বাংলাদেশের

ওপর চাপ মনে হতে পারে এমন মনোভাব প্রকাশ করে কিছু বলেননি। বাংলাদেশের গ্যাসের প্রকৃত মজুদের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহকে তিনি গুরুত্বের সাথে দেখেন। পঞ্চাশ বছরের মজুদ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পরই রপ্তানির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোভাব ও বক্তব্যকে তিনি দেশের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যথার্থ বলেই মত প্রকাশ করেন। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, সৌর শক্তির প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ব্যবহার যেভাবে হচ্ছে তাতে আগামী বিশ-পঁচিশ বছর পর প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রয়োজন তেমনভাবে নাও থাকতে পারে। বিষয়টি বিবেচনায় রাখার জন্যও তিনি বাংলাদেশ পক্ষের কাছে প্রস্তাব করেন। প্রকৃত গ্যাস মজুদ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানতে না পারায় বাংলাদেশের পক্ষে গ্যাস রপ্তানি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাস্তবাচিত হবে না বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জোরালো বক্তব্যকে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন খণ্ডানোর প্রয়াস নেননি। শীর্ষ বৈঠকে উপস্থিত তৎকালীন স্বরাষ্ট্র, ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্টও বাংলাদেশের প্রকৃত গ্যাস মজুদের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেন। তিনি বাংলাদেশে ভূ-কম্পন জরিপ চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের একটি জরিপ দল পাঠানোর প্রস্তাব করেন। এ দলে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লোকও থাকবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এও বলেন, জরিপ দলের সাথে বাংলাদেশে গ্যাস খাতে কর্মরত মার্কিন কোম্পানিগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। এরা নিজস্বভাবে কাজ করবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এ প্রস্তাবে বাংলাদেশ রাজি হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান। তিনি আরও জানান যে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকে চট্টগ্রামে বেসরকারি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের প্রসঙ্গ উঠেনি (দৈনিক বাংলার বাণী, ২২ মার্চ, ২০০০)। ইউনোকল এর রীপ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থানকালে ইউএসএআইডি এবং বহিঃসম্পদ বিভাগের মধ্যে সহায়তার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঐ চুক্তির আওতায় ইউএসআইডি জ্বালানি অবকাঠামো উন্নয়নের আগামী ১০ বছরে ৩০ মিলিয়ন ডলার দেবে। জ্বালানি বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সেক্টরে রেগুলেটরি কমিশন গঠন, সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানির মধ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা এবং সেক্টরটির সংস্কার কর্মসূচীর প্রতি মানুষের মনোভাব পরিবর্তনের লক্ষ্যে মোটিভেশন কর্মসূচিতে এ অর্থ ব্যয় হবে। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ মার্চ, ২০০০)

২০শে মার্চ ২০০০ তারিখে যাতে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সামনে তিনটি ব্লকের পিএসসি স্বাক্ষর করা যায় সেজন্য মন্ত্রিসভা ১৪ই মার্চ, ২০০০ তারিখে পিএসসি তিনটি স্বাক্ষরের জন্য অনুমোদন করে। এর আগে একই দিনে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এবং অর্থ ও অর্থনীতি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে পিএসসি-র খসড়া অনুমোদিত হয়। সম্ভাব্য নেতিবাচক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার আশাঙ্কায় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সামনে

আমেরিকার কোম্পানির সঙ্গে গ্যাস ব্লক উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর হয়নি। ক্লিনটনের সফরের ঠিক আগে হোয়াইট হাউসের তৈরি এক মূল্যায়নে বলা হয় যে, বাংলাদেশের প্রধান সব রাজনৈতিক দলই গ্যাস রপ্তানির বিপক্ষে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সফর মার্কিন কোম্পানির স্বার্থে গ্যাস রপ্তানির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে বাংলাদেশে সকল মহলে সমালোচনা হচ্ছে। এ অবস্থায় প্রাথমিক সতর্কতা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন জ্বালানি মন্ত্রী বিল রিচার্ডসন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাংলাদেশ সফরে বিরত থাকেন (দৈনিক প্রথম আলো, ২২ মার্চ, ২০০০)। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সামনে তিনটি ব্লকের পিএসসি স্বাক্ষরিত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ৮ নং ব্লকের জন্য চিহ্নিত কোম্পানি পাঞ্জিয়া পিএসসি স্বাক্ষর স্থগিত করেছে। ৯ নং ব্লকের কোম্পানিগুলোর পিএসসি স্বাক্ষর স্থগিত করেছে। (ডেইলী স্টার, ২২ মার্চ, ২০০০)।

১২.৭ যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (CSIS) গ্যাস ও উন্নয়ন সম্বন্ধীয় কনফারেন্স

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (CSIS) এবং বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (BCAS) হোটেল সোনারগাঁয়ে Gas and Development : Learning from Experiences শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-এর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন এককালে শ্রীলংকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এবং বাংলাদেশে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জনাব শেফারের স্ত্রী টেরেসিটা সি শেফার। মিনিস্ট্রি অফ এনার্জি এন্ড মিনারাল রিসোর্সের এনার্জি ডিভিশন এর সচিব ডঃ তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী ২৮ জুন, ২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এ অনুষ্ঠানে অন্যান্য যারা বক্তৃতা করেন তারা হলেন বিসিএএস-এর পরিচালক ডঃ আতিক রহমান; সিএসআইএস-এর পরিচালক অ্যাম্বেসেডর টেরেসিটা সি শেফার; যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জনাব জন সি হোলজম্যান; প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড-এর চেয়ারম্যান জনাব কাজী জাফরুল্লাহ; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর। Organizing the Gas Sector শীর্ষক প্রথম কর্ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর রেহমান সোবহান। আর্জেন্টিনার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব রাউল গার্সিয়া। Using Gas Domestically শীর্ষক দ্বিতীয় কর্ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য জনাব সাইফুর রহমান। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিকৌশল বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপক ডঃ আ খ ম আব্দুল কাদের Gas Utilization in Bangladesh শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। পাওয়ার এন্ড রুরাল ইলেট্রিফিকেশন বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিসিএএস-এর ফেলো ডঃ এম আই শরীফ এবং প্রাইভেট পাওয়ার পারসপেকটিভ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সামিট গ্রুপের জনাব আজিজ খান। Boosting Development শীর্ষক তৃতীয় কর্ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব জনাব ফারুক সোবহান। উক্ত

অধিবেশনে ব্র্যাকের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর জনাব এফ এইচ আবেদ Using Gas to Boost Development শীর্ষক এবং কানাডার হাইকমিশনার জনাব ডেভিড প্রেসটন Regional Issues শীর্ষক বিষয়ে যথাক্রমে আলোচনা এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ২৯শে জুন, ২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেকনিক্যাল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী জনাব এ এম এ মুহিত। এ অনুষ্ঠানে বলিভিয়ার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন জনাব ক্রিডস্ট্রয়ান ইটুরী এবং Gas Structuring a Decision on Export সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন অ্যাম্বেসেডর টেরেসিটা সি শেফার এবং Gas Development in Bangladesh বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিডিবির প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব নুরুদ্দিন এম কামাল। সর্বশেষে অনুষ্ঠিত প্যানেল আলোচনায় মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন বিসিএএস-এর পরিচালক ডঃ আতিক রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান জনাব মোকাম্মেল হক। প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইউএসএআইডি-এর সিনিয়র এনার্জি এডভাইজার জনাব ব্রুস ম্যাকমুলেন; সিপিডির এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং ডঃ কামাল হোসেন।

উপরোক্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে মূল প্রবন্ধ ছিল সিএসআইএস এবং বিসিএএস-এর গবেষকদের যৌথ উদ্যোগে প্রণীত গবেষণা রিপোর্ট Bangladesh : Energy and Development : The Lessons of Experience (Schaffer and Arora 2000)। কনফারেন্সের আয়োজকরা আলোচনার সময় বলার খাতিরে বলেছেন যে তারা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্যাসের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু আলোচনার গতি-প্রকৃতি দেখে মনে হয়েছে যে তারা বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানির জন্য একটা জাতীয় মত সৃষ্টি করতে আগ্রহী ছিলেন। সেমিনার অনুষ্ঠানের বাইরে দু'একজন বিদেশীকে বলতে শোনা গেছে যে তাদের কোন hidden agenda নেই। তারা নিতান্তই বাংলাদেশের উন্নতি চান, সে কারণেই বাংলাদেশে এসেছেন। গ্যাস রপ্তানির পক্ষে প্রচারে নিবেদিত এ দেশের একজন গবেষক আলোচনার সময় বলেছিলেন, "আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। সহজভাবে তাদের প্রস্তাব অনুসারে গ্যাস রপ্তানিতে সম্মত না হলে ওরা আমাদের arm twist করে গ্যাস নিয়ে যাবে।" কেউ কেউ আবার বলেছেন যে সামনে নির্বাচন, তাই কোন রাজনৈতিক দলই গ্যাস রপ্তানি সম্বন্ধে এখন স্পষ্ট কোন মত দেবে না। তবে নির্বাচনে যে দলই জয়লাভ করুক না কেন তারা গ্যাস রপ্তানিতে সম্মত হবে।

CSIS এবং BCAS-এর গবেষকরা তাদের প্রতিবেদনে দাবি করেছেন যে, বাংলাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। সম্ভবতঃ বিতর্ক এড়াবার জন্য গ্যাসের মজুদের পরিমাণ উল্লেখ করেননি। গবেষকরা সুপারিশ রেখেছেন যে, দক্ষতার সাথে গ্যাস সেক্টরের ব্যবস্থাপনা করতে হবে যাতে গ্যাস সেক্টরের অর্জিত আয় দিয়ে ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় এবং অর্জিত অর্থ অন্যান্য সেক্টরের জন্যও ব্যয় করা যায়। গবেষকদের মতে বাংলাদেশ তার আবিষ্কৃত গ্যাসের একটা অংশ যদি

রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভূত সাহায্য করবে। কি পরিমাণ গ্যাস রপ্তানি করা হলে কি ধরনের উন্নতি হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তবে পরোক্ষভাবে সুপারিশ রেখেছেন যে ১৯৯০ সালের আগে যেটুকু গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে সেটুকু গ্যাস দেশের জন্য strategic reserve হিসাবে রেখে পরবর্তীতে আবিষ্কৃত গ্যাস রপ্তানির জন্য নির্দিষ্ট করা উচিত। তৎকালীন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জনাব রফিকুল ইসলাম এপ্রিল ২০০০ মাসে জাতীয় সংসদে ঘোষণা দিয়েছেন যে, বাংলাদেশে তখন যে ১০ টিসিএফ গ্যাস মজুদ ছিল তা দিয়ে আগামী ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে দেশের চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে (দৈনিক অর্থনীতি, ৯ এপ্রিল, ২০০০)। অর্থাৎ ২০০০ সালে যে সকল পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করা হবে এ সকল পাওয়ার প্লান্টে ২৫-৩০ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় গবেষকদের সুপারিশ অনুসারে ১০ টিসিএফ গ্যাস স্ট্রাটেজিক রিজার্ভ হিসাবে রেখে বাকি গ্যাস রপ্তানি করা দেশের জন্য আত্মঘাতী হবে। গবেষকরা ভবিষ্যতে দেশের গ্যাসের চাহিদা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করে কি করে একতরফাভাবে নতুন গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর সমুদয় গ্যাস রপ্তানির সুপারিশ রাখলেন তা ভাবতে অবাক লাগে। এ ধরনের উপদেশ কোনমতেই বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য সহায়ক নয় বরং আন্তর্জাতিক কোম্পানির ব্যবসা প্রসারের সুপারিশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতরা সে দেশের আন্তর্জাতিক কোম্পানির পক্ষে তদ্বির করবেন এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশের অভিজ্ঞ নীতিনির্ধারকরাও যদি তাদের সাথে যোগ দেন তা হলে এ দেশের সাধারণ মানুষ দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য কার কাছে সহায়তা আশা করবে?

CSIS এবং BCAS-এর গবেষকরা একটা নতুন ধারণা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন - তা হলো গ্যাস রপ্তানির অর্থ গ্যাস, এনার্জি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড নামে একটি আলাদা ফান্ডে জমা রাখা হবে এবং দেশের উন্নতির জন্য ফান্ডের অর্থ বিদ্যুৎ এবং শিক্ষা সেক্টরের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে। বর্তমানে গ্যাস সেক্টর থেকে সরকার কি পরিমাণ রাজস্ব আয় করেন এবং সে রাজস্ব সরকার কোন খাতে ব্যয় করেন সে সম্বন্ধে যাদের ধারণা নেই তাদের কাছে এ ধরনের প্রস্তাব অভিনব মনে হতে পারে। বর্তমানে বছরে প্রায় ০.৩৭ টিসিএফ গ্যাস বিক্রি হয়। গ্রাহক পর্যায়ে প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাসের গড় দাম টাকা ৬২। এ হিসাবে ০.৩৭ টিসিএফ গ্যাস উৎপাদন করে মোট রাজস্ব আয় হয় টাকা ২২,৯৪০ মিলিয়ন-এর মধ্যে সরকার সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এবং মূল্য সংযোজন কর বাবদ আয় করেন ৫৫% (টাকা ১২,৬১৭ মিলিয়ন) বাকি ৪৫% (টাকা ১০,৩২৩ মিলিয়ন) বিভিন্ন গ্যাস কোম্পানির পরিচালনাগত ব্যয় ও আইওসি-এর গ্যাসের দাম বাবদ ব্যয় হয়। এমতাবস্থায় সরকার বছরে গ্যাস সেক্টর থেকে টাকা ১২,৬১৭ মিলিয়ন টাকা রাজস্ব গ্রহণ করে যদি গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে টাকা বিনিয়োগ করতে না পারে তবে ভবিষ্যতে গ্যাস রপ্তানি করে অতিরিক্ত সমপরিমাণ টাকা আয় করলে সে অর্থ গ্যাস সেক্টর বা শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ করা হবে

এ ধরনের প্রস্তাব শুনতে খুব ভাল শোনা যায় কিন্তু বাস্তবে কি ঘটবে তা সকলের জানা। ন্যাম সম্মেলন এবং অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতে সরকার বর্তমানে যে অর্থ ব্যয় করছেন সে অর্থ শিক্ষা এবং গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হলে দেশের অর্থনীতির চেহারা আরও ভাল হতো। সেমিনারে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্বন্ধে কোন আলোচনা ছাড়াই প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে "এনার্জি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড" নামে একটি ফান্ড সৃষ্টি করলেই ভবিষ্যৎ সুন্দর হয়ে উঠবে। কিছুদিন আগে গ্যাস রপ্তানির পক্ষের বাংলাদেশের এক গবেষক এক আলোচনা সভায় প্রস্তাব করেন যে, গ্যাস রপ্তানি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা এমনভাবে যত্ন করে সংরক্ষণ করা হবে যা রাজনীতিবিদরা কোনভাবে খরচ করতে পারবে না। ভবিষ্যতে যখন গ্যাস শেষ হয়ে যাবে তখন সে জমা করা অর্থ দিয়ে জ্বালানি তেল বা গ্যাস ক্রয় করে চাহিদা মিটানো হবে। রাজনীতিবিদরা দেশ চালাবেন কিন্তু গ্যাস রপ্তানির টাকা খরচ করতে পারবেন না এমন কোন আইন কোন রাজনীতিবিদ সংসদে পাস করবেন তা বিশ্বাস করা যায় না। অন্যদিকে এখন ১০০ ডলারের গ্যাস তুললে দেশ প্রডাকশন শেয়ারিং কন্টাক্ট-এর আওতায় ২৫ থেকে ৫০ ডলার হিস্যা পেতে পারে। এ অর্থ দিয়ে ভবিষ্যতে আবার জ্বালানি ক্রয়ের জন্য রেখে না দিয়ে নিজেদের জ্বালানি রপ্তানি না করে সংরক্ষণ করা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হয়।

গবেষকরা আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, ত্রিনিদাদ, মিশর, নাইজেরিয়ার গ্যাস উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে গ্যাস রপ্তানি করার জন্য শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন। গ্যাস রপ্তানির উদাহরণ হিসাবে কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার কথাও উঠে ছিল কিন্তু আলোচনা করা হয়নি। বাংলাদেশ গ্যাস রপ্তানি করলে বছরে নীট কত আয় হবে এবং তাতে গড় মাথাপিছু কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে সে বিষয়েও কনফারেন্সে কোন আলোচনা হয়নি।

গবেষকদের মতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত মোট উত্তোলনযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ ১৩ টিসিএফ হচ্ছে রক্ষণশীল পরিমাপ (সে অনুসারে নীট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ প্রায় ১০ টিসিএফ)। তাদের মতে কোন কোন প্রকাশিত রিপোর্টে বাংলাদেশের গ্যাসের মজুদের পরিমাণ অন্ততঃ ২০-২৫ টিসিএফ বলে ধারণা করা হয়। বাস্তবে এ মজুদ-এর পরিমাণ দ্বিগুণও হতে পারে; অর্থাৎ ৪০-৫০ টিসিএফ। গবেষকরা তাদের এ ধারণার পক্ষে কোন রেফারেন্স বা স্বীকৃত পদ্ধতির উল্লেখ করেননি। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গ্যাসের ভবিষ্যত ব্যবহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গ্যাসের উত্তোলনযোগ্য মজুদ নির্ণয় করা প্রয়োজন। অনুমিত গ্যাস রিসোর্সের হিসাবের ভিত্তিতে গ্যাসের ভবিষ্যত ব্যবহার সম্বন্ধে বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দেশের জন্য আত্মঘাতী হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Energy Organisation Act 1977 এবং সেকশন ৮০১ শর্ত অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে প্রতি দুবছর অন্তর মার্কিন কংগ্রেসের কাছে National

Energy Policy Plan (NEPP) দাখিল করতে হয়। এনার্জি সেক্টরের ন্যায় একটা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এ ধরনের একটি আইন পাস করা উচিত। এ আইন পাস করা হলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর এনার্জি সেক্টরের যাবতীয় পলিসি এবং প্ল্যান সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। তখন জাতীয় সংসদের মাধ্যমে দেশের জনগণ এনার্জি সেক্টরের বিভিন্ন সমস্যা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বন্ধে জানতে পারবে। এনার্জি অর্গানেইজেশন অ্যাক্ট-এর শর্ত অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৯৫ সালে Sustainable Energy Strategy ঘোষণা করেন। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি উক্ত পলিসি বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। উক্ত পলিসির মুখবন্ধে লেখা আছে যে, Energy is a primemover of industrial economies, high living standards, environmental challanges, and geopolitical struggles. The concept of sustainable development – development that meets the needs of today without compromissing the ability of future generations to meet their own needs – guided the formulation of the US Energy Policy and motivated to set three strategic goals (USPO 1995) :

(1) Maximize energy productivity to strengthen economy and improve living standards;
(2) Prevent pollution to reduce adverse environmental impacts associated with energy production, delivery and use;
(3) Keep America secure by reducing vulnerability to global energy market shocks.

সংক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্রের National Gas Policy এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে to maximize the economic, environmental and national security benefits of natural gas use to the nation.

প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিবেচনায় বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করাটা সাজে না। এদেশের আপামর জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা এ দেশের ভাগ্যবান ব্যক্তিদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ কারণে বাংলাদেশে প্রাপ্ত সামান্য গ্যাস মজুদকে রপ্তানি করার উপদেশের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রদূত টেরোসিটা শেফারের ন্যায় উপদেশ প্রদানকারীদের অবগতির জন্য নিচের লেখাটুকু উপস্থাপন করা হল। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের গড় মাথাপিছু এনার্জির ব্যবহার ছিল যথাক্রমে ৭৭ কেজিওই এবং ৮,৫০৩ কেজিওই (সারণী ১২.১)। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রদূত টেরোসিটা শেফারের কাছে প্রশ্ন তিনি কি মনে করেন না যে যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি পলিসিতে লিখিত উদ্দেশ্যের ন্যায় নিম্ন আয়ের দেশ বাংলাদেশেরও অর্থনৈতিক অগ্রগতি, পরিবেশগত সমস্যা সমাধান এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে একমাত্র নিজস্ব জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা? যুক্তরাষ্ট্রের ২৬৭ মিলিয়ন মানুষের ১,১২,৯৭২ মিলিয়ন টন কয়লা, ২২,৩৫১

মিলিয়ন ব্যারেল তেল, ১৬৫ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাস[১], নিউক্লিয়ার এবং অন্যান্য এনার্জি ব্যবহারের অসীম প্রযুক্তিগত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ব বাজার থেকে তেল, গ্যাস আমদানি করে আংশিক চাহিদা মিটায় (সারণী ১২.১)। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ১২৬ মিলিয়ন মানুষকে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যাবে এ ধরনের প্রচারণা চালিয়ে গ্যাস রপ্তানিতে প্রলুব্ধ করে দেশটির ভবিষ্যৎ উন্নতিকে অনিশ্চিয়তার দিকে ঠেলে দেয়ার কারণ কি? বাংলাদেশের গরিব মানুষগুলোর যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় উন্নত জীবন কামনা না করলেও শুধুমাত্র মোটামুটিভাবে বাঁচার জন্য যে পরিমাণ এনার্জি দরকার সে পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ না থাকা সত্ত্বেও গ্যাস রপ্তানির জন্য প্রলুব্ধ করার কারণ কি? রাষ্ট্রদূত শেফারের কাছে প্রশ্ন যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি পলিসিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মিটাবার জন্য এনার্জি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায় (energy for sustainable development)। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য এ ধরনের প্রত্যাশা করা কি উচিত নয়? রাষ্ট্রদূতের কূটনৈতিক উপদেশ অনুসারে যদি অনুমানের ভিত্তিতে নির্ণীত গ্যাস রিসোর্সের হিসাব অনুসারে গ্যাস রপ্তানি শুরু করে তবে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য গ্যাস মজুদ নিশ্চিত করা তো দূরের কথা বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মিটাবার জন্য যথেষ্ট গ্যাস থাকবে না। এ কারণেই বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গ্যাসের চাহিদার কথা বিবেচনা করে ৫০ বছরের গ্যাস মজুদ সংরক্ষিত রেখে অতিরিক্ত গ্যাস পাওয়া গেলে গ্যাস রপ্তানি করা বিবেচনা করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

১২.৮ নির্বাচিত দশটি দেশের এনার্জি সম্পর্কিত উপাত্তের তুলনা

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (CSIS)-এর পরিচালক রাষ্ট্রদূত টেরেসিটা সি শেফার এবং হেমানী সাইগল অরোরা কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে (Schaffer and Arora 2000) বাংলাদেশকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বাছাই করা ৬টি দেশ (আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, ত্রিনিদাদ) গ্যাস রপ্তানি করে কতটুকু লাভবান হয়েছে তার গ্রস হিসাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে কিন্তু নীট হিসাবের বর্ণনা দেয়া হয়নি। উক্ত প্রতিবেদনের একটি

---

[১] যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখন্ডে মোট গ্যাস সম্পদ (gas resource) প্রাপ্তির সম্ভবনা হচ্ছে ১৩০০-১৪০০ টিসিএফ (Anon 1992, Anon 1995)। উপকূলীয় অঞ্চলে অতিরিক্ত গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভবনা হিসাব করা হলে এর পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা নিজস্ব গ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় প্রমানিত রিজার্ভ (proved reserve) ১৬০-১৬৫ টিসিএফ বলে। কিন্তু মোট গ্যাস সম্পদ (১৩০০-১৪০০ টিসিএফ) সম্বন্ধে বলে না। অথচ বাংলাদেশকে গ্যাস রপ্তানির উপদেশ দেয়ার সময় সীমিত উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ (১১.৬১ টিসিএফ) না বলে মোট সাম্ভব্য গ্যাস সম্পদের (৫০-৬০ টিসিএফ) ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে উপদেশ দেয়। এধরনের উদ্দেশ্যমূলক উপদেশ সম্বন্ধে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে।

দুর্বল দিক হচ্ছে যে আন্তদেশীয় গ্যাস রপ্তানির অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা করে বাংলাদেশকে গ্যাস রপ্তানির ঢালাও উপদেশ দেয়া হয়েছে অথচ ঐ সকল দেশের মোট জ্বালানি সম্পদ সম্বন্ধে তুলনামূলক কোন তথ্য উপস্থাপন করা হয়নি। অন্যান্য দেশের জ্বালানি সম্পদের চিত্র তুলে না ধরে প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে সুপারিশ করে একপেশে তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনটির আর একটি দুর্বল দিক হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে গ্যাস রপ্তানির সুপারিশ করতে গিয়ে ধারণার ভিত্তিতে বাংলাদেশে প্রচুর গ্যাস আছে বলে বলা হয়েছে। তবে ভারতের এনার্জি সম্পদ ও ব্যবহার সম্বন্ধে কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি।

সেমিনারের আয়োজকদের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে কানাডার হাইকমিশনার মিঃ ডেভিড প্রেসটন ২৮ জুন, ২০০০ তারিখে উক্ত সেমিনারে কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাস রপ্তানির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেছিলেন। CSIS এর প্রতিবেদনে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি সম্পদ ও তার ব্যবহার সম্বন্ধেও কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের সচেতন নাগরিকদের অবগতির জন্য সারণী ১২.১-এ ১০টি দেশের ১৯৯৬ সালের এনার্জি সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ১০টি দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত শেফারের প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৭টি দেশ (বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, ত্রিনিদাদ) এবং অতিরিক্ত ৩টি দেশের (ভারত, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র) তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় জ্বালানি নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদকালে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সে কারণে তুলনামূলক আলোচনার সময় জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়ের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।

মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে সারণীতে উল্লিখিত ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ (ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়ার পরে)। কিন্তু লোকসংখ্যার ঘনত্বের বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৪৫ জন) এবং কানাডার অবস্থান সর্বশেষে (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ৩ জন)। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ ও জ্বালানি সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের সময় গড় মাথাপিছু হিসাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা উন্নয়ন বলতে একটা দেশের সকল মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকে বুঝায়। গড় মাথাপিছু জিএনপি-এর হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সর্বপ্রথম (২৮,০২০ ডলার) এবং বাংলাদেশের অবস্থান নবম (২৬০ ডলার)। সর্বনিম্ন অবস্থান নাইজেরিয়ার (২৪০ ডলার)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রদূত শেফার অন্য যে ৬টি দেশের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন তারমধ্যে একমাত্র নাইজেরিয়া ছাড়া অন্যান্য ৫টি দেশের (আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ত্রিনিদাদ) মাথাপিছু জিএনপি বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি। ১৯৯৬ সালে নাইজেরিয়ার গড় মাথাপিছু জিএনপি বাংলাদেশের তুলনায় বর্তমানে কম হলেও নাইজেরিয়া ওপেকভুক্ত একটি দেশ।

সারণী ১২.১ : দশটি দেশের ১৯৯৬ সালের জ্বালানি সম্পদ ও ব্যবহারের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

বিবরণ	একক	বাংলাদেশ	ভারত	আর্জেন্টিনা	বলিভিয়া	মিশর	ইন্দোনেশিয়া	নাইজেরিয়া	ত্রিনিদাদ	কানাডা	যুক্তরাষ্ট্র
ভৌগোলিক এলাকা	হাজার বর্গ কিঃমিঃ	১৪৪.০০	৩,২৮৮.০০	২.৭৮০.০০	১,০৯৯.০০	১,০০১.০০	১,৯০৫.০০	৯২৪.০০	৫.১৩	৯,৯৭১.০০	৯,৩৬৪.০০
জনসংখ্যা	মিলিয়ন	১২১.৬৭	৯৪৫.১২	৩৫.২২	৭.৫৯	৫৯.২৭	১৯৭.০৫	১১৪.৫৭	১.৩০	২৯.৯৬	২৬৫.২৮
জনসংখ্যা/ভৌগোলিক এলাকা	জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিঃমিঃ	৮৪৪.৯৩	২৮৭.৪৫	১২.৬৭	৬.৯১	৫৯.২১	১০৩.৪৪	১২৩.৯৯	২৫৩.৪১	৩.০০	২৮.৩৩
মাথাপিছু জিএনপি	এমটিওই	২৬০.০০	৩৮০.০০	৮,৩৮০.০০	৮৩০.০০	১,০৮০.০০	১,০৮০.০০	২৪০.০০	৩,৮৭০.০০	১৯,০২০.০০	২৮,০২০.০০
কয়লার রিজার্ভ	এমটিওই	৯৪১.৯৯	৩২,৬৪৫.৭৭	-	-	৭.০০	৫৩৮.২৮	১১.৩০	-	২,০৬২.১৬	৬০,৮১০.৮৮
ক্রুড অয়েলের রিজার্ভ	এমটিওই	০.৬৮	৭৯০.৭০	৩০২.৭৪	১৮.৯০	৫২৭.৫৪	৭০২.৭১	২,৮৩২.৬১	৬৬.৬৪	৬৬৫.৮৬	৩.০৩৯.৭৪
গ্যাসের রিজার্ভ	এমটিওই	২৪২.৯৮	৬০১.৯০	৪৪৭.৮৭	১০৭.৫১	৫৩২.৭২	১.৬৬০.৮৩	২,৬৪৪.৩১	২৫৪.৭৯	১.৬১৫.৭৫	৩,৯৮০.৯৩
কয়লার উৎপাদন	এমটিওই	-	১৬৭.৩৩	০.১৬	-	-	২৮.৬৯	০.০৫	-	৪৫.০০	৫৭২.৬৬
কয়লার ব্যবহার	এমটিওই	০.১৯	১৭২.৯৫	০.৮১	-	০.৬৫	৭.২৭	০.০৫	-	৩১.৯৭	৫২৯.০২
তেলের উৎপাদন	এমটিওই	০.০৫	৩৬.৪০	৩৯.৮৪	১.৮৪	৪৯.১৫	৮১.০২	১০৮.৯৬	৬.৪৭	১২১.১৬	৪১৩.০৯
তেলের ব্যবহার	এমটিওই	২.৬৪	৮২.৭২	২৪.১৫	১.৬৪	২৩.৪১	৪২.০৮	১৪.৬৯	১.১৫	৮৯.৫৯	৯১১.৭৯
তেল (উৎপাদন-ব্যবহার)	এমটিওই	-২.৫৯	-৪৬.৩১	১৫.৬৯	০.২০	২৫.৭৫	৩৮.৯৪	৯৪.২৭	৫.৩৩	৩১.৫৭	-৪৯৮.৭০

(বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায়।

বিবরণ	একক	বাংলাদেশ	ভারত	আর্জেন্টিনা	বলিভিয়া	মিশর	ইন্দোনেশিয়া	নাইজেরিয়া	ত্রিনিদাদ	কানাডা	যুক্তরাষ্ট্র
গ্যাসের ব্যবহার	এমটিওই	৬.৫১	১৬.৭৮	২৬.৩৭	০.০২	১১.৪০	২৭.৪১	৪.৪৮	৭.২৩	৭৪.০০	৫২৮.৬২
গ্যাস (উৎপাদন-ব্যবহার)	এমটিওই	০.০০	০.১০	-২.২৭	২.৩৯	০.৬৫	৩০.৪৪	০.৩৪	০.০০	৬৮.২২	-৭০.৬৩
হাইড্রোপাওয়ার	এমটিওই	০.০৮	১৯.৫৬	৭.৭৭	০.৪৯	২.৯৯	২.৭২	১.৪৭	-	৯৪.৮৮	১০৩.১৬
পরমাণু শক্তির ব্যবহার	এমটিওই	-	২.০১	১.৮৭	-	-	-	-	-	২৩.৯৪	১৮৩.৩১
মোট জীবাশ্ম জ্বালানি রিজার্ভ (RF)	এমটিওই	১,১৮৫.৬৫	৩৪,০৩৮.৩৮	৭৫০.৬১	১২৬.৪১	১,০৬৭.২৬	২,৯০১.৮২	৫,৪৮৮.২২	৩২১.৪৩	৪,৩৪৩.৭৭	৬৭,৮৩১.৫৪
মোট জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার (C)	এমটিওই	৯.৩৪	২৭২.৪৫	৫১.৩৩	১.৬৭	৩৫.৪৫	৭৬.৭৬	১৯.২৩	৮.৩৮	১৯৫.৫৭	১,৯৬৯.৪৩
মোট নবায়নযোগ্য এনার্জি	এমটিওই	০.০৮	২১.৫৭	৯.৬৫	০.৪৯	২.৯৯	২.৭২	১.৪৭	-	১১৮.৮১	২৮৬.৪৮
মাথাপিছু নবায়নযোগ্য এনার্জি	কেজিওই	০.৬৭	২২.৮৩	২৭৩.৮৬	৬৪.৪৩	৫০.৪২	১৩.৭৯	১২.৮১	-	৩,৯৬৫.৭২	১,০৭৯.৯০
মোট এনার্জির ব্যবহার	এমটিওই	৯.৪২	২৯৪.০২	৬০.৯৮	২.১৬	৩৮.৪৪	৭৯.৪৭	২০.৭০	৮.৩৮	৩১৪.৩৮	২,২৫৫.৯১
মাথাপিছু এনার্জি	কেজিওই	৭৭.৪৫	৩১১.০৯	১,৭৩১.৩০	২৮৪.১৩	৬৪৮.৬০	৪০৩.৩১	১৮০.৬৪	৬,৪৪৩.৭৫	১০,৪৯৩.৩০	৮.৫০৩.৮৮
কয়লা (R/P)	বছর		১৯৫.১০	-			১৮.৭৬	২১০.০০		৪৫.৮৩	১০৬.১৯
তেল (R/P)	বছর	১৩.৬৫	২১.৭২	৭.৬০	১০.২৬	১০.৭৩	৮.৬৭	২৬.০০	১০.২৯	৫.৫০	৭.৩৬
গ্যাস (R/P)	বছর	৩৭.৩৩	৩৫.৬৭	১৮.৫৮	৪৪.৬০	৪৪.২০	২৮.৭১	৫৪৮.৫০	৩৫.২৩	১১.৩৬	৮.৬৯
মাথাপিছু জীবাশ্ম জ্বালানির প্রাপ্যতা	টিওই	৯.৭৪	৩৬.০১	২১.৩১	১৬.৬৬	১৮.০১	১৪.৭৩	৪৭.৯০	২৪৭.২৫	১৪৪.৯৯	২৫৫.৭০
মাথাপিছু তেল ও গ্যাসের প্রাপ্যতা	টিওই	২.০০	১.৪৭	২১.৩১	১৬.৬৬	১৭.৮৯	১১.৯৯	৪৭.৮০	২৪৭.২৫	৭৬.১৬	২৬.৪৭

R- Reserve, RF- Reserve of Fossil Fuels, P- Production, C- Consumption of Fossil Fuels per year. MTOE- Million Tonne Oil Equivalent
Source : Compiled from OGJ Energy Database (Simpson 1998) and Hammond (1990).

১৯৯৬ সালের হিসাব অনুসারে সারণীতে অন্তর্ভুক্ত ১০টি দেশের নিজস্ব ক্রুড অয়েল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের রিজার্ভ ছিল। ৭টি দেশের নিজস্ব কয়লার রিজার্ভ ছিল। ত্রিনিদাদ বাদে বাকি ৯টি দেশে হাইড্রোপাওয়ার ব্যবহৃত হয়েছে। মাত্র ৪টি দেশে (ভারত, আর্জেন্টিনা, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র) পারমাণবিক শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে।

সারণী ১২.১-এ উল্লিখিত বিভিন্ন দেশের কয়লার মজুদ/উৎপাদনের অনুপাত (R/P) ratio ছিল : ভারত ১৯৫.১ বছর, ইন্দোনেশিয়া ১৮.৮ বছর, নাইজেরিয়া ২১০ বছর, কানাডা ৪৫.৮ বছর এবং যুক্তরাষ্ট্র ১০৬.২ বছর। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে কয়লা উৎপাদিত না হওয়ায় বাংলাদেশের জন্য রিজার্ভ/প্রডাকশন অনুপাত হিসাব করা হয়নি। (R/P) সূচকের তাৎপর্য হচ্ছে যে উক্ত দেশে ১৯৯৬ সালে যে হারে কয়লা উত্তোলন করা হয়েছে (P টন হারে) সে হারে উত্তোলন করা হলে উত্তোলনযোগ্য মজুদ (R টন), (R/P) বছর পর্যন্ত উত্তোলন করা সম্ভব হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কয়লা উত্তোলনের বাৎসরিক হার (P টন) পরিবর্তন হলে অথবা কয়লার নতুন রিজার্ভ (R টন) আবিষ্কৃত হলে, (R/P) অনুপাত পরিবর্তিত হবে। কয়লার মোট মজুদের একটি অংশ বাস্তবে উত্তোলন করা সম্ভব হয়। এমতাবস্থায় উত্তোলনযোগ্য মজুদের উপাত্ত পাওয়া গেলে মোট মজুদের পরিবর্তে সে উপাত্ত ব্যবহার করে (R/P) হিসাব করা হলে বাস্তবে এ সূচক ব্যবহারের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ত।

বিভিন্ন দেশের ক্রুড অয়েলের (R/P) অনুপাত ছিল : বাংলাদেশ ১৩.৬৫ বছর, ভারত ২১.৭২ বছর, আর্জেন্টিনা ৭.৬০ বছর, বলিভিয়া ১০.২৬ বছর, মিশর ১০.৭৩ বছর, ইন্দোনেশিয়া ৮.৬৭ বছর, নাইজেরিয়া ২৬.০ বছর, ত্রিনিদাদ ১০.২৯ বছর, কানাডা ৫.৫০ বছর, যুক্তরাষ্ট্র ৭.৩৬। এর মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র তেল আমদানিকারক দেশ এবং আর্জেন্টিনা, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, ত্রিনিদাদ ও কানাডা ছিল তেল রপ্তানিকারক দেশ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলাদেশে যে, সামান্য তেলের ক্ষেত্রটি ১৯৯৬ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল সে ক্ষেত্র থেকে এখন কোন তেল উত্তোলন করা যাচ্ছে না। সারণীতে বাংলাদেশের তেলের যে উপাত্ত দেখানো হয়েছে তা বেশিরভাগই প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে পাওয়া তরল হাইড্রোকার্বন (Natural Gas Liquid).

১৯৯৬ সালে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের (R/P) ছিল : বাংলাদেশ ৩৭.৩৩ বছর, ভারত ৩৫.৬৭ বছর, আর্জেন্টিনা ১৮.৫৮ বছর, বলিভিয়া ৪৪.৬০ বছর, মিশর ৪৪.২০ বছর, ইন্দোনেশিয়া ২৮.৭১ বছর, নাইজেরিয়া ৫৪৮.৫০ বছর, ত্রিনিদাদ ৩৫.২৩ বছর, কানাডা ১১.৩৬ বছর, যুক্তরাষ্ট্র ৮.৬৯ বছর। এর মধ্যে আর্জেন্টিনা ও যুক্তরাষ্ট্র গ্যাস আমদানিকারক দেশ এবং বলিভিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও কানাডা ছিল গ্যাস রপ্তানিকারক দেশ। এখানে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ বছরে ৬.৫১ এমটিওই হারে গ্যাস উত্তোলন করেও (R/P) অনুপাত ছিল ৩৭.৩৩ বছর অথচ যুক্তরাষ্ট্র বছরে ৪৫৭.৯৯ এমটিওই হারে গ্যাস উত্তোলন করেও (R/P) অনুপাত ছিল মাত্র ৮.৬৯ বছর। কোন দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের (R/P) সেদেশের গ্যাসের মজুদ ব্যবস্থাপনার জন্য সূচক

হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিন্তু রপ্তানির সিদ্ধান্তের সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয়। অথচ রাষ্ট্রদূত শেফার বাংলাদেশের ও যুক্তরাষ্ট্রের গ্যাসের (R/P) অনুপাতের তুলনায় বাংলাদেশের (R/P) বেশি হওয়ায় এখানে প্রচুর গ্যাস আছে বলে বাংলাদেশ থেকে গ্যাস রপ্তানির উপদেশ দিয়েছেন।

সারণীতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহার ছিল : বাংলাদেশ ৭৭ কেজিওই, ভারত ৩১১ কেজিওই, আর্জেন্টিনা ১,৭৩১ কেজিওই, বলিভিয়া ২৮৪ কেজিওই, মিশর ৬৪৯ কেজিওই, ইন্দোনেশিয়া ৪০৩ কেজিওই, নাইজেরিয়া ১৮১ কেজিওই, ত্রিনিদাদ ৬,৪৪৪ কেজিওই, কানাডা ১০,৪৯৩ কেজিওই এবং যুক্তরাষ্ট্র ৮,৫০৪ কেজিওই। যেকোন দেশের গড় মাথাপিছু জিএনপি-এর সাথে গড় মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ যে দেশের মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ কম সে দেশের গড় মাথাপিছু জিএনপিও কম। দেশগুলোর মাথাপিছু জিএনপি ছিল : বাংলাদেশ ২৬০ ডলার, ভারত ৩৮০ ডলার, আর্জেন্টিনা ৮,৩৮০ ডলার, বলিভিয়া ৮৩০ ডলার, মিশর ১,০৮০ ডলার, ইন্দোনেশিয়া ১,০৮০ ডলার, নাইজেরিয়া ২৪০ ডলার, ত্রিনিদাদ ৩,৮৭০ ডলার, কানাডা ১৯,০২০ ডলার এবং যুক্তরাষ্ট্র ২৮,০২০ ডলার। যে সকল দেশের গড় মাথাপিছু জিএনপি বেশি সে দেশের মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারও বেশি। যে সকল দেশের গড় মাথাপিছু জিএনপি কম সে সকল দেশের মাথাপিছু জিএনপি বৃদ্ধি করতে হলে গড় মাথাপিছু জ্বালানির ব্যবহারও বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে।

গড় মাথাপিছু জিএনপি বৃদ্ধির জন্য গড় মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় কোন দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা পর্যালোচনার জন্য (R/P) অনুপাতের সূচকের বদলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গড় মাথাপিছু জীবাশ্ম জ্বালানি (fossil fuels) এর প্রাপ্যতাকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করা বেশি যুক্তিসঙ্গত। বিভিন্ন দেশের গড় মাথাপিছু জীবাশ্ম জ্বালানির প্রাপ্যতা (কয়লা, তেল ও গ্যাসের মজুদ/জনসংখ্যা) নিম্নরূপ : বাংলাদেশ ৯.৭ টিওই, ভারত ৩৬.০ টিওই, আর্জেন্টিনা ২১.৩ টিওই, বলিভিয়া ১৬.৭ টিওই, মিশর ১৮.০ টিওই, ইন্দোনেশিয়া ১৪.৭ টিওই, নাইজেরিয়া ৪৭.৯ টিওই, ত্রিনিদাদ ২৪৭.৩ টিওই, কানাডা ১৪৫ টিওই, যুক্তরাষ্ট্র ২৫৫.৭ টিওই। বাংলাদেশের মাথাপিছু জীবাশ্ম জ্বালানির প্রাপ্যতা ছিল সবচেয়ে কম এবং যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী। কয়লার উত্তোলনযোগ্য মজুদের উপাত্ত না জানার কারণে কয়লার মোট মজুদের উপাত্ত ব্যবহার করে মাথাপিছু জীবাশ্ম জ্বালানি প্রাপ্যতা হিসাব করা হয়েছে। এ সূচকের ভিত্তিতে জ্বালানি নিরাপত্তা সম্বন্ধে সঠিকভাবে ধারণা করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ ১৭৫০ মিলিয়ন টন এর মধ্যে মাত্র ৭০ মিলিয়ন টন উত্তোলনযোগ্য। সেক্ষেত্রে ৭০ মিলিয়ন টন উত্তোলনযোগ্য কয়লার হিসাবে বাংলাদেশের মাথাপিছু জীবাশ্ম জ্বালানির প্রাপ্যতা হয় ২.৩১ টিওই।

এমতাবস্থায় কয়লার মজুদ বাদ দিয়ে তেল ও গ্যাসের মজুদের উপাত্ত ব্যবহার করে তেল ও গ্যাসের মাথাপিছু প্রাপ্যতা (তেল ও গ্যাসের মজুদ/জনসংখ্যা) হিসাব করা হয়েছে : বাংলাদেশ ২.০ টিওই, ভারত ১.৫ টিওই, আর্জেন্টিনা ২১.৩ টিওই, বলিভিয়া ১৬.৭ টিওই, মিশর ১৭.৯ টিওই, ইন্দোনেশিয়া ১২.০ টিওই, নাইজেরিয়া ৪৭.৮ টিওই, ত্রিনিদাদ ২৪৭.৩ টিওই, কানাডা ৭৬.২ টিওই, যুক্তরাষ্ট্র ২৬.৫ টিওই। ত্রিনিদাদ, কানাডা ও নাইজেরিয়া মাথাপিছু তেল ও গ্যাসের প্রাপ্যতা ছিল যথাক্রমে ২৪৭.২৫ টিওই, ৭৬.১৬ টিওই এবং ৪৭.৮০ টিওই। এ কারণে এ তিনটি দেশ বর্তমানে নিজস্ব এনার্জি নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করে তেল ও গ্যাস রপ্তানি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু তেল ও গ্যাসের প্রাপ্যতা এবং ব্যবহার ছিল যথাক্রমে ২৬.৫ টিওই এবং ৫.৪ টিওই। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত মোট তেল ও গ্যাসের ৩৯.৫% অন্য দেশ থেকে আমদানি করে মেটানো হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রদূত শেফার যে ছয়টি দেশের (আর্জেনটিনা, বলিভিয়া, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া ও ত্রিনিদাদ) উদাহরণ দিয়ে বাংলাদেশকে গ্যাস রপ্তানির উপদেশ দিয়েছেন সবক'টি দেশের মাথাপিছু জীবাশ্ম জ্বালানির প্রাপ্যতা এবং মাথাপিছু তেল ও গ্যাসের প্রাপ্যতা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি। রাষ্ট্রদূত শেফারের উপদেশ অনুসারে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিলে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মাথাপিছু জিএনপি ছিল যথাক্রমে ২৬০ ডলার এবং ৩৮০ ডলার। বাংলাদেশ ও ভারতে মাথাপিছু জ্বালানির ব্যবহার ছিল যথাক্রমে ৭৭ কেজিওই এবং ৩১১ কেজিওই। বাংলাদেশ ও ভারতের মাথাপিছু জীবাশ্ম জ্বালানির প্রাপ্যতা ছিল যথাক্রমে ৯.৭ টিওই এবং ৩৬.০ টিওই। তেল ও গ্যাসের মাথাপিছু প্রাপ্যতা ছিল যথাক্রমে ২.০ টিওই এবং ১.৫ টিওই। বাংলাদেশ ও ভারতের ব্যবহৃত তেল ও গ্যাসের যথাক্রমে ২৮.৬% এবং ৪৬.৫% আমদানি করে চাহিদা মিটানো হয়েছে। মাথাপিছু তেল ও গ্যাসের প্রাপ্যতার বিবেচনায় ভারতের অবস্থান বাংলাদেশের পরে। যে কারণে ভারত দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করা হলে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

১২.৯ বাংলাদেশ থেকে ভারতে গ্যাস আমদানির আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০ বিটিভিতে অনুষ্ঠিত দেশবাসীর মুখোমুখি অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন যে, দেশের গ্যাসের বর্তমান চাহিদা মিটিয়ে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও ৫০ বছরের মজুদ রেখে বিদেশে রপ্তানির কথা ভাবা যেতে পারে। পরবর্তীতে ২০ মার্চ, ২০০০ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশে সফরের সময়ও শেখ হাসিনা অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন। ১১ মার্চ, ২০০০ তারিখে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের এক জরুরি সভায় শেখ হাসিনা

বলেন যে, আগামী ৫০ বছর পর্যন্ত দেশের চাহিদা পূরণ হতে পারে এমন মজুদ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত গ্যাস রপ্তানি করা হবে না। এপ্রিল ২০০০ মাসে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে জানান যে, ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে গ্যাসের উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ হচ্ছে ১০.০৬ টিসিএফ। উক্ত গ্যাস মজুদে দেশের ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। অপর একটি সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান যে, ৫০ বছরের গ্যাস মজুদ না রেখে বাংলাদেশ গ্যাস রপ্তানি করবে না। তিনি বলেন যে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সাথে প্রেস ব্রিফিং-এর সময় পরিষ্কারভাবে এ বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছেন। এপ্রিল ২০০০ ওয়াশিংটনে চ্যান্সারি উদ্বোধনকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্যাস রপ্তানি প্রসঙ্গে তার পূর্ব ঘোষিত নীতির পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন যে, নিজেদের জন্য ৫০ বছরের মজুদ রেখেই কেবল গ্যাস রপ্তানির কথা ভাবা যায়। আর এটা নির্ভর করবে দেশের মজুদ কত আছে তার ওপর। দেশের আগামী ৫০ বছরের গ্যাসের চাহিদা পরিমাণ মজুদ রাখার পর গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এ সম্বন্ধে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়ার পর দেশবাসী এ বিষয়ে কিছুটা আশ্বস্তবোধ করছিল।

৪ মে, ২০০০ তারিখের খবরে প্রকাশ, ভারতের লোকসভায় (পার্লামেন্টে) কংগ্রেস সদস্য এন. কে. পি সালভের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে ভারতের জ্বালানিমন্ত্রী রাম নায়েক মন্তব্য করেন যে ভারতে গ্যাস রপ্তানির বিষয়ে বাংলাদেশ রাজি হয়নি। জ্বালানি মন্ত্রীর এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতের লোকসভায় বলেন যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে গ্যাস আমদানি বিষয়ে সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে দু'পক্ষের আলাপ-আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবটির ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে বাংলাদেশের তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী আব্দুল জলিল বলেন যে, ২৬ এপ্রিল তার সাথে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ থেকে ভারতে গ্যাস রপ্তানির বিষয়ে কোন আলোচনা হয়নি। গ্যাস রপ্তানি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের আলোচনার কোন তথ্য বাণিজ্যমন্ত্রীর জানা নেই (দৈনিক প্রথম আলো, ৫ মে, ২০০০)। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশের গ্যাস সম্বন্ধীয় এ গুরুত্বপূর্ণ খবর দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীও বটে। এমতাবস্থায় আশা করা গিয়েছিল যে, খবরটির গুরুত্ব অনুধাবন করে তাৎক্ষণিকভাবে জ্বালানি মন্ত্রণালয় অথবা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দেশবাসী কিছু শুনতে পাবে। কিন্তু সে ধরনের কোন ঘোষণা না দেয়ায় বিষয়টি সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে সন্দেহ রয়ে গেল। ৬ মে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সে দেশের পার্লামেন্টে দেয়া বক্তব্য সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ

করেন। তিনি এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে বলেছেন যে, গ্যাস রপ্তানির প্রশ্নে বাংলাদেশ তার পূর্বের অবস্থানে অনড় রয়েছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষে গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পূর্বে যে বক্তব্য রেখেছেন তা উদ্ধৃত করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উপরোক্ত মত প্রকাশ করেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন যে, জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের জন্য অন্ততঃপক্ষে ৫০ বছর পর্যন্ত গ্যাস মজুদের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ (দৈনিক প্রথম আলো, ৬ মে, ২০০০)। ভারতের লোকসভায় সে দেশের জ্বালনি মন্ত্রী বাংলাদেশ গ্যাস রপ্তানি করতে রাজি হয়নি বক্তব্য প্রদান করলে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন তার উল্টো বক্তব্য দিয়ে বললেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতে গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাবে খুবই আগ্রহী। জানিনা সেক্ষেত্রে দেশবাসী বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ব্যাখ্যা কতটুকু গ্রহণ করেছে।

দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী বিষয়ে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে সমঝোতার প্রয়োজন তা হচ্ছে না। সংবাদপত্রের খবর পড়ে ধারণা করা হয়েছিল যে, ৫০ বছর মজুদ রেখে গ্যাস রপ্তানির বিষয়ে দেশের সব চেয়ে বড় দু'টি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি একমত পোষণ করবে। এ সমঝোতা জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অত্যন্ত জরুরি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সে দেশের লোকসভায় বাংলাদেশ থেকে গ্যাস আমদানি সম্পর্কীয় মন্তব্য সম্বন্ধে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া পাংশায় অনুষ্ঠিত জনসভায় ঘোষণা দেন যে, গ্যাস রপ্তানি করলে দেশ অচল করে দেয়া হবে (দৈনিক দিনকাল, ৮ মে ২০০০)। বিএনপির মহাসচিব জনাব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন যে, কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে এবং জাতিকে ৫০ বছরের গ্যাস মজুদ রেখে গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্তের বিষয় আশ্বাস প্রদান করেছেন; গ্যাস নিয়ে সরকারের গোপন ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার জাতির সাথে প্রতারণার সামিল। (দৈনিক ইনকিলাব, ৯ মে, ২০০০)

১২.১০ যুক্তরাষ্ট্রের মুখ্য-উপ-সহকারী জ্বালানি সচিব (মন্ত্রী) জনাব ক্যালভিন হামফ্রের বক্তব্য

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব ড. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী বি,বি সপ্তাহব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রে সফরকালে ১৫ ডিসেম্বর তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন জ্বালানি মন্ত্রী (যুক্তরাষ্ট্রের প্রথা অনুসারে জ্বালানি সচিব বলা হয়) বিল রিচার্ডসন-এর সাথে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের উন্নয়নের জন্য একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। উক্ত চুক্তির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জ্বালানি উন্নয়নের জন্য ৮টি ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেয়। এ চুক্তির সূত্রে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি দফতরের নীতি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক

ভারপ্রাপ্ত সহকারী সচিব জনাব ক্যালভিন হামাফ্রের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে আসেন। জনাব হামফ্রে সে সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ সরকারের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতে আসিনি।' বাংলাদেশের জন্য কি ভাল হবে সে ব্যাপারটিতে সহযোগিতা দিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। এটি গ্রহণ করা না করা বাংলাদেশের ব্যাপার। তিনি বলেন, আমরা দু'দেশই সমান অংশীদারিত্ব নিয়ে কাজ করতে চাই – আমাদের দেশ বড় কি ছোট সে ব্যাপারটি মুখ্য নয় (দৈনিক সংবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯)। জনাব হামফ্রের এ কথাগুলো তখন বেশ আন্তরিক মনে হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের উন্নয়নের সহায়তার জন্য তিনটি সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৮ লক্ষ ৮০ হাজার ডলার অনুদান প্রদান করে। তিনটি চুক্তির প্রথম চুক্তির অধীনে প্রথমত আগামী ৫ বছর যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ জ্বালানি সম্বন্ধীয় তথ্য আদান প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে বার্ষিক জ্বালানি প্রতিবেদন, জ্বালানি বাজার প্রতিবেদন, গ্যাস, কয়লাসহ অন্যান্য উপাত্তের তথ্য দেয়া হবে। দ্বিতীয় চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের যথাযথ ব্যবহারের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবে। মেসার্স জেমস কেমিক্যাল নামে যুক্তরাষ্ট্রের একটি কনসাল্টিং কোম্পানি চুক্তির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বিনিময়ে গ্যাস ইউটিলাইজেশন স্টাডি সম্পন্ন করবে। তৃতীয় চুক্তির অধীনে ইউনোকল কর্তৃক প্রণীত রীপ প্রকল্পের জন্য উপদেষ্টা সার্ভিস প্রদান করা হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের একটি কনসালটিং কোম্পানিকে এ কাজটি করার জন্য নিয়োগ করা হয়। দুই দেশের সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা এ চুক্তির অগ্রগতি মনিটর করবেন। ঢাকায় সফরকালে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি প্রতিনিধি দল তৎকালীন বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন যে জ্বালানি খাতের ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের ঐকমত্য থাকা প্রয়োজন।

আগস্ট ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সফররত বাংলাদেশী সাংবাদিকদের কাছে মত ব্যক্ত করে যুক্তরাষ্ট্রের মুখ্য-উপ- সহকারী জ্বালানি মন্ত্রী মিঃ ক্যালভিন হামফ্রে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ নির্বাচন দু'দেশেই রাজনৈতিক ক্ষমতার পট-পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। তারা এর আগেই যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি খাতে দু'দেশের সহযোগিতাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে যেতে চায়। এ ব্যাপারে সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি হয়ে গেলে কোন সরকার এ নীতি থেকে সরে আসতে পারবে না। সহযোগিতাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা আছে বলে মিঃ হামফ্রে উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে তিনি সেপ্টেম্বর ২০০০ এ ঢাকা আসবেন বলে জানিয়েছেন। সহযোগিতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বলতে মিঃ হামফ্রে কি বুঝাতে চেয়েছেন তা খবর থেকে বুঝা যায় না। তবে মিঃ হামফ্রের ফেব্রুয়ারির ১৯৯৯ মাসের বক্তব্য এবং আগস্ট ২০০০-এ দেয়া বক্তব্যের সুরের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে বলে মনে হয়।

দৈনিক ইনকিলাবের ৯ আগস্ট, ২০০০ তারিখে প্রকাশিত খবর অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক মুখ্য-উপ-সহকারী জ্বালানি সচিব মিঃ ক্যালভিন হামফ্রে বলেছেন যে, বাংলাদেশ হল একটি অমিত সম্ভাবনার দেশ। জ্বালানি সম্পদকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হলে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে সিঙ্গাপুর, কোরিয়ার মত একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। এ খবরটি পড়ে প্রথমে বিশ্বাস করতে খুবই অসুবিধা হয়েছে তার কারণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি এ ধরনের একটি বিবৃতি দেবেন। এ বিবৃতির মর্মার্থ রাষ্ট্রদূত হোলজম্যান-এর আশাবাদকেও বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে ১৯৯৮ সালের মাথাপিছু জিএনপি-এর ভিত্তিতে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : নিম্ন আয়ভুক্ত দেশ (মাথাপিছু জিএনপি ৭৬০ ডলার পর্যন্ত), মধ্যম আয়ের দেশ (মাথপিছু জিএনপি ৭৬১ ডলার থেকে ৯,৩৬০ ডলার পর্যন্ত) এবং উচ্চ আয়ের দেশ (মাথাপিছু জিএনপি ৯,৩৬১ ডলার ও এর ঊর্ধ্বে)। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ, কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও সিঙ্গাপুরের মাথাপিছু জিএনপি ছিল যথাক্রমে ৩৫০ ডলার, ৭,৯৭০ ডলার, ২৯,৩৪০ ডলার এবং ৩০,০৬০ ডলার। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশ একটি নিম্ন আয়ভুক্ত দেশ, কোরিয়া একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও সিঙ্গাপুর উচ্চ আয়ের দেশ। জনাব হামফ্রে সিঙ্গাপুরকে মধ্যম আয়ের শ্রেণীভুক্ত দেশ বলবেন এ কথা ভাবতেও অবাক লাগে। সম্ভাবত যে সাংবাদিক খবরটি পাঠিয়েছেন তিনি হয়তো বা ভুল শুনেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে হিসাব করে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশের পক্ষে গ্যাস রপ্তানির আয় দিয়ে এক বছরের জন্যও মাথাপিছু জিএনপি ৩৫০ ডলার থেকে ৭৬১ ডলারে উন্নীত করা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুরের সাথে তুলনা করা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

১২.১১ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের গ্যাস রপ্তানির উপদেশ

যতটা মনে পড়ে জনাব হোলজম্যান ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি অক্টোবর ১৯৯৭-এ আমেরিকান চেম্বারের সভায় ভারতে বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানির জন্য উপদেশ দেন (ডেইলী স্টার, ২৯ অক্টোবর ১৯৯৭)। পরবর্তীকালে জনাব হোলজম্যান বাংলাদেশে বিভিন্ন সেমিনারে ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে বাংলাদেশের গ্যাস ভারতে রপ্তানি করে অর্থনৈতিক প্রবদ্ধি অর্জনের জন্য উপদেশ দেন (ডেইলী ইনডিপেনডেন্ট, ২৪ মার্চ, ১৯৯৯, দৈনিক সংবাদ, ২৫ মার্চ, ১৯৯৯)। জনাব হোলজম্যানের বক্তব্যের মর্মার্থ ছিল গ্যাস ব্যবহারের বর্তমান হার বজায় থাকলে গ্যাস মজুদে ৪৫ বছর চলবে; পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতে গ্যাস রপ্তানি করে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে এবং ২০২০ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে মধ্যম আয়ের তালিকাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে স্থান করে নিতে পারবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে হিসাব করে দেখানো হয়েছে যে প্রডাকশন শেয়ারিং চুক্তির শর্তানুসারে গ্যাস রপ্তানি করে আয় করা বেশিরভাগ অর্থ আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো পেতে পারে। বাংলাদেশে তার অংশ হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ পাবে তা দিয়ে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এ ছাড়া বাংলাদেশের গ্যাসের মোট মজুদ নির্ণয় না করে গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত দেশের জন্য আত্মঘাতী হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোকে আর্থিকভাবে লাভবান করার লক্ষ্যে প্রচার চালানো সম্মানিত রাষ্ট্রদূতের অর্থনৈতিক কূটনৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

দেশের জন্য ভাল হত যদি দেখা যেত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূতগণও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জোর প্রচারণা চালাতেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক গোল টেবিল বৈঠকে বাংলাদেশের এক সাবেক রাষ্ট্রদূতকে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলতে শুনা গেছে যে, মাটির নীচের গ্যাস এখনই তুলে রপ্তানির ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পরবর্তীতে বিকল্প জ্বালানি আবিষ্কৃত হলে মাটির নীচের গ্যাস মূল্যহীন হয়ে যাবে। বাংলাদেশের সে অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ বিশ্বের জ্বালানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্বন্ধে ধারণা রেখে এ বক্তব্য দিয়েছিলেন না কি অন্য কোন উদ্দেশ্যে? যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজস্ব কয়লা, তেল, গ্যাস সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর বিদেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করে আংশিক চাহিদা মিটায় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অতি সামান্য গ্যাস রিজার্ভ এখনই তুলে রপ্তানি না করলে মূল্যহীন হবে বলাটা বিভ্রান্তিকর ছাড়া আর কিছু নয়। সেই একই আলোচনা সভায় একজন প্রাক্তন জ্বালানি সচিব বক্তব্য রেখেছেন যে, তিনি কেয়ার্ণের স্বাক্ষরিত পিএসসি দেখেছেন। তার মতে সরকারের গ্যাস রপ্তানি না করতে দিয়ে উপায় নেই। রাষ্ট্রীয় গোপণীয়তার কথা বলে জনগণের ভোটে নির্বাচিত জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সম্মানিত সংসদ সদস্যদেরকে স্বাক্ষরিত পিএসসির-এর কপি দেখতে দিতে যেখানে এত সাবধানতা সেখানে একজন সাবেক আমলা স্বাক্ষরিত পিএসসি দেখেছেন বলে গর্ব করে বক্তব্য রাখা কতটা যুক্তিসঙ্গত তা পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন।

যেখানে বাংলাদেশ ও ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূতগণ বর্তমানে আন্তর্জাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করছেন সেখানে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত বা আমলারাও হয়তো এ ধরনের একটি ভাল সুযোগের আশা করেন। আইনগত দিক থেকে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর বাংলাদেশের একজন নাগরিকের যে কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিতে হয়ত বাধা নেই। তবে সে চাকরির দায়িত্ব নিয়ে যদি বাংলাদেশের স্বার্থের পরপন্থী কাজ করতে হয় তবে তা বেআইনী না হলেও নৈতিকতা বিরোধী। আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো ফ্রি মার্কেট-এ বিশ্বাস করে; ফেয়ারনেসটা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হলে পালন করতে অস্বস্তি বোধ করে। মডেল পিএসসি-এর ১০নং ধারার শর্ত অনুসারে বিদেশী কোম্পানিগুলোকে পর্যায়ক্রমে যথাযোগ্য বাংলাদেশীদের নিয়োগ করতে হবে। দেশের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে

পিএসসিতে এ সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ণ করা প্রয়োজন। তা না হলে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো অনেক বেতনে চাকরির দেয়ার বিনিময়ে বর্তমানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্ট্রাটেজিক পজিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী সুবিধা আদায় করে নিতে পারে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত জনাব জন সি হোলজম্যান ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যোগে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বলেছেন যে, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করা উচিত এবং অর্জিত আয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো প্রভৃতি খাতের উন্নয়নে বিনিয়োগ করা উচিত। তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস রয়েছে। তবে ২০-৩০ বছর পর এই গ্যাসের উপযোগিতা তেমন থাকবে না। কাজেই গ্যাস রপ্তানি বাংলাদেশের ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে (দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ মে, ২০০০)। মার্কিন রাষ্ট্রদূত এর আগে যখনই গ্যাস রপ্তানির উপদেশ দিতেন তখন বলতেন যে, বাংলাদেশ গ্যাস রপ্তানি করে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নতি হতে পারবে। রাষ্ট্রদূত এবারে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস মজুদ আছে বলে বলেছেন কিন্তু কি পরিমাণ আছে তা বলেন নি এবং কতটুকু রপ্তানি করা উচিত তাও বলেননি। যতটা মনে পড়ে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বাংলাদেশে সফরের সময় বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলোচনাকালে বলেছিলেন যে, সৌরশক্তির প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ব্যবহার যেভাবে হচেছ তাতে আগামী বিশ-পঁচিশ বছর পর প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রয়োজন তেমন নাও থাকতে পারে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের অভিমতের পুনরোক্তি করেছেন মাত্র।

১২.১২ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জ্বালানি উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সাবেক সহকারী পররাষ্ট্র সচিব কার্ল ইন্ডরফার্থ যুক্তরাষ্ট্রের জন হফকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশে নাটকীয়ভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটছে। তিনি পূর্বাভাস দিয়ে বলেন যে, আগামী ২০20 সালের মধ্যে বাংলাদেশ মাঝারি মানের আয় সম্পন্ন দেশের মর্যাদা লাভ করবে। বাংলাদেশে প্রচুর সম্ভাবনা লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি দপ্তরের নেতৃত্বে ইউএস-বাংলাদেশ এনার্জি পার্টনারশিপ গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশের গ্যাস মজুদ এবং হিমালয় অঞ্চলের পানি বিদ্যুৎ সম্ভাবনা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগের সুযোগ হতে পারে (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ অক্টোবর, ১৯৯৯)। সার্ক অঞ্চলে ব্যবসায় নিয়োজিত মার্কিন কোম্পানিগুলোর স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বিভাগ এবং ইউএসএআইডি ২-৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯-এ কাঠমান্ডুতে সার্ক দেশের বিশেষজ্ঞ ও মার্কিন কোম্পানির কর্মকর্তাদের এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বৈঠকে পাইপলাইনের মাধ্যেমে বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি এবং বিদ্যুৎ গ্রিডের মাধ্যমে নেপালের জলবিদ্যুৎ রপ্তানির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। ইউএসএআইডি-এর সহযোগিতায় জ্বালানি সংক্রান্ত কারিগরি ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা চালানোর ব্যাপারে

প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন (দৈনিক ভোরের কাগজ, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের দক্ষিণ এশিয়া সফরকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ৬-৮ মার্চ, ২০০০ তারিখে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে "এনার্জি সাউথ এশিয়া" শীর্ষক কনফারেন্স আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এনার্জি ডিভিশনের সচিব, পাওয়ার ডিভিশনের সচিব, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত ও পাকিস্তানে নিয়োজিত মার্কিন রাষ্ট্রদূতগণসহ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এনার্জি কোম্পানির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন (ডেইলী ইনডিপেনডেন্ট, ১০ মার্চ, ২০০০)।

মার্চ ২০০০ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান ভ্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল দক্ষিণ এশিয়ার জ্বালানি ব্যবসায় যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর প্রাধান্য বিস্তারে সহায়তা করা। বাংলাদেশ সফরের সময় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন দক্ষিণ এশিয়ায় জ্বালানি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ৪ বছরমেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৫০ মিলিয়ন ডলার অনুদান বরাদ্দের কথা ঘোষণা দিয়েছেন। এ অর্থ দক্ষিণ এশিয়ার নির্দিষ্ট কোন দেশকে দেয়া হবে না। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সংস্থা কর্তৃক দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালা, সমীক্ষা, সভা, গবেষণা ইত্যাদি যাবতীয় কাজে ব্যবহৃত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া জ্বালানি সহযোগিতা কার্যক্রমের টার্গেট হচ্ছে নেপালের জলবিদ্যুৎ এবং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের দ্রুত উন্নয়ন এবং ভারতের চাহিদা মিটাতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বাজারজাতকরণ। এ সুযোগে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর অর্থ বিনিয়োগ করে প্রচুর পরিমাণে লাভ করার ব্যবস্থা করা। যেহেতু বাংলাদেশ এবং নেপাল অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী নয়, সে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো এ দুটি দেশের এনার্জি খাতের উন্নয়নে বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে আগ্রহী। এ ধরনের বিনিয়োগ থেকে নেপাল ও বাংলাদেশ নীট কি লাভ পাবে সে বিষয়টি সচরাচর আলোচনা করা হয় না এবং এ দেশ দুটির সাধারন নাগরিকদের জানতে দেয়া হয় না।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বাংলাদেশ ভ্রমণের সময় বলেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় ক্লিন এনার্জি উন্নয়নের জন্য তার এ অনুদান। যতটুকু বুঝা গেছে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ক্লিন এনার্জি বলতে সম্ভবত নেপালের জলবিদ্যুৎ এবং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস বুঝিয়েছেন। কেননা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গত হয় না বলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এ প্রভাবিত করবে না। অন্য দিকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানির পরে কার্বণডাই অক্সাইড গ্যাস (গ্রীণ হাউস গ্যাস) নির্গত হলেও তা সালফারযুক্ত কয়লার তুলনায় পরিবেশের অনেক কম ক্ষতিকারক। নেপালের জলবিদ্যুৎ উন্নয়নে গ্রীণ হাউস গ্যাস উৎপন্ন না করলেও সে দেশের পার্বত্য অঞ্চলের বিশাল

এলাকা প্লাবিত করবে। বাংলাদেশের কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মত বিশাল জলধারা নির্মাণের প্রয়োজন হলে তার পরিবেশগত প্রাদুর্ভাবের দুর্ভোগ নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ভুগতে হবে, যেমন ভুগতে হয়েছে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের। নেপালের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে সে দেশের জনগণ ভুগবে। তাদেরকে হয়েতো ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা হবে যেমনিভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের। অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে যা সহজভাবে বুঝা যায় তাহল নেপালে বৃহদায়কারের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে নেপালের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানির লাভ অনেক অনেক গুণ বেশি হবে। সহযোগিতার রোমান্টিসিজম শেষ করে বাস্তব ক্ষেত্রে যখন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে তখন নেপালের সাধারণ মানুষ যে এ ধরনের উন্নয়নের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এবং মার্কিন প্রশাসন সত্যি সত্যি যদি নেপালের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে সিরিয়াস হতেন তাহলে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন দক্ষিণ এশিয়া ভ্রমণের সময় নেপালেও ভ্রমণে যেতেন। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা স্বাভাবিক কারণে তাদের প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা নিয়ে এত বেশি সতর্ক যে তারা প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে পাহাড়-পর্বত ও বনজঙ্গল আবৃত নেপালে যাওয়ার জন্য ক্লিয়ারেন্স দিতেন না। সম্ভবত নেপালের জলবিদ্যুৎ উন্নয়নের বিষয়টি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস উন্নয়নের ন্যায় অতটা নিশ্চিত মনে করেননি বলে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন নেপাল যাননি।

১২.১৩ এশিয়ান ডেভেলপ্‌মেন্ট ব্যাংকের গ্যাস রপ্তানির উপদেশ

ডেইলি স্টার (২৮ এপ্রিল ২০০০)-এর খবরে প্রকাশ যে, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক-২০০০ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে ভারতে বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানির সুপারিশ করেছে। বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক যেহেতু বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে তাই তাদের উপদেশ পেলে সরকারকে চিন্তাভাবনা করতে হয়। এ দেশের একজন সাধারণ নাগরিকের মনে প্রশ্ন আসে যে, এসব দাতা সংস্থার কর্মকর্তারা উপদেশ দেয়ার সময় কোন বিষয়টি বেশি প্রাধান্য দেন - তাদের গৃহিত ঋণ ব্যবস্থা টেকসই করা না এদেশের উন্নয়ন? কেননা মাঝে মাঝে যখন খবরের কাগজের মাধ্যমে জানা যায় যে, এসব ব্যাংকের অনেক উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকরা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন আয়ের উন্নয়শীল দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ খাতে তারা অকাতরে সাহায্য-সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক, এ খবর পড়লে বেশ ভাল লাগে। বাস্তবে যখন দেখা যায় যে এ দেশের সামান্য গ্যাসটুকু বিক্রির সুপারিশ করে তারা এ দেশকে আরও পিছনের দিকে ঠেলে দিতে চান তখন তাদের সহানুভূতির অঙ্গীকার সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। দেশের সীমিত গ্যাসটুকু বিক্রি করে দিলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে খুব একটা চাঙ্গা করা সম্ভব হবে না এ বিষয়ে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে হিসাব করে দেখানো হয়েছে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির বড় কর্মকর্তারা যখন বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানির জন্য অনবরত উপদেশ দিয়ে চলেছে তখন তাদের উপদেশের কারণ বুঝা যায়। তারা অতিদ্রুত লাভসহ মূল বিনিয়োগকৃত অর্থ ফিরে পাওয়ার আশায় এ উপদেশ দেন। কিন্তু বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি যখন উপদেশ দেয় তখন তারা কার স্বার্থে উপদেশ দেয়? এদেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য তাদের চিন্তা-ভাবনা কি নিছক মৌখিক আশ্বাস?

১২.১৪ বিশ্বব্যাংকের গ্যাস রপ্তানির উপদেশ

১৭ মে, ২০০০ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোর খবরে প্রকাশ, আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম) আয়োজিত ভোজ সভায় "দি চ্যালেঞ্জ অফ ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ ওভার দি নেক্সট ফাইভ ইয়ারস" শীর্ষক আলোচনায় বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের আবাসিক পরিচালক জনাব ফ্রেডরিক টি টেম্পল বাংলাদেশের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক "বাংলাদেশ ২০২০" শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ উল্লেখ করে বলেন যে, বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আগামী দু'দশক (অর্থাৎ ২০২০ সাল পর্যন্ত) বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার কমপক্ষে ৬ থেকে ৭ শতাংশ বাড়ানো প্রয়োজন। জনাব টেম্পল-এর মতে এই উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে উচ্চ বিনিয়োগকে সমর্থন যোগাতে হলে গ্যাস রপ্তানি করাই বাংলাদেশের সর্বোত্তম সুযোগ। বিশ্বব্যাংকের আবাসিক পরিচালক অবশ্য বলেননি যে কত বছর ধরে, কি পরিমাণ গ্যাস রপ্তানি করা হলে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার কতটুকু বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। বিশ্ব ব্যাংকের কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অধিক বিনিয়োগ যেমন প্রয়োজন তেমনিভাবে অধিক হারে এনার্জি ব্যবহার করাও একান্ত প্রয়োজন। যেখানে বাংলাদেশের নিজেদের প্রয়োজন পরিমাণ গ্যাসের মজুদ নিশ্চিত নয় সে ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের আবাসিক পরিচালকের গ্যাস রপ্তানি করে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ঢালাও প্রেসক্রিপশন কতটা গ্রহণযোগ্য তা পাঠক বিবেচনা করবেন। ২২ মে, ২০০০ তারিখের দৈনিক ইনকিলাবের খবরে প্রকাশ, এক গরিব মা রক্ত বিক্রি করে তার মেয়ের ভরণ-পোষণের খরচ চালাচ্ছেন। রক্ত ব্যবসায়ীর প্রেসক্রিপশন অনুসারে ধনী হওয়ার আশায় উক্ত গরিব ভদ্র মহিলা যদি তার শরীরের পুরোটুকু রক্ত বিক্রি করে দেয়ার জন্য চুক্তি করতেন তাহলে নিকট ভবিষ্যতে তার অবধারিত মৃত্যু হত। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাপ্ত সীমিত গ্যাস মজুদ রপ্তানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রয়োজন মিটাবার জন্য গ্যাস থাকবে না, তখন তার কষ্ট এ দেশের মানুষকে ভোগ করতে হবে। বিশ্ব ব্যাংকের কর্মকর্তারা ততদিনে আরও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হবেন। তখন তাদেরকে বাংলাদেশের দুঃখজনক পরিণতির কথা জিজ্ঞাসা করা হলে হয়তবা আস্তে করে বলবেন, তাদের উপদেশ কিছুটা ভুল ছিল, আর এই জন্য তারা দুঃখিত। ততদিনে বাংলাদেশের যে সর্বনাশ হওয়ার, তা হয়ে যাবে।

বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর গোষ্ঠী জি-৭ এর অর্থমন্ত্রী এবং আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তারা বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ১৬-১৭ এপ্রিল, ২০০০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী শহর ওয়াশিংটন ডিসিতে মিলিত হয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার নাগরিক উক্ত সম্মেলনের সময় এ দুটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক নীতি গ্রহণ না করার কারণে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ইতোপূর্বে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন রাজ্যের সিয়াটল শহরে এবং ২০০০ সালের প্রথম দিকে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহরে বিশ্ব বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনার সময় সচেতন জনগণ উন্নত বিশ্বের দেশসমূহ এবং তাদের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। বিশ্বের সাধারণ মানুষের এ প্রতিবাদ থেকে এ সকল সংস্থার কর্ণধার এবং কর্মকর্তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তারা উন্নয়নশীল দেশকে সংস্কারের উপদেশ দেয়ার আগে তাদের নিজেদের নীতির পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত। উন্নয়নশীল দেশের ওপর জোর করে অবাস্তব ও অমানবিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে ভবিষ্যতে এ সকল সংস্থার অস্তিত্ব টিকবে কিনা সে বিষয় সন্দেহ আছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হলে গরিব দেশের চেয়ে ধনী দেশের এবং গরিব দেশের গরিব মানুষের চেয়ে ধনী মানুষের হারাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি হবে।

তেল, গ্যাস রপ্তানি করতে গিয়ে যদি নাইজেরিয়া বা বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যায় তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। এসব দেশের দরিদ্র মানুষগুলো যখন চরম দারিদ্র্যের মুখে না খেয়ে মরতে বসবে তখন তারা খাদ্য সাহায্য নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে অবতার হিসাবে আগমন করবে। উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ মানুষ তাদের এ কূট-কৌশল সম্বন্ধে অবগত না হওয়ার কারণে এতদিন প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নামেনি। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়শীল দেশের সচেতন নাগরিকরা সিয়াটল, ব্যাংকক এবং ওয়াশিংটনের সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ মিছিলের মর্মার্থ অনুধাবন করে ভবিষ্যতে প্রতিটি দেশের রাজধানীতে এ সকল গণবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানাবে।

১২.১৫ গ্যাসের মূল্য কম করে দেখানোর প্রচেষ্টা

ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস (IMC) বাংলাদেশ, ৪ অক্টোবর, ২০০০ তারিখে হোটেল সোনারগাঁয়ে Issues in Energy Pricing in Bangladesh শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর হাফিজ জি এ সিদ্দিকি, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের তদানিন্তন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং প্রধান বক্তা হিসাবে Issues in Energy Pricing শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স (আমচ্যাম) ইন বাংলাদেশের সভাপতি জনাব ফরেস্ট ই কুকসন (Cookson 2000)। উক্ত সেমিনারে ফেসিলিটেটরের দায়িত্ব

পালন করেন ডেইলী স্টার-এর সম্পাদক জনাব মাহফুজ আনাম। জনাব কুকসন-এর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর ওপর নির্ধারিত আলোচক হিসাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশনের অধ্যাপক এম. শামসুল হক, শেল বাংলাদেশের গ্যাস ও পাওয়ার ম্যানেজার জনাব পিটার চ্যাপম্যান; ইউনোকল-বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল ম্যানেজার জনাব টেরি বাডেন, ইউএসএআইডি-এর সিনিয়র এনার্জি এডভাইজার জনাব ব্রুস ম্যাকমুলেন, ইনস্টিটিউট অফ এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজির অধ্যাপক মোঃ নুরুল ইসলাম (লেখক)। সেমিনার অনুষ্ঠানটি sponsor করেছে ইউনোকল বাংলাদেশ লিমিটেড। বাংলাদেশের জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ শীর্ষক জনাব কুকসনের প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত বিষয় ছিল পাইপ লাইনের মাধ্যমে ভারতে বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানির বিষয় বিবেচনা ও রপ্তানির সিদ্ধান্ত হলে গ্যাসের দাম কত হওয়া উচিত এবং বাংলাদেশে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যের ওপর বিদ্যমান সরকারি ট্যাক্স কমিয়ে গ্রাহক পর্যায়ে দাম কমিয়ে গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি করা উচিত। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে এ দেশের গ্যাস সম্পদের মালিক দেশের সকল জনগণ। সে কারণে সরকার গ্যাস ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রিত গ্যাস থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব দেশের সকল মানুষের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করে থাকে। গ্যাস খাতে সরকারি রাজস্ব কমানো হলে সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য অর্থে টান পড়বে। সরকার ভারতে গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে সরকার জনমতকে গুরুত্ব দেবে। গ্যাস রপ্তানি করে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করে শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মিটালেই চলবে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ সংরক্ষণ করে যথাযথ বিবেচিত হলে গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং গ্যাসের রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ করা হবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিতে। সেমিনারের সভাপতি প্রফেসর হাফিজ সিদ্দিকি বলেন যে, গ্যাস রপ্তানি সম্বন্ধে ইতোমধ্যে জাতীয় সমঝোতা সৃষ্টি হয়েছে; এখন গ্যাসের রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ করা জরুরি।

উক্ত সেমিনারে লেখকের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর সিদ্দিকি এবং মূল্য প্রবন্ধের উপস্থাপক জনাব কুকসনের মন্তব্যের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে গ্যাসের স্বীকৃত উত্তোলনযোগ্য মজুদ ৩৫-৫০ টিসিএফ নয় (এটা আন্তর্জাতিক কোম্পানির অনুমান) এবং গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন জাতীয় সমঝোতা হয়নি। সে কারণে তিবছর ০.৫ টিসিএফ হারে গ্যাস রপ্তানির প্রশ্ন আসে না। পেট্রোবাংলার তথ্য নুসারে বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলনযোগ্য মজুদসহ জুলাই ২০০০ তারিখে সের নীট উত্তোলনযোগ্য মজুদ ১১.৬১ টিসিএফ (সারণী ৫.২)। তৎকালীন ানমন্ত্রী ঘোষণা অনুসারে আগামী ৫০ বছরে দেশের প্রয়োজন মিটাবার জন্য নুমানিক ৫০-৬০ টিসিএফ গ্যাসের প্রয়োজন হবে। সে তুলনায় ১১.৬১ টিসিএফ

গ্যাস মজুদ অপ্রতুল। অতএব বর্তমান মুহূর্তে গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে দেশের দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। দেশের ১৩০ মিলিয়ন মানুষের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে দেশে প্রাপ্ত উত্তোলনযোগ্য ১১.৬১ টিসিএফ গ্যাসের হিসাব করলে মাথাপিছু গ্যাসের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ২.০ টন তেলের সমান। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে একটি মধ্যম আয়ের দেশে ১ বছরে গড় মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ হচ্ছে ১.৮ টন তেলের সমান। এমতাবস্থায় আজকে বাংলাদেশ যদি একটি মধ্যম আয়ের দেশ হত তবে প্রাপ্ত গ্যাস দিয়ে মাত্র ১.১ বছর জ্বালানি চাহিদা মিটানো সম্ভব হত। গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যের ৫৫% ট্যাক্স এবং ৪৫% গ্যাসের সরবরাহ মূল্য অর্থাৎ গ্যাসের দামের ১২২% সরকারি ট্যাক্স। গ্যাস খাতে সংগৃহিত ট্যাক্স সরকার অন্যান্য উন্নয়ন খাতে ব্যয় করে থাকে, সে কারণে ট্যাক্সের মাত্রা কমিয়ে গ্যাসের গ্রাহক পর্যায়ের মূল্য হ্রাস করার কোন যুক্তি নেই। অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় গ্যাসের গ্রাহক পর্যায়ে মূল্য বেশি কমানো হলে গ্যাসের অপচয় বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে সার উৎপাদনের জন্য গ্যাসের মূল্য সবচেয়ে কম (প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য টাকা ১.৯৩)। যে কারণে পলাশ সার কারখানায় ১ টন ইউরিয়া সার উৎপাদন করতে যমুনা সার কারখানার তুলনায় দ্বিগুণ গ্যাস খরচ করে অদক্ষতার সাথে সার উৎপাদন চালানো হচ্ছে। ভোক্তাদের কাছে সস্তা জ্বালানি প্রাপ্তির চেয়ে রিলায়েবিলিটি অনেক বেশি জরুরি। বর্তমানে পেট্রোলের তুলনায় অনেক কম দামে সিএনজি বাজারজাত করা হলেও রিলায়াবিলিটির অভাবে মোটরযানে সিএনজি-এর ব্যবহার প্রসার লাভ করছে না। বাংলাদেশ বর্তমানে প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাস ৩.০ ডলারে রপ্তানি করলে সরকার উক্ত গ্যাসের ৫০% দাম অর্থাৎ ১.৫ ডলার পেতে পারে। অথচ দেশের উন্নয়ন কাজে ১০০০ ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করা সম্ভব হলে দেশের জিডিপিতে যোগ হবে ৩৯ ডলার। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে গ্যাস রপ্তানির পরিবর্তে দেশের অভ্যন্তরে গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো উচিত। বর্তমানে পেট্রোবাংলা একটি পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন একে হোল্ডিং কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হলে ভাল হতো। গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের জন্য পেট্রোবাংলার কোন ক্ষমতা নেই। সরকার অনুমানের ভিত্তিতে রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক সময়ে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যে কারণে পেট্রোবাংলাকে অহেতুকভাবে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। পেট্রোবাংলাকে হাত পা বেঁধে পানিতে ফেলে দিয়ে সাঁতার কাটতে বললে পেট্রোবাংলার ডুবে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। যথাযথ হিসাব করে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি না করার কারণে পেট্রোবাংলা যথাসময়ে আন্তর্জাতিক কোম্পানির পাওনা পরিশোধ করতে পারছে না। ১লা সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে গ্যাসের যে বর্ধিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে সম্ভবত সে মূল্যে গ্যাস বিক্রি করে পেট্রোবাংলা যে অর্থ পায় তা আন্তর্জাতিক কোম্পানির পাওনা পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নয়।

জনাব কুকসন তার প্রবন্ধে গ্যাসের গ্রাহক পর্যায়ের মূল্য নির্ণয়ের জন্য যে পদ্ধতি প্রস্তাব করেছেন তা ছিল নিম্নরূপ : পেট্রোবাংলার কোম্পানিগুলোর উৎপাদিত প্রতি

১০০০ ঘনফুট গ্যাসের কূপমুখের মূল্য ০.৪০ ডলার এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানির উৎপাদিত প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাসের কূপ মুখে মূল্য ০.৮০ ডলার। বর্তমানে গ্রাহক পর্যায়ে ব্যবহৃত গ্যাসের ৮০% সরবরাহ করে পেট্রোবাংলার ২টি কোম্পানি এবং ২০% সরবরাহ করে ২টি আন্তর্জাতিক কোম্পানি। উপরোক্ত অনুপাতে জনাব কুকসন প্রতি ১০০০ ঘনফুট মিশ্রিত গ্যাসের গড় দাম হিসাব করেছে ০.৪৮ ডলার (০.৪ ডলার x ০.৮+০.৮ ডলার x ০.২)। কূপমুখে প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাসের গড় দাম ০.৪৮ ডলার-এর ওপর ৩০% ট্যাক্স যোগ করে গ্রাহক পর্যায়ের প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাসের দাম হিসাব করেছেন ০.৬৫ ডলার (লেখকের হিসাব হয় ০.৬২৪ ডলার)। জনাব কুকসনের প্রবন্ধে বর্ণিত গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি বিভ্রান্তিকর এবং অসম্পূর্ণ। জনাব কুকসন আন্তর্জাতিক কোম্পানির উৎপাদিত প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাসের কূপমুখে গড় দাম ধরেছেন ২ ডলার (সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে পেট্রোবাংলা ২.৯ ডলার দামে প্রতি ১০০০ ঘনফুটের মূল্য পরিশোধ করছে)। এরপর ধরে নিয়েছেন যে সরকার আন্তর্জাতিক কোম্পানির উৎপাদিত প্রফিট গ্যাসের ৬০% এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানি প্রফিট গ্যাসের ৪০% পাবে। বাস্তবে একটি গ্যাস ক্ষেত্রের পূর্ণ জীবনকালে উৎপাদিত গ্যাসের ৫০% সরকার এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানি ৫০% পেতে পারে। পরবর্তী পদক্ষেপে জনাব কুকসন ধরে নিয়েছেন যে সরকারের প্রাপ্য ৬০% গ্যাসের কোন মূল্য নেই, পেট্রোবাংলা ২ ডলারের ৪০% দাম পরিশোধ করে আন্তর্জাতিক কোম্পানির কাছ থেকে প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাস ০.৮০ ডলারে ক্রয় করছে। ৬০% গ্যাসের মূল্য শূন্য ধরে গ্যাসের গড় মূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতির আড়ালে বাংলাদেশের গ্যাস খুব সস্তা দেখিয়ে রপ্তানি করার সময় অনেক লাভ হবে এ প্রলোভন সৃষ্টি করা সহজ হবে। জনাব কুকসন গ্যাসের কূপমুখের মূল্যের উপর ৩০% ট্যাক্স ধরে গ্যাসের গ্রাহক পর্যায়ের মূল্য হিসাব করেছেন প্রতি ১০০০ ঘনফুটে ০.৬৫ ডলার। বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে গ্যাসের কূপমুখের দামের সাথে ট্রান্সমিশন খরচ, ডিস্ট্রিবিউশন খরচ যোগ করে গ্যাসের সরবরাহ খরচ হিসাব করা হয়। সরবরাহ খরচের ওপর ১২২% সরকারি ট্যাক্স (সম্পূরক কর+মূল্য সংযোজন কর) যোগ দিয়ে গ্যাসের গ্রাহক পর্যায়ের গড় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি ১০০০ ঘনফুটে ৭১ টাকা। জনাব কুকসন বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি পর্যালোচনা না করে একটি নতুন পদ্ধতি প্রস্তাব করে চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

১২.১৬ বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের গ্যাস রপ্তানির প্রচার

৯৯৭ সালের ১১ই জানুয়ারী তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ও বাংলাদেশের ৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব এবং ৎকালীন এনার্জি সচিব সাংবাদিকদেরকে জানিয়েছিলেন যে, বঙ্গোপসাগরের উপকূল ড় পার্বত্য চট্রগ্রাম, ভোলা, কুমিল্লা এবং সিলেট অঞ্চল জুড়ে গ্যাসের যে আধার ছে তার পরিমাণ ৮০ টিসিএফ- যা তখন আবিষ্কৃত গ্যাস মজুদের আটগুণ (দৈনিক

জনকণ্ঠ, ১২ জানুয়ারি, ১৯৯৭)। দ্বিতীয় রাউন্ড বিডিং-এর আলোচনা শুরুর সময় তৎকালীন জ্বালানি মন্ত্রী বাংলাদেশে ৮০টি সিএফ গ্যাস মজুদ আছে বলে সাংবাদিকদের কাছে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন (ডেইলী স্টার, ২১ অক্টোবর ১৯৯৭)।

একজন অবসর প্রাপ্ত সচিব ১০ মার্চ ২০০০ তারিখে দৈনিক ভোরের কাগজের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ২৫ থেকে ৩০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া গেছে। গ্যাস কোম্পানি এবং উত্তোলনকারীরা অনুসন্ধান চালিয়ে আভাস দিয়েছে যে বাংলাদেশের গ্যাসের পরিমাণ ১০০ ট্রিলিয়ন ঘনফুটের বেশি হতে পারে। এ প্রাপ্ত গ্যাস দিয়ে দেশের প্রায় ২০০ বছরের বেশি চাহিদা মেটানো সম্ভব। বাংলাদেশের গ্যাসের সবচেয়ে বড় মার্কেট হবে ভারত। তার মতে বাংলাদেশ পুরো ভারতকেই গ্যাস দিতে পারে। এর মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার আয় করতে পারে। গত বছর (১৯৯৯ সালে) তিনি যখন দিল্লীতে ছিলেন তখন বিখ্যাত 'হিন্দু' পত্রিকার কূটনৈতিক সম্পাদকের সাথে তার আলাপ হয়। তিনি (হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক) ঢাকায় উপস্থাপিত একটি পেপারে লিখেছিলেন "বাংলাদেশ হয়ত কয়েক বছরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার কুয়েত হিসাবে পরিগণিত হবে"। উক্ত সচিবের মতে বর্তমানে কুয়েতের যে অবস্থা বাংলাদেশের গ্যাসের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হতে পারে। তার মতে বাংলাদেশের এত গ্যাস আছে যে তা যদি ঠিক মত ব্যবহার করা যায় তবে বাংলাদেশ low-income থেকে middle-income এর একটি দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে। কিন্তু এ গ্যাস যদি বিক্রি করা না যায় তা হলে কোন ইনকামই আসবে না (দৈনিক ভোরের কাগজ, ১০ মার্চ ২০০১)। উক্ত সচিবের ধারণা অনুসারে বাংলাদেশের গ্যাসের পরিমাণ ১০০ টিসিএফ হতে পারে এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তিনি বলেননি যে বাংলাদেশ কি পরিমাণ গ্যাস রপ্তানি করে বছরে ৫ বিলিয়ন ডলার আয় করতে পারবে। প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাসের দাম ৩.০ ডলার ধরে বছরে ৫ বিলিয়ন ডলার আয় করতে হলে প্রতিদিন ৪৫৬৬ মিলিয়ন ঘনফুট হিসাবে বছরে ১.৬৬৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (৫০০০x$১০^{৬}$x$১০^{৩}$÷৩.০) গ্যাস রপ্তানি করতে হবে। সেক্ষেত্রে ২০ এবং ৩০ বছরের জন্য যথাক্রমে ৩৩.৩ টিসিএফ এবং ৫০ টিসিএফ গ্যাসের রপ্তানিযোগ্য মজুদ থাকা প্রয়োজন হবে।

১২.১৭ বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার কৌশল

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির সাতটি প্রধান উদ্দেশ্যের একটি হচ্ছে জ্বালানি সেক্টরের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় পাবলিক সেক্টরের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা। সরকার কর্তৃক গৃহীত এ নীতি অনুসারে ১৯৯৩-এর পরবর্তী সময়কালে বাংলাদেশের ভৌগলিক এলাকায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়নে এব ১৯৯৬-এর পরবর্তী সময়কালে বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়নে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক কোম্পানি অংশগ্রহণ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। বাজার অর্থনীতি যুগে বাংলাদেশের জ্বালানি সেক্টরের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কারে

আন্তর্জাতিক কোম্পানির অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় জ্বালানি নীতি, মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কন্টাক্ট এবং প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন পলিসিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়নের আন্তর্জাতিক কোম্পানির অংশগ্রহণের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন শর্তাবলীর বর্ণনা রয়েছে। গ্যাস ও বিদ্যুৎ সেক্টরে অংশগ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোকে সরকারের সাথে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়। এ চুক্তি স্বাক্ষরের আগে বিভিন্ন শর্তাবলী নিয়ে আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে আলোচনা করার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ জাতীয় বিশেষজ্ঞ টিম গঠন করা প্রয়োজন। কোন বিশেষ বিষয়ে সরকারি সংস্থাসমূহে যথাযোগ্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ না পাওয়া গেলে দেশী অথবা বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আলোচনা পর্বে দেশী টিমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে নিজস্ব জ্বালানি উৎস ব্যবহার করে দীর্ঘ মেয়াদকাল পর্যন্ত সময়ে দেশের জ্বালানি চাহিদা মিটাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং দেশের জন্য সর্বোত্তম প্রাপ্তি (গ্যাস ও তেলের জন্য সর্বোচচ অংশ বিদ্যুতের জন্য একক প্রতি সর্বনিম্ন মূল্য) নিশ্চিত করা। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক কোম্পানির কৌশলগত অবস্থান হচ্ছে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যে পক্ষ বেশি বিচক্ষণতার সাথে আলোচনা চালিয়ে অপর পক্ষকে চুক্তি স্বাক্ষরে রাজি করাতে পারবে সে পক্ষ বেশি লাভবান হবে। বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুসারে সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ টিম এবং উচ্চ পর্যায়ের কমিটি সরকারের অনুসৃত নীতির অধীনে আন্তর্জাতিক কোম্পানির সমপর্যায়ের টিমের সাথে আলাপ-আলোচনা করে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপণীত হওয়ার পর সরকার এবং কোম্পানি কর্তৃক চুক্তি অনুমোদিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী বিষয় নিয়ে মুক্ত আলোচনা করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা বিতর্কিত বিষয়সমূহের পক্ষের ও বিপক্ষের আলোচনা যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এটাই কাম্য।

১৩

বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি নিয়ে বিতর্ক

১৯৯৭-২০০১ পর্যন্ত দ্বিতীয় রাউন্ডে অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর সাথে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময়ে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনারে এবং সংবাদপত্রে বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানির পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা হয়। গ্যাস রপ্তানি বিতর্কের নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১৩.১ দেশে আবিষ্কৃত কয়লা ও জ্বালানি চাহিদা

বাংলাদেশের একদল উৎসাহী ব্যক্তি প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত নিজস্ব কয়লা ব্যবহার করে সে সকল দেশের মোট জ্বালানির চাহিদার একটি বড় অংশ মিটায়। অতএব বাংলাদেশের এনার্জি চাহিদার বড় অংশ কয়লা দিয়ে মিটানো উচিত। তাদের মতে বাংলাদেশ যদি নিজস্ব কয়লা ব্যবহার করে জ্বালানির চাহিদা মিটাত তাহলে প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হত। বাংলাদেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের কয়লার মজুদ যে কত বেশি সে সম্বন্ধে তাদের ধারণা নেই বলে এ কথা বলে থাকেন। এ বিষয়ে ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের কয়লার মজুদ ও ব্যবহারের তুলনামূলক হিসাব উপস্থাপন করা হলো : পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশের জামালগঞ্জ, বড়পুকুরিয়া এবং খালাশপীরে আবিষ্কৃত কয়লার মোট মজুদ ১৭৫০ মিলিয়ন টন হতে পারে। এরমধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লার খনি থেকে ২০০৩ সাল নাগাদ বছরে ১ মিলিয়ন টন কয়লা (বাংলাদেশের মোট কয়লার মজুদের ০.০৫%) উত্তোলন শুরু হলে সে কয়লা দিয়ে দেশের মোট জ্বালানির মাত্র ৩-৫% এর চাহিদা মিটানো যেতে পারে।

ভারতের সর্বমোট কয়লার মজুদ ৬০,৬৪৮ মিলিয়ন টন (বাংলাদেশের কয়লা মজুদের ৩৫ গুণ)। বর্তমানে ভারতে বছরে গড়ে ৩২০ মিলিয়ন টন কয়লা (ভারতের মোট কয়লার মজুদের ০.৫৩%) ব্যবহৃত হয়। চীনের মোট কয়লা মজুদের পরিমাণ ৬,১০,৮০০ মিলিয়ন টন (বাংলাদেশের কয়লা মজুদের ৩৪৯ গুণ)। চীনে বছরে গড়ে ১৫০০ মিলিয়ন টন কয়লা (চীনের মোট কয়লার মজুদের ০.২৫%) ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মোট কয়লা মজুদের পরিমাণ ১,১২,৯৭২ মিলিয়ন টন (বাংলাদেশের কয়লা মজুদের ৬৫ গুণ) এবং বছরে গড়ে ১০০০ মিলিয়ন টন কয়লা (যুক্তরাষ্ট্রের মোট কয়লা মজুদের ০.৮৯%) ব্যবহৃত হয় (Hamond 1990, Simpson 1998)।

কোন কোন উৎসাহী ব্যক্তি প্রস্তাব করেছেন যে যেহেতু ভারতের প্রচুর কয়লা আছে সে কয়লা দিয়ে ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাংলাদেশ সে বিদ্যুৎ আমদানি করে চাহিদা মিটাতে পারে এবং তার বিনিময় বাংলাদেশ ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করতে পারে। আবার কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন যে বাংলাদেশের গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ভারতে রপ্তানি করা যেতে পারে। তাদের চিন্তাভাবনার মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে যেকোন উপায়ে ভারতে গ্যাস রপ্তানি করা ।

১৩.২ নিউক্লিয়ার এনার্জি ও বাংলাদেশের এনার্জি চাহিদা

কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন যে বাংলাদেশের নিউক্লিয়ার এনার্জি ব্যবহার করে চাহিদা মিটানো উচিত এবং গ্যাস রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা উচিত। ১৩ জুন, ২০০০ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে সরকার রূপপুরে ৬০০ মেগাওয়াট নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জটিল, ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। গত ৩৭ বছর ধরে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আগের সরকার যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তার সরকার প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া গেলে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করা হবে। নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কারণে বর্তমানে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য বিনিয়োগের অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

১৩.৩ প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প জ্বালানি

সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বাংলাদেশ সফরের সময় তার বক্তব্যে বলেছেন যে, সৌরশক্তির প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ব্যবহার যেভাবে হচ্ছে তাতে আগামী ২০/২৫ বছর পর প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রয়োজন নাও থাকতে পারে (দৈনিক বাংলার বাণী, ২২ মার্চ, ২০০০)। অর্থাৎ বাংলাদেশের মাটির নীচের প্রাকৃতিক গ্যাস অচিরেই মূল্যহীন হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের এ উক্তি কি শুধুমাত্র বাংলাদেশের মাটির নীচের প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য প্রযোজ্য না যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা, তেল ও গ্যাসের মজুদের জন্যও প্রযোজ্য? এ ধরনের প্রযুক্তি যদি আগামী ২০/২৫ বছরে পাওয়া যায় তা যেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের Office of Technology Assessment (OTA) সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকে জানিয়ে দেয়। বিশ্বের সার্বিক জ্বালানি চাহিদা মিটাতে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে সৌরশক্তি বা অন্য কোন বিকল্প জ্বালানি উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখতে পারবে না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো যদি গ্রীণ হাউস গ্যাস থেকে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয় তবে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ রিনিউয়েবল ও অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি বিশ্বে জ্বালানি চাহিদা মিটাতে বর্তমানের তুলনায় বেশি প্রভাব রাখতে পারে (Hammonds 2000)। যুক্তরাষ্ট্রে

সফররত বাংলাদেশী সাংবাদিকরা যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে খবর পাঠিয়েছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক জ্বালানি হিসাবে সৌরশক্তির অভ্যুদয় ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। যতদিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব কয়লা, মধ্যপ্রাচ্যের তেল কিংবা কানাডা ও মেক্সিকোর গ্যাস মজুদ ফুরিয়ে না যাবে ততদিন সৌরশক্তিকে সুলভ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের প্রশ্নই উঠে না। সস্তা জ্বালানি হিসাবে সৌরশক্তির ব্যবহারের বিষয়টি এখনও গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাসের দাম ৪ ডলার। ভবিষ্যতে কোনদিন যদি এক হাজার ঘনফুটে গ্যাসের দাম বেড়ে ৫০ বা ৬০ ডলার হয় তবে এবং এ ধরনের আরও অনেকগুলো যদির যদি জন্ম হয় তখন হয়তো বিকল্প জ্বালানি হিসাবে সৌরশক্তির কথা ধরা যাবে। (দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ আগস্ট ২০০০)

১৩.৪ হাইড্রোপাওয়ার ও বাংলাদেশের এনার্জির চাহিদা

কোন কোন মহল অসত্য প্রচার করেছেন যে বাংলাদেশে ৫২,০০০ মেগাওয়াট হাইড্রোপাওয়ার এর সম্ভাবনা আছে (Sadler and Sahai 2000)। অতএব বাংলাদেশের হাইড্রোপাওয়ার উন্নয়ন করে চাহিদা মিটানো উচিত। পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাস্তবে বাংলাদেশের মোট হাইড্রোপাওয়ারের সম্ভাবনা ৭৫৫ মেগাওয়াটের মধ্যে ২৩০ মেগাওয়াট পাওয়ারপ্লান্ট স্থাপন করে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। কৃষি জমি ও বসতবাড়ি প্লাবিত হবে এ কারণে অতিরিক্ত ৫২৫ মেগাওয়াট সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাবে না। একই প্রসঙ্গে কেউ কেউ প্রস্তাব করেন যে নেপালে প্রায় ৮০,০০০ মেগাওয়াট হাইড্রোপাওয়ারের সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশ নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করে চাহিদা মিটাতে পারে এবং ভারতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে। নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আনতে কত খরচ পড়বে? নেপাল এ প্রস্তাবে সম্মত হবে কি-না অর্থাৎ জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নেপালের কোন এলাকা প্লাবিত হবে কি-না সে বিষয়টি যত্নের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। অন্যদিকে যেখানে ভারতের নিজেরই যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে সেখানে নেপাল সম্মত হলেও ভারত এ প্রস্তাবে রাজি হবে কি-না সে বিষয় সন্দেহ আছে।

১৩.৫ বাংলাদেশে প্রচুর তেল মজুদ প্রাপ্তির খবর

দেশের বহুল প্রচারিত দু'টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার (দৈনিক যুগান্তর, ৩১ অক্টোবর ২০০০; দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০১) খবরে প্রকাশ যে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ডিজিকন নামের একটি সংস্থা খবর দিয়েছে যে বাংলাদেশে ২ ট্রিলিয়ন ব্যারেলের তেলের মজুদ আছে। এর মধ্যে বড় তেল ক্ষেত্রটি সিলেট থেকে ভোলা পর্যন্ত ১৮,২০০ বর্গমাইল এলাকা ধরে বিস্তৃত। সংবাদপত্রের মতে খবরটি সত্য হলে বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু আয় বহু বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। অন্যান্যদের মত এ খবরের প্রচার করা এজন্য

গ্যাস রপ্তানির উপদেশ দেয়নি। তারা হয়তো ধরে নিয়েছে বাংলাদেশ তেল পেলে সে তেল রপ্তানি করেই বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রের Oil and Gas Journal এর প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত International Energy Statistics Source Book (Simpson 1998) এর সূত্র অনুসারে ১৯৯৮ সালে সারা পৃথিবীর মোট ক্রুড অয়েলের মজুদ ছিল ১.০২ ট্রিলিয়ন ব্যারেল। এমতাবস্থায় ২০০০ সালে বাংলাদেশের ২ ট্রিলিয়ন ব্যারেল তেলের মজুদ পাওয়ার খবরটি অসত্য এবং কাল্পনিক বলা যায়।

১৩.৬ (রিজার্ভ/প্রডাকশন) অনুপাত ও গ্যাস রপ্তানি

২০০০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশে অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ছিল ১১.৬১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (R=১১.৬১ টিসিএফ)। ১৯৯৯-২০০০ সালে বাংলাদেশের গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ০.৩৩১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (P=০.৩৩১ টিসিএফ)। অতএব ২০০০ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের (R/P) ছিল ৩৫ বছর। বাস্তব পরিস্থিতির ব্যাখ্যা না দিয়ে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে বাংলাদেশের বর্তমান গ্যাসের মজুদে ৩৫ বছর চলবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রচুর গ্যাস মজুদ আছে অতএব বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি শুরু করা উচিত। মজুদ ও উৎপাদনে অনুপাত (R/P) ৩৫ বছর এর প্রকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে যে বাংলাদশে যদি ২০০০ সালের ন্যায় প্রতি বছরে ০.৩৩১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করে তবে ২০০০ সালে অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদে ৩৫ বছর চলবে। যেহেতু বাংলাদেশের গ্যাস ব্যবহার প্রতি বছর বাড়ছে অতএব ২০০০ সালের মজুদে বাস্তবে ২০২০ সাল পর্যন্ত চলতে পারে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস (R) এবং গ্যাসের উৎপাদন (P) ছিল যথাক্রমে ১০.০৯১ টিসিএফ এবং ০.০২৭১ টিসিএফ। সে অনুসারে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের (R/P) ছিল ৩৭২ বছর। তখন এ হিসাব দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে গ্যাস রপ্তানির জন্য প্রথম প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে প্রাকৃতিক গ্যাসের (R/P) ৩৭২ বছর থেকে মাত্র ২৬ বছর পর ২০০০ সালে ৩৫ বছর হয়েছে।

১৯৯৫ সালে ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ ও উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২৩.৩০ টিসিএফ এবং ০.৬৯ টিসিএফ সে অনুসারে R/P ছিল ৩৩.৪ বছর। ১৯৯৯ সালে ভারতের প্রাকৃতিক গ্যাসের R/P ছিল ২৪ বছর (TERI 2000)। প্রতি বছর গ্যাস ব্যবহারের তুলনায় নতুন গ্যাস ক্ষেত্র কম আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে মাত্র চার বছরের ব্যবধানে ভারতের প্রাকৃতিক গ্যাসে R/P ৩৩ বছর থেকে কমে ২৪ বছর হয়ে গেছে। ভারত দীর্ঘ মেয়াদকালে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানিতে খুবই আগ্রহী।

কোন দেশের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের R/P অনুপাত স্থির কোন সূচক নয়। গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার এবং গ্যাসের ব্যবহারের সাথে R/P সূচক পরিবর্তিত হয়। গ্যাস সেক্টরের ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যতে জ্বালানি চাহিদা মিটাতে গ্যাসের ব্যবহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য R/P সূচক ব্যবহার করা হয়।

১৩.৭ বাংলাদেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ কত?

জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিকল্পিত ব্যবহারের জন্য বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ জানা প্রয়োজন হয়। ইদানীংকালে পেট্রোবাংলা ছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো গ্যাসের সম্পদ/মজুদ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ঘোষণা দেয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। গ্যাস সম্পদ এবং গ্যাস মজুদ এক নয়। সম্ভাবনার ভিত্তিতে অনুমিত প্রাকৃতিক গ্যাস-সম্পদ গ্যাস প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারনা দেয়। গ্যাস মজুদ বলতে যে পরিমাণ গ্যাস আর্থ-কারিগরি বিবেচনায় উত্তোলনযোগ্য সে গ্যাসকে বুঝায়। এ সন্দেহ দূর করার লক্ষ্যে প্রথমে গ্যাসের সম্পদ/মজুদের স্বীকৃত সংজ্ঞা এবং পেট্রোবাংলা বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত গ্যাসের সম্পদ/মজুদ পরিমাণ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হল।

কোন দেশের পেট্রোলিয়াম সম্পদকে[১] (Petroleum Resources) প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা হয় (চিত্র ১৩.১ এবং ১৩.২)। যথা আবিষ্কৃত সম্পদ (Discovered Resources) অনাবিষ্কৃত সম্পদ (Undiscovered Resources)। আবিষ্কৃত সম্পদের মধ্যে গ্যাসের যে অংশ বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলন করা সম্ভব তাকে গ্যাসের মজুদ (Reserves) বলে এবং যে অংশ বর্তমান অবস্থায় বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলন করা সম্ভব নয় তাকে সাম্ভব্য সম্পদ (Potential Resources) বলে। আবিষ্কৃত মজুদের মধ্যে যে সকল মজুদের পরিমাণ বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনের জন্য নির্ভরযোগ্যভাবে নিরূপণ করা হয়েছে তাকে প্রমাণিত মজুদ (Proved Reserves) বলে। যে সকল মজুদের উত্তোলনের সম্ভাবনা Proved Reserves তুলনায় কম তাকে Unproved Reserves বলে। Proved Reserves এর যে মজুদ বর্তমানে চালু কূপ থেকে উত্তোলন করা সম্ভব তাকে Developed Reserves বলে। যে সকল গ্যাস-মজুদ উত্তোলনের জন্য নতুন কূপ খনন করা প্রয়োজন তাকে Undeveloped Reserves বলে। Unproved Reserves যে অংশ উত্তোলনের সম্ভাবনা বেশি তাকে Probable Reserves বলে এবং যে অংশ উত্তোলনের সম্ভাবনা কম তাকে Possible Reserves বলে। অনাবিষ্কৃত সম্পদের (Undiscovered Resources) মধ্যে যে সকল এলাকার পেট্রোলিয়াম সম্পদ মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে তাকে Hypothetical Resources বলে এবং যে সকল এলাকার পেট্রোলিয়াম সম্পদ মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয়নি তাকে Speculative Resources বলে।

(ক) পেট্রোবাংলার গ্যাস মজুদের হিসাব

২০০০ সালের জুলাই মাসে পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রকাশিত ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের বিভিন্ন ধরনের গ্যাস মজুদের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল (সারণী ৫.২)।

---

[১] পেট্রোলিয়াম সম্পদ বলতে সব ধরনের পেট্রোলিয়াম তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস বুঝায়।

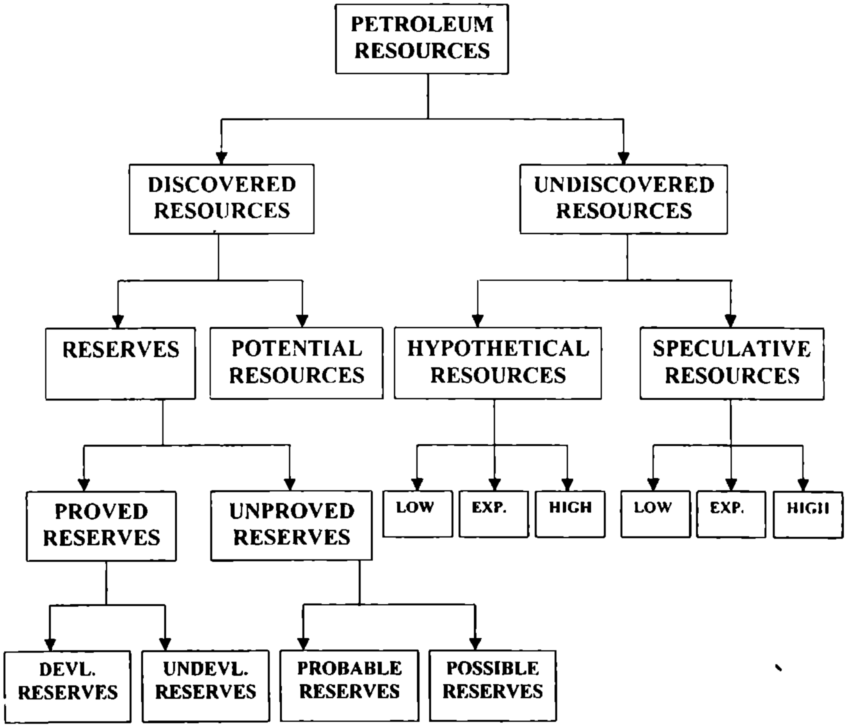
PETROLEUM RESOURCES
DISCOVERED RESOURCES
UNDISCOVERED RESOURCES
RESERVES
POTENTIAL RESOURCES
HYPOTHETICAL RESOURCES
SPECULATIVE RESOURCES
PROVED RESERVES
UNPROVED RESERVES
LOW
EXP.
HIGH
LOW
EXP.
HIGH
DEVL. RESERVES
UNDEVL. RESERVES
PROBABLE RESERVES
POSSIBLE RESERVES

উৎসঃ CCOP

চিত্র ১৩.১ : পেট্রোলিয়াম সম্পদ ও মজুদের শ্রেণীবিন্যাস

INCREASING SEGREGATION

<table>
<tr><td colspan="5">DISCOVERED RESOURCES</td><td colspan="2">UNDISCOVERED RESOURCES</td></tr>
<tr><td colspan="5">Discovered Resources comprise the total discovered deliverable petroleum quantities from the start of production to the cease of production, based on current understanding of the quantities in place and the recovery factor.</td><td colspan="2">The total estimated quantities of petroleum to be recoverable from accumulations that remain to be discovered.</td></tr>
<tr><td colspan="4">RESERVES</td><td>POTENTIAL RESOURCES</td><td>HYPOTHETICAL RESOURCES</td><td>SPECULATIVE RESOURCES</td></tr>
<tr><td colspan="4">Petroleum which are anticipated to be commercially recovered from known accumulations from a given date forward.</td><td rowspan="5">These are not commercially producible at present date
<i>(may be further subdivided)</i></td><td rowspan="5">Resources in mapped prospects that are not yed drilled.
<i>(may be published with uncertainty range)</i></td><td rowspan="5">Resources in prospects that have not yet been mapped.
<i>(may be published with uncertainty range)</i></td></tr>
<tr><td colspan="2">PROVED RESERVES</td><td colspan="2">UNPROVED RESERVES</td></tr>
<tr><td colspan="2">Petroleum that can be estimated with reasonable certainly to be commercially recovered.</td><td colspan="2">Unproved reserves are less certain to be recovered than proved reserves</td></tr>
<tr><td>DEVELOPED RESERVES</td><td>UNDEVELOPED RESERVES</td><td>PROBABLE RESERVES</td><td>POSSIBLE RESERVES</td></tr>
<tr><td>These are expected to be recovered from existing wells.</td><td>These are expected to be recovered from new wells.</td><td>These are more likely than not to be recovered</td><td>These are less likely than likely to be recovered</td></tr>
</table>

INCREASING CERTAINTY

উৎসঃ CCOP

চিত্র ১৩.২ : পেট্রোলিয়াম সম্পদের শ্রেণীবিন্যাসের নীতি ও বিবরণ

(১) যথাস্থানে প্রাথমিক গ্যাস মজুদ (Gas Reserves Initially in Place) ২৪.৭৪৫ টিসিএফ।

(২) প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদ (Initial Recoverable Reserves of Gas) ১৫.৫১ টিসিএফ (সারণী ১৩.১)।

(৩) ২০০০ সালের জুন পর্যন্ত পুঞ্জিভুত উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ (Cumulative Production of Gas) ৩.৯ টিসিএফ।

(৪) ২০০০ সালের জুলাই মাসে অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ (Net Recoverable Reserves of Gas) ১১.৬১ টিসিএফ (১৫.৫১-৩.৯০)।

(খ) শেলের গ্যাস সম্পদের হিসাব

১৯৯৯ সালের উপস্থাপনায় শেল কোম্পানি (Shell 1999) দেখিয়েছে যে, বাংলাদেশের মোট গ্যাস সম্পদের পরিমাণ ৩৮.০ টিসিএফ। এরমধ্যে আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদ ১৩.০ টিসিএফ এবং অতিরিক্ত গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা ২৫.০ টিসিএফ (সারণী ১৩.১)। শেলের উপস্থাপনায় কয়টি গ্যাস ক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট তা বলা হয়নি। এবং অতিরিক্ত ২৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস কিভাবে কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে এবং পাওয়ার সম্ভাবনা কতখানি (probability) তা বলা হয়নি।

(গ) ইউনোকলের গ্যাস সম্পদের হিসাব

ইউনোকলের ২০০০ সালের মার্চে এবং ২০০১ সালের এপ্রিল মাসের প্রকাশনায় (Unocal 2000, Brown, Shamsuddin and Rickard 2001) উপস্থাপন করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে মোট গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা ৩৪.২ টিসিএফ থেকে ৫১.৫ টিসিএফ (সারণী ১৩.১)। Deterministic (স্থিরকরণধর্মী) ও Probabilistic (সম্ভাবনাধর্মী) পদ্ধতিতে তিন ভাগে উপরে বর্ণিত গ্যাসের পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে।

(১) Deterministic পদ্ধতিতে নিরূপিত ২১টি আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের মোট গ্যাসের পরিমাণ (produced, porven, probable) দেখানো হয়েছে ১৬.১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

(২) Deterministic পদ্ধতিতে মোট আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের ফিল্ডগ্রোথের (technologically driven) মাধ্যমে পাওয়া সম্ভাবনাময়ী গ্যাসের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ১২.৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

(৩) Probabilistic (সম্ভাবনাধর্মী) পদ্ধতিতে অনাবিষ্কৃত এলাকায় পাওয়া সম্ভাবনাময়ী মোট গ্যাসের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৫.৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট থেকে ২২.৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

Probabilistic (সম্ভাবনাধর্মী) পদ্ধতিতে হিসাবকৃত গ্যাসের পরিমাপের তুলনায় Deterministic পদ্ধতিতে নিরূপিত গ্যাসের পরিমাপ অপেক্ষাকৃত বেশি নির্ভরযোগ্য।

সারণী ১৩.১ : বাংলাদেশে মোট গ্যাস সম্পদ/মজুদের বিবরণ

বিবরণ	পেট্রোবাংলা	শেল	ইউনোকল				ইউএসজিএস			
মোট উত্তোলনযোগ্য মজুদ (টিসিএফ)	১৫.৫১	১৩.০০	১৬.১	১৬.১	১৬.১	১৬.১				
অতিরিক্ত গ্যাস (টিসিএফ)		২৫.০০								
-ফিল্ড গ্রোথ (টিসিএফ)			১২.৮	১২.৮	১২.৮	১২.৮				
-অনাবিষ্কৃত সম্পদ (টিসিএফ)			৫.৩ (৯০%)	১০.৩ (৫০%)	১৩.২ (মীন)	২২.৬ (১০%)	৮.৪ (৯৫%)	২৯.২ (৫০%)	৩২.১ (মীন)	৬৫.৭ (৫%)
যোগফল (টিসিএফ)	১৫.৫১	৩৮.০০	৩৪.২	৩৯.২	৪২.১	৫১.৫	৮.৪	২৯.২	৩২.১	৬৫.৭

* মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস

পেট্রোবাংলার হিসাবে ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস ১৫.৫১ টিসিএফ দেখানো হয়েছে।
শেলের হিসাবে সম্ভবত ২০ টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস ১৩.৭৯ টিসিএফ এর জায়গায় ১৩ টিসিএফ ধরা হয়েছে।
ইউনোকলের হিসাবে ২১টি গ্যাস গ্যাস ক্ষেত্রের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস ১৬.১ টিসিএফ দেখানো হয়েছে।

সাধারণত প্রথমে Probabilistic (সম্ভাবনাধর্মী) পদ্ধতিতে গ্যাসের পরিমাণ হিসাব করার পর পরবর্তীতে কূপ খনন করে Deterministic পদ্ধতিতে গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ করা হয় এবং সে অনুসারে গ্যাস উত্তোলনের বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইউনোকালের Probabilistic হিসাব অনুসারে অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনার মাত্রাকে নিম্নলিখিত চারটি ধাপে ভাগ করে দেখানো হয়েছে (সারণী ১৩.১)।

- অধিক (৯০%) সম্ভাবনাময় ৫.৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট
- মধ্যম (৫০%) সম্ভাবনাময় ১০.৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট
- মীন (৫০% এর অধিক) সম্ভাবনাময় ১৩.২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট
- কম (৯০%) সম্ভাবনাময় ২২.৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট

এখানে লক্ষণীয় যে কম পরিমাণ গ্যাসের প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশি (৫.৩ টিসিএফ) এবং বেশি পরিমাণ গ্যাসের প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম (২২.৬ টিসিএফ)। ইউনোকলের প্রকাশনায় ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন ধাপের গ্যাসের পরিমাণকে যোগ করে নিম্নলিখিতভাবে মোট গ্যাস সম্পদের পরিমাণ দেখানো হয়েছে (সারণী ১৩.১)।

- অধিক (৯০%) সম্ভাবনাময় (১৬.১ টিসিএফ + ১২.৮ টিসিএফ + ৫.৩ টিসিএফ) = ৩৪.২ টিসিএফ
- মীন (৫০% এর অধিক) সম্ভাবনাময় (১৬.১ টিসিএফ + ১২.৮ টিসিএফ + ১৩.২ টিসিএফ) = ৪২.১ টিসিএফ
- কম (১০%) সম্ভাবনাময় (১৬.১ টিসিএফ + ১২.৮ টিসিএফ + ২২.৬ টিসিএফ) = ৫১.৫ টিসিএফ

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যেহেতু Deterministic (স্থিরকরণধর্মী) ও Probabilistic (সম্ভাবনাধর্মী) পদ্ধতিতে নিরূপিত এবং হিসাবকৃত গ্যাসের পরিমাপ একইভাবে নির্ভরযোগ্য নয় সে কারণে সারণী ১৩.১-এ উপস্থাপিত তিন ধরনের গ্যাসের পরিমাণের যোগফলকে গ্যাসের মোট মজুদ না বলে মোট গ্যাস সম্পদ বলা যুক্তিসঙ্গত। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পেট্রোবাংলার হিসাবে ২২টি আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের এবং ইউনোকালের হিসাবে ২১টি গ্যাস ক্ষেত্রে মোট উত্তোলনযোগ গ্যাসের পরিমাপ দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ১৫.৫১ টিসিএফ এবং ১৬.১ টিসিএফ। ইউনোকালের হিসাবে পেট্রোবাংলা ইতোপূর্বে প্রকাশিত ২০টি গ্যাস ক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য ১৩.৭৯ টিসিএফ গ্যাসের সাথে (সারণী ৫.১) নতুন গ্যাস ক্ষেত্র বিবিয়ানার উত্তোলনযোগ্য গ্যাস ২.৪০১ টিসিএফ গ্যাস যোগ করে ২১টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস ১৬.১ টিসিএফ (১৩.৭৯ + ২.৪০১) হিসাব করা হয়েছে। এ ছাড়া ইউনোকাল কর্তৃক মৌলভীবাজার গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদের পরিমাণ নির্ণয় করার কাজ শেষ না হওয়ায় উক্ত গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ হিসাবে ধরা হয়নি। অন্যদিকে পেট্রোবাংলার হিসাবে মৌলভীবাজার গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদের পরিমাণ ০.৪ টিসিএফ

এবং জালালাবাদ, ছাতক, কামতা ও ফেনী গ্যাস ক্ষেত্রের সংশোধিত উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ধরে মোট ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রে গ্যাসের পরিমাণ দেখান হয়েছে ১৫.৫১ টিসিএফ (সারণী ৫.১ এবং ৫.২)।

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিকাল সার্ভে ও পেট্রোবাংলার অনাবিষ্কৃত অঞ্চলের গ্যাস সম্পদের হিসাব (Petrobangla and USGS 2001)

যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিকাল সার্ভে এবং পেট্রোবাংলার যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদের পরিমাণ নিরূপণের জন্য ১৯৯৯-০১ সালে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় আগামী ৩০ বছরের (২০০০-২০৩০ সাল) মধ্যে কারিগরি দিক বিবেচনায় সম্ভাব্য অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে। উক্ত স্টাডিতে সর্বনিম্ন গ্যাস ক্ষেত্রের সাইজ ধরা হয়েছে ০.০৪২ টিসিএফ। গ্যাস সম্পদের পরিমাণ নিরূপণের সময় বাংলাদেশের এক্সপ্লোরেশন এলাকাকে ৬টি অ্যাসেসমেন্ট ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। উক্ত স্টাডির মতে বাংলাদেশের মোট ৬টি এলাকায় অতিরিক্ত গ্যাস-সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনার মাত্রাকে নিম্নলিখিত চারটি ধাপে ভাগ করে দেখান হয়েছে (সারণী ১৩.১)।

- অধিক (৯৫%) সম্ভাবনাময় ৮.৪ টিসিএফ
- মধ্যম (৫০%) সম্ভাবনাময় ২৯.২ টিসিএফ
- মীন (৫০% এর অধিক) সম্ভাবনাময় ৩২.১ টিসিএফ
- কম (৯০%) সম্ভাবনাময় ৬৫.৭ টিসিএফ

(ঙ) যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিকাল সার্ভে ও পেট্রোবাংলার উপাত্ত অনুসারে মোট গ্যাস সম্পদের হিসাব

ইউনোকালের প্রকাশনায় (Brown, Shamsuddin and Rickard 2001) ওপরে বর্ণিত ইউনোকালের পদ্ধতি অনুসারে নিম্নলিখিতভাবে বাংলাদেশের মোট গ্যাস সম্পদের হিসাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

- অধিক (৯৫%) সম্ভাবনাময় (১৬.১ টিসিএফ + ১২.৮ টিসিএফ + ৮.৪ টিসিএফ) = ৩৭.৩ টিসিএফ
- মধ্যম (৫০%) সম্ভাবনাময় (১৬.১ টিসিএফ + ১২.৮ টিসিএফ + ২৯.২ টিসিএফ) = ৫৮.১ টিসিএফ
- মীন (৫০% এর অধিক) সম্ভাবনাময় (১৬.১ টিসিএফ + ১২.৮ টিসিএফ + ৩২.১ টিসিএফ) = ৬১.০ টিসিএফ
- কম (৫%) সম্ভাবনাময় (১৬.১ টিসিএফ + ১২.৮ টিসিএফ + ৬৫.৭ টিসিএফ) = ৯৪.৬ টিসিএফ

(চ) বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশিত গ্যাস-মজুদ ও গ্যাস-সম্পদের বিবরণ

সারণী ১৩.১-এ উপস্থাপিত বিভিন্ন স্টাডির গ্যাস মজুদের হিসাব সমভিত্তিক (uniform basis) নয়। এগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণের সুবিধার্থে সমভিত্তিতে সারণী ১৩.২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। সকল স্টাডির মোট গ্যাস প্রাপ্তির হিসাবের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক নিরূপিত ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের ২০০০ সালের জুলাই মাসে নীট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস ১১.৬১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট ধরা হয়েছে। মোট গ্যাস প্রাপ্তির হিসাবের জন্য ইউনোক্যাল কর্তৃক নিরূপিত ফিল্ড গ্রোথের মাধ্যমে সম্ভাব্য গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ ১২.৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট ধরা হয়েছে। উপরোক্ত হিসাব অনুসারে সমভিত্তিতে বিভিন্ন সমীক্ষা কর্তৃক হিসাবকৃত বাংলাদেশের মোট সম্ভাব্য গ্যাস মজুদ/সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল (সারণী ১৩.২)।

- পেট্রোবাংলার হিসাব অনুসারে বাংলাদেশের ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের ২০০০ সালের জুলাই মাসে মোট নীট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদের পরিমাণ ১১.৬১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।
- শেলের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে সম্ভাব্য গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ ৩৬.৬১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।
- ইউনোকালের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে সম্ভাব্য গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ ২৯.৭১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট থেকে ৪৭.০১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত।
- যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে সম্ভাব্য গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ ৩২.৮১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট থেকে ৯০.১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত।

উপরে বর্ণিত গ্যাসের হিসাবের মধ্যে পেট্রোবাংলার নীট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদের পরিমাণ ১১.৬১ ট্রিলিয়ন ঘনফুটের হিসাব বেশি নির্ভরযোগ্য। এর ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে গ্যাস ব্যবহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কিন্তু অন্যান্য সম্ভাব্য গ্যাস-সম্পদের হিসাবের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে গ্যাস ব্যবহার সম্বন্ধে এখনই দৃঢ় সিদ্ধান্ত (firm decision) নেয়া যায় না। সম্ভাব্য হিসাবগুলোকে গ্যাস প্রাপ্তির প্রাথমিক ধারণা হিসাবে ধরে কূপ খনন করে যদি গ্যাস পাওয়া যায় তবে তার যথাযথ মূল্যায়নের (appraisal) পর মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ করে তার ভিত্তিতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। গ্যাস প্রাপ্তির জন্য অতিরিক্ত গ্যাস সম্পদের সম্ভাব্য হিসাবকে গ্যাস প্রাপ্তির নির্দেশনা মাত্রা (indicative limit) হিসাবে ধরা যায়।

গ্যাস রপ্তানির বিতর্কের সময় যারা রপ্তানির বিপক্ষে আলোচনা করেন তারা পেট্রোবাংলার নীট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১১.৬১ টিসিএফ এর হিসাব ধরে বলেন যে বাংলাদেশের গ্যাসের মজুদ খুবই সীমিত। যথাযথ হিসাব না করে রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। অন্যদিকে যারা গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে খুবই উৎসাহী এবং যথাযথ হিসাবের ধার ধারতে চান না তারা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে গ্যাস

সারণী ১৩.২ : সমভিত্তিতে বাংলাদেশের মোট গ্যাস সম্পদ/মজুদের বিবরণ

বিবরণ	পেট্রোবাংলা	শেল	ইউনোকল				ইউএসজিএস			
২২টি গ্যাস ক্ষেত্র অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ (জুলাই ২০০০)[১]	১১.৬১[১]	১১.৬১	১১.৬১	১১.৬১	১১.৬১	১১.৬১	১১.৬১	১১.৬১	১১.৬১	১১.৬১
অতিরিক্ত গ্যাস (টিসিএফ)		২৫.০০								
-ফিল্ড গ্রোথ[২] (টিসিএফ)			১২.৮০*	১২.৮০*	১২.৮০*	১২.৮০*	১২.৮০*	১২.৮০*	১২.৮০*	১২.৮০*
-অনাবিষ্কৃত সম্পদ (টিসিএফ)			৫.৩০ (৯০%)	১০.৩০ (৫০%)	১৩.২০ (মীন)	২২.৬০ (১০%)	৮.৪০ (৯৫%)	২৯.২০ (৫০%)	৩২.১০ (মীন)	৬৫.৭০ (৫%)
যোগফল (টিসিএফ)	১১.৬১	৩৬.৬১	২৯.৭১	৩৪.৭১	৩৭.৬১	৪৭.০১	৩২.৮১	৫৩.৬১	৫৬.৫১	৯০.১১

(১) সকল স্টাডির জন্য পেট্রোবাংলার হিসাব অনুসারে ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১১.৬১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট ধরা হয়েছে (ছক ৫.২ দ্রষ্টব্য)।

(২) ইউনোকল এর হিসাব অনুসারে ফিল্ড গ্রোথের মাধ্যমে বাংলাদেশে গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা ১২.৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

প্রাপ্তির সম্ভাবনা (৯০.৬১ টিসিএফ)-কে গ্যাসের মজুদ বলে চালাতে চেষ্টা করেন। তারা যে বিষয়টি উল্লেখ করেন না অথবা ইচ্ছা করে উল্লেখ করতে চান না তাহলো উচ্চ পরিমাণের গ্যাসের সম্ভাবনায় বাস্তবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ কম হয়। যারা মধ্যম পন্থী তারা গ্যাসের মধ্যম (৫৩.৬১ টিসিএফ) অথবা মীন (৫৬.৫১ টিসিএফ) সম্ভাবনার পরিমাণ উল্লেখ করে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে নিরপেক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশের আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত সকল গ্যাস ক্ষেত্রের মোট গ্যাসের হিসাব (গ্যাস রিজার্ভ, ফিল্ড গ্রোথ, সম্ভাব্য গ্যাস সম্পদ) নিরূপণ করা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক কোম্পানি ইউনোকল এবং যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে কর্তৃক বাংলাদেশের মোট গ্যাস সম্পদের পরিমাণ নিরূপণের পর বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে নিরপেক্ষ দেশের বিশেষজ্ঞ (যে দেশের আন্তর্জাতিক কোম্পানি বাংলাদেশে কর্মরত নেই) নিয়োগ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের মোট গ্যাসের পরিমাণ (গ্যাস রিজার্ভ, ফিল্ড গ্রোথ, নতুন গ্যাস ক্ষেত্র) নিরূপণ করা প্রয়োজন। নির্ভরযোগ্যভাবে নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাসের মজুদের পরিমাণ জানতে হলে কূপ খনন করে মূল্যায়ন করতে হবে।

১৩.৮ দীর্ঘ মেয়াদকালে গ্যাসের চাহিদা নিরূপণ

১৩.৮.১ আগামী ৫০ বছরে দেশের গ্যাস চাহিদা

বাংলাদেশের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠিত দেশবাসীর মুখোমুখি অনুষ্ঠানে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ৫০ বছরের গ্যাস সংরক্ষিত রেখে বিদেশে গ্যাস রপ্তানির কথা ভাবা যেতে পারে। শেখ হাসিনার ঘোষণায় ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্যাসের চাহিদা মিটাবার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস সংরক্ষিত রেখে যদি অতিরিক্ত গ্যাস থাকে তবে রপ্তানির কথা চিন্তা করা হবে। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সর্বপ্রথম যা জানা প্রয়োজন তা হল বাংলাদেশে কি পরিমাণ গ্যাস আছে তা নিরূপণ করা; দ্বিতীয় ধাপে বাংলাদেশের ২০৫০ সাল পর্যন্ত কি পরিমাণ গ্যাস লাগবে তার হিসাব করা; তৃতীয় ধাপে রপ্তানির জন্য কি পরিমাণ গ্যাস উদ্বৃত্ত থাকবে তা নিরূপণ করা। বাংলাদেশে কি পরিমাণে গ্যাস আছে সে বিষয়ে এর আগের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশের গ্যাসের চাহিদা সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

যারা গ্যাস রপ্তানির পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তারা শেখ হাসিনার ৫০ বছরের গ্যাস সংরক্ষণের ঘোষণায় খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হিসাব না করেই তারা বুঝতে পেরেছেন যে হয়তবা বাংলাদেশের ৫০ বছরের চাহিদা মিটাবার গ্যাস নাই। তাদের প্রতিক্রিয়া হয়েছে শেখ হাসিনা কেন ৫০ বছরের ঘোষণা দিলেন? কেন ১৫ বছরের ঘোষণা দিলেন না? তিনি কি এনার্জি বিশেষজ্ঞ? তিনি ভবিষ্যতে গ্যাসের চাহিদা সম্বন্ধে

কি বোঝেন? উপরোক্ত ঘোষণার পর বিভিন্ন ফোরামে এধরনের অনেক প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং আলোচিত হয়েছে। ধারণা করা হয়েছিল যে যারা বাংলাদেশের ২০০০ সালের গ্যাস রিজার্ভ (R=১১.৬১ টিসিএফ) কে তার আগের বছরের উৎপাদিত গ্যাস (P=০.৩৩১ টিসিএফ) দিয়ে ভাগ করে সচরাচর বলেন যে বাংলাদেশের ২০০০ সালের গ্যাস রিজার্ভে ৩৫ বছর চলবে তারা হয়ত পাটিগণিতের হিসাব করে বলবেন যে ৫০ বছরের ১৬.৫৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (৫০ বছর x ০.৩৩১ টিসিএফ) গ্যাস লাগবে। এ ধরনের কোন আলোচনার খবর সংবাদপত্রে এখনও দেখা যায়নি।

যারা এনার্জি ব্যবহারের ভবিষ্যত চাহিদা নিয়ে গবেষণা করেন তাদেরকে বলতে শোনা যায় যে এনার্জি ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়ামকগুলো এত পরিবর্তনশীল যে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের জন্য ২৫-৩০ বছরের সময়ের বেশি সময়ের জন্য আগাম এনার্জি পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে নির্ভুলভাবে আগামী ৫০ বছরের গ্যাসের চাহিদা নিরূপণ করা অসুবিধাজনক। তবে এখানে accuracy-টা এত জরুরি নয়। এক এক ধরনের assumption করে এক এক ধরনের চাহিদা নিরূপণ করে পরবর্তীতে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। 'সাস্‌টেইনবল ডেভেলপমেন্ট' উন্নয়ন দর্শনের আঙ্গিকে (WCED 1987, UNDP 1994) পরবর্তী প্রজন্মের এনার্জি চাহিদা মিটাবার জন্য ৫০ বছরে কি পরিমাণ গ্যাস লাগতে পারে সে বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে ২০০১-২০২০ সালের ২০ বছরের জন্য বাংলাদেশের মোট এনার্জির চাহিদা হিসাব করা হয়েছে লো-ইকনমিক সিনারিওর জন্য ২৪ টিসিএফ এবং রেফারেন্স-ইকনমিক সিনারিওর জন্য ৩১ টিসিএফ গ্যাসের সমান। মোট এনার্জির ৭০% প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে মিটানো হবে এ হিসাবে ২০ বছর সময়ে গ্যাসের চাহিদা হয় লো-ইকনমিক সিনারিওতে ১৬.৮ টিসিএফ এবং রেফারেন্স-ইকনমিক সিনারিওতে ২১.৭ টিসিএফ। ২০২১ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর সময়ে যদি এর আগের বিশ বছরের ন্যায় গ্যাসের চাহিদা সমহারে বৃদ্ধি পায় তবে ২০০১-২০৫০ সাল পর্যন্ত ৫০ বছর সময়ে মোট গ্যাসের চাহিদা লো-ইকনমিক সিনারিওতে ৪২ টিসিএফ এবং এবং রেফারেন্স-ইকনমিক সিনারিওতে ৫৪.৩ টিসিএফ হয় (Islam 2000)।

দেশের বিভিন্ন গ্যাস ব্যবহারকারী সেক্টরের ২০০১ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত সময়ে গ্যাসের চাহিদা সারণী ১৩.৩-এ দেখান হয়েছে (Petrobangla 2001)। আগামী ৫০ বছরে গ্যাসের মোট চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে ৬২.৯৯ টিসিএফ। এর মধ্যে ৩৯.৭৯ টিসিএফ (৬৩.২%) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য, ৪.৭৫ টিসিএফ (৭.৫%) সার উৎপাদনের জন্য, ১৩.৫২ টিসিএফ (২১.৫%) শিল্পকারখানার জ্বালানি এবং ৪.৯৩ টিসিএফ (৭.৮%) গৃহস্থালি এবং বাণিজ্যিক জ্বালানির জন্য প্রয়োজন হবে। আগামী ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০ বছরে গ্যাসের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৪.৮৪ টিসিএফ, ১৩.৭১ টিসিএফ, ২৬.৭৬ টিসিএফ, ৪৩.৬৮ টিসিএফ এবং ৬২.৯৯ টিসিএফ।

সারণী ১৩.৩ : বাংলাদেশে গ্যাসের ভবিষ্যৎ (২০০১-২০৫০) চাহিদা

ট্রিলিয়ন ঘনফুট

গ্যাস ব্যবহারের খাত	১০ বছর	২০ বছর	৩০ বছর	৪০ বছর	৫০ বছর
বিদ্যুৎ	২.৫১১	৭.৭৭৫	১৬.০৩৪	২৭.০৬৮	৩৯.৭৯
সার	০.৯৭৩	২.০৯৬	২.৯৭৭	৩.৮৬৪	৪.৭৫
শিল্প	০.৮২২	২.৫০৬	৫.৩৬৭	৯.১৫৫	১৩.৫২
গৃহস্থালী/বাণিজ্য	০.৫৩৭	১.৩৩১	২.৩৮২	৩.৫৯৪	৪.৯৩
মোট	৪.৮৪৩	১৩.৭০৮	২৬.৭৬৪	৪৩.৬৮১	৬২.৯৯

সূত্র : Petrobangla (2001)

যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি ইনফরমেশন এডমিনিস্ট্রেশনের বিশেষজ্ঞ Rodekohr (2001) ২০০১ সালের জুন মাসে পেট্রোবাংলায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে economic growth, energy intensity of GDP এবং natural gas share সম্বন্ধে বিভিন্ন assumption করে বাংলাদেশের আগামী ৩০ বছরে গ্যাসের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ চাহিদা হিসাব করে দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ২৫.৫৬ টিসিএফ এবং ৪১.৮৫ টিসিএফ। ৫০ বছরে গ্যাসের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ চাহিদা হিসাব করে দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ৬১.৮৭ টিসিএফ এবং ১৮৩.৬৩ টিসিএফ।

১৩.৮.২ দীর্ঘ মেয়াদকালে গ্যাসের সরবরাহ ও চাহিদা (supply-demand) পর্যালোচনা

সারণী ১৩.২-এ উপস্থাপিত ইউএসজিএস/পেট্রোবাংলার সমীক্ষার সবচেয়ে আশাপ্রদ হিসাব (৯৫% সম্ভাবনা) অনুসারে বাংলাদেশে সম্ভাব্য মোট গ্যাস সম্পদ প্রাপ্তির পরিমাণ ৩২.৮১ টিসিএফ, পেট্রোবাংলা কর্তৃক হিসাবকৃত ৩০ বছরের গ্যাসের চাহিদা (২৬.৭৬ টিসিএফ) এবং Rodekohr (2001) কর্তৃক হিসাবকৃত ৩০ বছরের চাহিদা (২৫.৫৬-৪১.৮৫ টিসিএফ) মিটাবার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। উপরোক্ত সমীক্ষার মীন হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে সম্ভাব্য মোট গ্যাস সম্পদ প্রাপ্তির পরিমাণ ৫৬.৫১ টিসিএফ, পেট্রোবাংলা কর্তৃক হিসাবকৃত ৫০ বছরের গ্যাসের চাহিদা (৬২.৯৯ টিসিএফ) এবং Rodekohr (2001) কর্তৃক ৫০ বছরের গ্যাসের চাহিদা (৬১.৮৭-১৮৩.৬৩ টিসিএফ) মিটাবার জন্য যথেষ্ট নয়।

১৩.৮.৩ মন্তব্য

দীর্ঘ মেয়াদকালে গ্যাসের সরবরাহ এবং চাহিদার উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সরাসরিভাবে দৃঢ় কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না সে কারণে বিষয়টি নিয়ে দেশের বিভিন্ন ফোরামে বিতর্ক চলছে। যারা গ্যাস রপ্তানির পক্ষে তারা ধারণা দিতে চান যে, সম্ভাব্য গ্যাস সম্পদ প্রাপ্তির হিসাব মোটামুটি ঠিক, অতীতের গ্যাস ব্যবহারের অভিজ্ঞতার আলোকে দীর্ঘ মেয়াদকালে গ্যাসের চাহিদা বেশি হবে না, অতএব উদ্বৃত্ত গ্যাস রপ্তানির বিষয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। যারা গ্যাস রপ্তানির বিপক্ষে তাদের যুক্তি হল কূপ খনন করে যথাযথভাবে গ্যাসের উত্তোলনযোগ্য মজুদ নিরূপণ না করা পর্যন্ত গ্যাস সম্পদের সম্ভাব্য হিসাবের ভিত্তিতে গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে যথেষ্ট মার্জিন রেখে দেশের ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা নিরূপণ করা নিরাপদ। উপরোক্ত হিসাব অনুসারে যেহেতু গ্যাস উদ্বৃত্ত থাকছে না সে কারণে ভবিষ্যতে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে এখনই গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। গ্যাস রপ্তানির পক্ষের প্রবক্তারা আরও মনে করেন যে অর্থ থাকলে ভবিষ্যতে আমদানি করে জ্বালানির চাহিদা মিটাতে অসুবিধা হবে না। অন্যদিকে বিপক্ষের প্রবক্তাদের যুক্তি হচ্ছে যে গ্যাস/এনার্জি একটি সাধারণ পণ্য নয়। এটি একটি বিশেষ কৌশলগত পণ্য।

সে কারণে দেশের নিজস্ব উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্যাস মজুদ সংরক্ষিত রাখা নিরাপদ।

দেশের ভবিষ্যত উন্নয়নের স্বার্থে গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্তের বিষয়টি জটিল এবং স্পর্শকাতর। উভয় পক্ষের বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ধারণার (assumptions) ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনেক চাহিদা এবং অনেক সরবরাহের হিসাব তুলে ধরতে পারবেন। এ কারণে বিষয়টি নিয়ে দেশের বিভিন্ন ফোরামে মুক্ত আলোচনা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। যেহেতু জাতীয় সংসদ দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান সে কারণে বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দীর্ঘ মেয়াদকালে (২০ বছর/ ৩০ বছর/ ৪০ বছর/ ৫০ বছর) দেশের উন্নয়নের সূচক্ (মাথাপিছু জিএনপি/হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স) কোন পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করা হবে এবং সে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কি পরিমাণ গ্যাস সংরক্ষিত রাখা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আরও যে সকল বিষয় জাতীয় সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত, তা হল অতীতে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন প্রডাকশন শেয়ারিং চুক্তি স্বাক্ষরের যুক্তিযুক্ততা এবং স্বাক্ষর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা পর্যালোচনা করা এবং স্বচ্ছতার সাথে ভবিষ্যতে পিএসসি স্বাক্ষরের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা। দীর্ঘ মেয়াদী এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য রাজনৈতিক সমঝোতা একান্ত কাম্য।

১৩.৯ গ্যাস রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রার আয়

দেশী বিদেশী যারা সচরাচর বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি করার জন্য উপদেশ দেন তারা খুব সহজভাবে বলে থাকেন যে বাংলাদেশ গ্যাস রপ্তানি করলে বছরে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বৈদেশক মুদ্রা আয় করতে পারবে এবং গ্যাস রপ্তানির আয় দিয়ে ২০২০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হতে পারবে। তারা যে কথাটা স্পষ্ট করে বলেন না তা হল গ্যাস রপ্তানির মোট আয় থেকে বাংলাদেশ বছরে নীট কি পরিমাণ অর্থ পাবে? এবং সে আয় দিয়ে বাংলাদেশ কিভাবে তার ১৯৯৮ সালের মাথাপিছু গড় আয় ৩৫০ ডলার থেকে বাড়িয়ে মধ্য আয়ের দেশের গড় মাথাপিছু আয়ে (মধ্যম আয়ের দেশের মাথাপিছু আয় ৭৬১ ডলার থেকে ৯,৩৬০ ডলার) উন্নীত করবে। উদাহরণসহ বিষয়টি আলোচনা করা হল। বুঝার সুবিধার জন্য প্রতি ১,০০০ ঘনফুট গ্যাসের মূল্য ৩.০ ডলার ধরে প্রতিদিন ২৫০ মিলিয়ন ঘনফুট থেকে ২০০০ মিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত গ্যাস রপ্তানি করা হলে বছরে কি পরিমাণ গ্যাস প্রয়োজন হবে, গ্যাস বিক্রি করে gross কত মিলিয়ন ডলার আয় হবে, প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট-এর শর্ত অনুসারে বাংলাদেশ সরকার নীট কি পরিমাণ আয় করতে পারবে এবং গ্যাস রপ্তানি করে গড় মাথাপিছু আয় কতটুকু বৃদ্ধি পাবে (১৩০ মিলিয়ন জনসংখ্যা ধরে) এবং পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস রপ্তানি করা হলে পাইপলাইন কোম্পানির কত আয় হবে এ হিসাব সারণী ১৩.৪-এ দেখানো হয়েছে। প্রতিদিন ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস রপ্তানি করে বছরে gross আয় হবে ১,০৯৫ মিলিয়ন ডলার। প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের কস্ট রিকভারি

সারণী ১৩.৪ : প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করে বাৎসরিক সম্ভাব্য আয়ের বিবরণ

মিলিয়ন ঘনফুট /দিন	টিসিএফ/ বছর	টিসিএফ (২০ বছর)	গ্যাস রপ্তানি করে মোট আয় (মিলিয়ন ডলার)	মোট আয় থেকে সরকারের অংশ %				গ্যাস রপ্তানি করে মাথাপিছু আয় (ডলার) (মোট জনসংখ্যা ১৩০ মিলিয়ন)				পরিবহন আয় (মিলিয়ন ডলার)
				৩০% (মিলিয়ন ডলার)	৪০% (মিলিয়ন ডলার)	৫০% (মিলিয়ন ডলার)	৬০% (মিলিয়ন ডলার)	৩০% (ডলার)	৪০% (ডলার)	৫০% (ডলার)	৬০% (ডলার)	
২৫০	০.০৯১২৫	১.৮২৫	২৭৩.৭৫	৮২.১২৫	১০৯.৫	১৩৬.৮৭৫	১৬৪.২৫	০.৬৩	০.৮৪	১.০৫	১.২৬	৯১.২৫
৫০০	০.১৮২৫	৩.৬৫	৫৪৭.৫	১৬৪.২৫	২১৯	২৭৩.৭৫	৩২৮.৫	১.২৬	১.৬৮	২.১১	২.৫৩	১৮২.৫০
৭৫০	০.২৭৩৭৫	৫.৪৭৫	৮২১.২৫	২৪৬.৩৭৫	৩২৮.৫	৪১০.৬২৫	৪৯২.৭৫	১.৯০	২.৫৩	৩.১৬	৩.৭৯	২৭৩.৭৫
১০০০	০.৩৬৫	৭.৩	১০৯৫	৩২৮.৫	৪৩৮	৫৪৭.৫	৬৫৭	২.৫৩	৩.৩৭	৪.২১	৫.০৫	৩৬৫.০০
১২৫০	০.৪৫৬২৫	৯.১২৫	১৩৬৮.৭৫	৪১০.৬২৫	৫৪৭.৫	৬৮৪.৩৭৫	৮২১.২৫	৩.১৬	৪.২১	৫.২৬	৬.৩২	৪৫৬.২৫
১৫০০	০.৫৪৭৫	১০.৯৫	১৬৪২.৫	৪৯২.৭৫	৬৫৭	৮২১.২৫	৯৮৫.৫	৩.৭৯	৫.০৫	৬.৩২	৭.৫৮	৫৪৭.৫০
২০০০	০.৭৩	১৪.৬	২১৯০	৬৫৭	৮৭৬	১০৯৫	১৩১৪	৫.০৫	৬.৭৪	৮.৪২	১০.১১	৭৩০.০০

পিরিয়ডে সরকার যদি gross আয়ের ৩০% পায় তবে বাৎসরিক নীট আয় হবে ৩২৮.৫ মিলিয়ন ডলার। আর যদি ৪০% হয় তবে নীট আয় হবে ৪৩৮.০ মিলিয়ন ডলার। নীট আয়ের ফলে গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে ৩০% এর জন্য ২.৫৩ ডলার এবং ৪০% এর জন্য ৩.৩৭ ডলার। প্রতি এমএমসিএফ গ্যাসের পরিবহন খরচ ১.০ ডলার ধরা হলে পাইপলাইন কোম্পানি বছরে পাবে ৩৬৫ মিলিয়ন ডলার। সরকার পাইপলাইন কোম্পানি সাথে অংশীদারিত্বের চুক্তি করতে পারলে সে অনুসারে হিস্যা পাবে।

২০ বছরে মোট ৭.৩০ টিসিএফ গ্যাস রপ্তানি করে মোট গ্রস আয় হবে ২১,৯০০ মিলিয়ন ডলার (সারণী ১৩.৫)। সরকার ৩০% অথবা ৪০% এর অংশ হিসাবে নীট পাবে যথাক্রমে ৬,৫৭০ মিলিয়ন ডলার এবং ৮,৭৬০ ডলার। সরকার একটি গ্যাস ক্ষেত্রের জীবনকালে মোট লাভের ৫০% পেলে নীট পাওনা হবে ১০,৯৫০ মিলিয়ন ডলার। বিভিন্ন হিস্যার জন্য গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হতে পারে ৩০% এ ৫০.৫৩ ডলার, ৪০% এ ৬৭.৩৯ ডলার এবং ৫০% এ ৮৪.২৩ ডলার। প্রতি এমএমসিএফ গ্যাসের পরিবহন খরচ ১.০ ডলার হিসাবে পাইপলাইন থেকে ৩০ বছরে মোট আয় হতে পারে ৭,৩০০ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ যদি এক বছরে ১১ টিসিএফ গ্যাস রপ্তানি করে পুরো আয় নিজে রাখতে পারত তবে মোট আয় হত ৩৩,০০০ মিলিয়ন ডলার এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হত ২৫৩.৮৫ ডলার। এর ফলে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিএনপি বৃদ্ধি হয়ে ৬০৩.৮৫ ডলার (৩৫০+২৫৩.৮৫)। অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্তমানে অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য সবটুকু গ্যাস এক বছরে রপ্তানি করে শুধু এক বছরের জন্যও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের সমান আয়ের দেশ (মাথাপিছু আয় ৭৬১ ডলার থেকে ৩০৩০ ডলার) হতে পারবে না।

১৩.১০ গ্যাস রপ্তানির আয় ও মধ্যম-আয়ের দেশ বাংলাদেশ

বিভিন্ন বছরে বিশ্ব ব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া এবং থাইল্যান্ডের মাথাপিছু জিএনপি (US dollar) এর তথ্য সারণী ১৩.৬-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বছরের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টের তথ্য অনুসারে বিভিন্ন বছরে মাথাপিছু জিএনপি (US dollar)-এর হিসাব অনুসারে নিম্ন আয়, নিম্ন-মধ্যম আয়, উচ্চ-মধ্যম আয় এবং উচ্চ আয়ভুক্ত দেশের শ্রেণী বিন্যাসের পরিসংখ্যান সারণী ১৩.৭-এ দেখানো হয়েছে। ১৯৯৮ সালে নিম্ন আয়, নিম্ন-মধ্যম আয়, উচ্চ-মধ্যম আয় এবং উচ্চ আয় দেশের মাথাপিছু জিএনপি (ইউএস ডলার)-এর মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৭৬০ ডলার পর্যন্ত, ৭৬১ থেকে ৩,০৩০ ডলার, ৩,০৩১ থেকে ৯,৩৬০ ডলার এবং ৯,৩৬১ ডলারের উর্ধ্বে। সারণী ১৩.৬-এ উপস্থাপিত উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ১৯৯৮ সালের মাথাপিছু গড় জিএনপি এর হিসাব অনুসারে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল,

সারণী ১৩.৫ : প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করে বিশ বছরের সাম্ভব্য মোট আয়ের বিবরণ

মিলিয়ন ঘনফুট/ দিন	টিসিএফ/ বছর	টিসিএফ (২০ বছর)	গ্যাস রপ্তানি করে মোট আয় (মিলিয়ন ডলার)	মোট আয় থেকে সরকারের অংশ %				গ্যাস রপ্তানি করে মাথাপিছু আয় (ডলার) (মোট জনসংখ্যা ১৩০ মিলিয়ন)				পরিবহন আয় (মিলিয়ন ডলার)
				৩০% (মিলিয়ন ডলার)	৪০% (মিলিয়ন ডলার)	৫০% (মিলিয়ন ডলার)	৬০% (মিলিয়ন ডলার)	৩০% (ডলার)	৪০% (ডলার)	৫০% (ডলার)	৬০% (ডলার)	
২৫০	০.০৯১২৫	১.৮২৫	৫৪৭৫	১৬৪২.৫	২১৯০	২৭৩৭.৫	৩২৮৫	১২.৬৩৪৬	১৬.৮৪৬২	২১.০৫৭৭	২৫.২৬৯২	১৮২৫.০০
৫০০	০.১৮২৫	৩.৬৫	১০৯৫০	৩২৮৫	৪৩৮০	৫৪৭৫	৬৫৭০	২৫.২৬৯২	৩৩.৬৯২৩	৪২.১১৫৪	৫০.৫৩৮৫	৩৬৫০.০০
৭৫০	০.২৭৩৭৫	৫.৪৭৫	১৬৪২৫	৪৯২৭.৫	৬৫৭০	৮২১২.৫	৯৮৫৫	৩৭.৯০৩৮	৫০.৫৩৮৫	৬৩.১৭৩১	৭৫.৮০৭৭	৫৪৭৫.০০
১০০০	০.৩৬৫	৭.৩	২১৯০০	৬৫৭০	৮৭৬০	১০৯৫০	১৩১৪০	৫০.৫৩৮৫	৬৭.৩৮৪৬	৮৪.২৩০৮	১০১.০৭৭	৭৩০০.০০
১২৫০	০.৪৫৬২৫	৯.১২৫	২৭৩৭৫	৮২১২.৫	১০৯৫০	১৩৬৮৭.৫	১৬৪২৫	৬৩.১৭৩১	৮৪.২৩০৮	১০৫.২৮৮	১২৬.৩৪৬	৯১২৫.০০
১৫০০	০.৫৪৭৫	১০.৯৫	৩২৮৫০	৯৮৫৫	১৩১৪০	১৬৪২৫	১৯৭১০	৭৫.৮০৭৭	১০১.০৭৭	১২৬.৩৪৬	১৫১.৬১৫	১০৯৫০.০০
২০০০	০.৭৩	১৪.৬	৪৩৮০০	১৩১৪০	১৭৫২০	২১৯০০	২৬২৮০	১০১.০৭৭	১৩৪.৭৬৯	১৬৮.৪৬২	২০২.১৫	১৪৬০০.০০

গ্যাসের মূল্য : প্রতি এমসিএফ ৩.০ ডলার
পাইপের মাধ্যমে গ্যাসের পরিবহন খরচ : প্রতি এমসিএফ ১.০০ ডলার
গ্যাসের রপ্তানি মূল্য : (গ্যাসের মূল্য+পরিবহন মূল্য) = (৩.০ ডলার+১.০০ ডলার) = ৪.০ ডলার

সারণী ১৩.৬ : কয়েকটি দেশের মাথাপিছু জিএনপি (ইউএস ডলার)-এর বিবরণ

বৎসর	বাংলাদেশ	ভারত	নেপাল	পাকিস্তান	শ্রীলংকা	ইন্দোনেশিয়া	নাইজেরিয়া	থাইল্যান্ড	উৎস
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
১৯৭৭	৯০	১৫০	১১০	১৯০	২০০	৩০০	৪২০	৪২০	WB 1979
১৯৮১	১৪০	২৬০	১৫০	৩৫০	৩৬০	৫৩০	৮৭০	৭৭০	WB 1983
১৯৮৩	১৩০	২৬০	১৬০	৩৯০	৩৩০	৫৬০	৭৭০	৮২০	WB 1985
১৯৮৪	১৩০	২৬০	১৬০	৩৮০	৩৬০	৫৪০	৭৩০	৮৬০	WB 1986
১৯৮৫	১৫০	২৮০	১৬০	৩৮০	৩৮০	৫৩০	৮০০	৮০০	WB 1987
১৯৮৬	১৬০	২৯০	১৫০	৩৫০	৪০০	৪৯০	৬৪০	৮১০	WB 1988
১৯৮৭	১৬০	৩০০	১৬০	৩৫০	৪০০	৪৫০	৩৭০	৮৫০	WB 1989
১৯৮৮	১৭০	৩৪০	১৮০	৩৫০	৪২০	৪৪০	২৯০	১০০০	WB 1990
১৯৮৯	১৮০	৩৪০	১৮০	৩৭০	৪৩০	৫০০	২৫০	১২২০	WB 1991
১৯৯০	২১০	৩৫০	১৭০	৩৮০	৪৭০	৫৭০	২৯০	১৪২০	WB 1992
১৯৯১	২২০	৩৩০	১৮০	৪০০	৫০০	৬১০	৩৪০	১৫৭০	WB 1993
১৯৯২	২২০	৩১০	১৭০	৪২০	৫৪০	৬৭০	৩২০	১৮৪০	WB 1994
১৯৯৩	২২০	৩০০	১৯০	৪৩০	৬০০	৭৪০	৩০০	২১১০	WB 1995
১৯৯৪	২২০	৩২০	২০০	৪৩০	৬৪০	৮৮০	২৮০	২৪১০	WB 1996
১৯৯৫	২৪০	৩৪০	২০০	৪৬০	৭০০	৯৮০	২৬০	২৭৪০	WB 1997
১৯৯৭	২৭০	৩৯০	২১০	৪৯০	৮০০	১১১০	২৬০	২৮০০	WB 1999
১৯৯৮	৩৫০	৪৩০	২১০	৪৮০	৮১০	৬৮০	৩০০	২২০০	WB 2000
১৯৯৯	৩৭০	৪৫০	২২০	৪৭০	৮২০	৫৮০	৩১০	১৯৬০	WB 2001

উৎস : বিভিন্ন বছরে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, বিশ্ব ব্যাংক।

সারণী ১৩.৭ : মাথাপিছু জিএনপি (ইউএস ডলার) ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান

বৎসর	নিম্ন আয়	নিম্ন-মধ্যম আয়	উচ্চ-মধ্যম আয়	উচ্চ আয়	উৎস
১৯৯০	৩৬০ অথবা কম	৬১০-২৪৬৫	২৪৬৬-৭৬১৯	৭৬২০ অথবা বেশি	WB 1992
১৯৯১	৬৩৫ অথবা কম	৬৩৬-২৫৫৫	২৫৫৬-৭৯১০	৭৯১১ অথবা বেশি	WB 1993
১৯৯২	৬৭৫ অথবা কম	৬৭৬-২৬৯৫	২৬৯৬-৮৩৫৫	৮৩৫৬ অথবা বেশি	WB 1994
১৯৯৩	৬৯৫ অথবা কম	৬৯৬-২৭৮৫	২৭৮৬-৮৬২৫	৮৬২৬ অথবা বেশি	WB 1995
১৯৯৪	৭২৫ অথবা কম	৭২৬-২৮৯৫	২৮৯৬-৮৯৫৫	৮৯৫৬ অথবা বেশি	WB 1996
১৯৯৫	৭৬৫ অথবা কম	৭৬৬-৩০৩৫	৩০৩৬-৯৩৮৫	৯৩৮৬ অথবা বেশি	WB 1997
১৯৯৭	৭৮৫ অথবা কম	৭৮৬-৩১২৫	৩১২৬-৯৬৫৫	৯৬৫৬ অথবা বেশি	WB 1999
১৯৯৮	৭৬০ অথবা কম	৭৬১-৩০৩০	৩০৩১-৯৩৬০	৯৩৬১ অথবা বেশি	WB 2000

উৎস : বিভিন্ন বছরে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, বিশ্ব ব্যাংক।

পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নাইজেরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ছিল নিম্ন আয় শ্রেণীভুক্ত দেশ এবং শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড ছিল নিম্ন-মধ্যম আয় শ্রেণীর দেশ।

সারণী ১৩.৬, চিত্র ১৩.৩ এবং সারণী ১৩.৭-এ উপস্থাপিত উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করলে ঐতিহাসিকভাবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর উন্নয়নের গতিধারা সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য করা যায়। ১৯৮১ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সময় কালে জিএনপি-এর পরিমাপে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল একটি নিম্ন আয়ের দেশ তবে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিএনপি ১৯৭৭ সালে ৯০ ডলার থেকে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৩৫০ ডলারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কখনও কমেনি। অন্যদিকে নাইজেরিয়া ওপেক দেশ হিসাবে একই সময়কালে ক্রমাগতভাবে তেল রপ্তানি করতে থাকলেও মাথাপিছু জিএনপি ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সময়কালে হঠাৎ করে ৪২০ ডলার থেকে ৮৭০ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তারপর ১৯৮১ সালের ৮৭০ ডলার থেকে মাথাপিছু জিএনপি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৩০০ ডলারে পৌঁছেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হল যে, ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিএনপি ৩৫০ ডলার, নাইজেরিয়ার মাথাপিছু জিএনপি ৩০০ ডলারের চেয়ে কম। ইন্দোনেশিয়া (১৯৬২ সালে ওপেক এর সদস্য পদ লাভ করে) ১৯৯৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ ছিল। ইন্দোনেশিয়ার ১৯৯৭ সালে গড় মাথাপিছু আয় ছিল ১,১১০ ডলার। কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নগামী হওয়ায় (গড় মাথাপিছু আয় ৬৮০ ডলার) আবার নিম্ন-আয়ের দেশের দলে নেমে গেছে। পেট্রোলিয়াম রপ্তানি করে ইন্দোনেশিয়া মাত্র কয়েক বছর নিম্ন-মধ্যম আয়ের দলে অবস্থান করতে পেরেছিল। সার্কভুক্ত দেশ শ্রীলংকা সব সময় পেট্রোলিয়াম আমদানির ওপর নির্ভরশীল একটি দেশ এবং গত ১৫-২০ বছর ধরে তামিলদের সাথে যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ১৯৭৭ সালের মাথাপিছু জিএনপি ২০০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৮১০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুসারে শ্রীলংকা ১৯৯৭ এবং ১৯৯৮ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের একটি দেশ ছিল। থাইল্যান্ড একটি পেট্রোলিয়াম আমদানিকারক দেশ হওয়া সত্ত্বেও অনেক বছর ধরে নিম্ন-মধ্যম আয়ের একটি দেশ হিসাবে অবস্থান করছে।

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে বলা যায় যে একটি নিম্ন আয়ের দেশের পক্ষে কেবল মাত্র নন-রিনিউবেল জ্বালানি (তেল ও গ্যাস) রপ্তানি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। আসলে যারা উপদেশ দিচ্ছেন যে বাংলাদেশ গ্যাস রপ্তানি করে ২০২০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হতে পারবে তা কাল্পনিক ও প্রলোভন ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের কাছে নিবেদন রইলো তাঁরা যত্নের সাথে সারণী ১৩.৬, চিত্র ১৩.৩ এবং সারণী ১৩.৭-এ উপস্থাপিত উপাত্তগুলো নিজস্ব প্রজ্ঞার আলোকে বিশ্লেষণ করবেন। নাইজেরিয়ার পেট্রোলিয়াম রপ্তানি করে গরিব হওয়ার ঘটনা পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশের কাছে নাইজেরিয়করণ নামে পরিচিত।

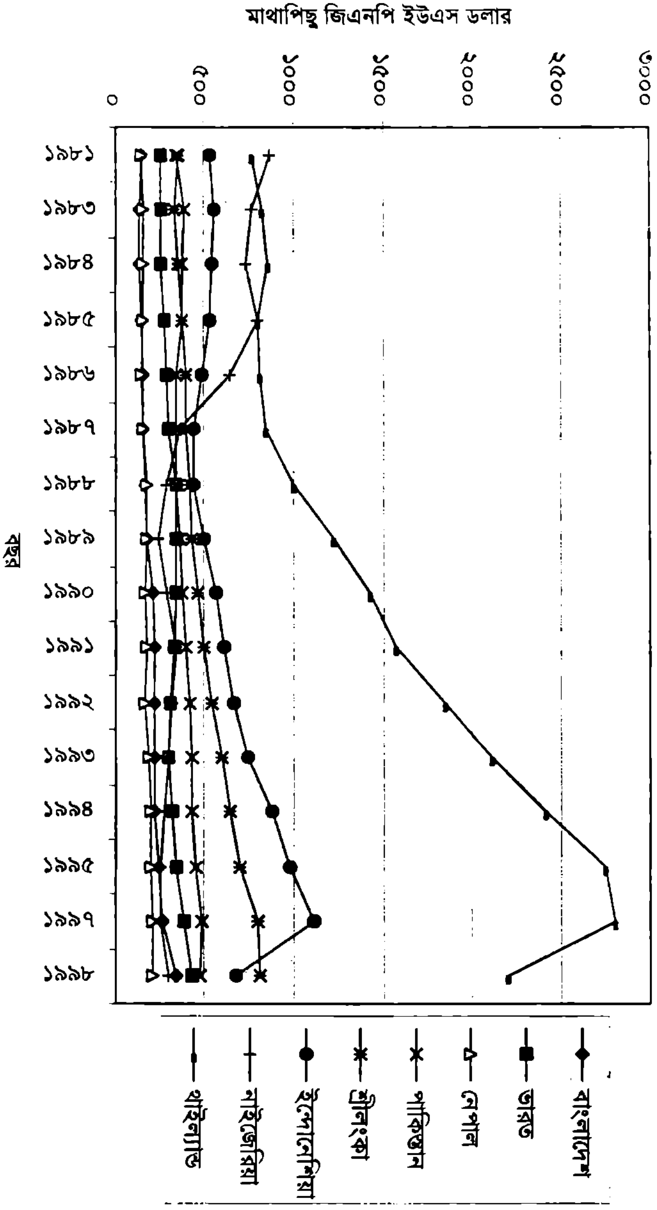

চিত্র ১৩.৩ : কয়েকটি দেশের মাথাপিছু জিএনপি (ইউএস ডলার)-এর বিবরণ

১৩.১১ গ্যাস ব্যবহার ও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি

বাংলাদেশের পক্ষে গ্যাস বিক্রি করে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করার চেয়ে গ্যাস ব্যবহার করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার সম্ভাবনা বেশি। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুসারে ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে এনার্জি ব্যবহারের সূচক Energy Intensity of GDP ছিল যথাক্রমে : ৩.০ ডলার/কেজিওই এবং ১.৭ ডলার/কেজিওই (WB 1999, WB 2000)। তাপানুপাতিক হিসাবে ১০০০ ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ২৩.২ কেজিওই এর সমান। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যথাযথভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে তাপানুপাতিক হিসাবে প্রতি ১০০০ ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা হচ্ছে ৩৯.৪৪ ডলার (২৩.২ কেজিওই/এমসিএফx১.৭০ ডলার/কেজিওই)। প্রতি ১০০০ ঘনফুট গ্যাস রপ্তানি করে ৩.০ ডলার পাওয়া গেলে গ্যাস ব্যবহার করে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা গ্যাস রপ্তানির সম্ভাবনার চেয়ে ১৩ গুণ (৩৯.৪৪÷৩.০) বেশি। বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অতিরিক্ত ১.৪০ টিসিএফ গ্যাস ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা হচ্ছে ৪২৫ ডলার (১.৪০x$১০^{৯}$x৩৯.৪৪÷১৩০x$১০^{৬}$)। সে অবস্থায় মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫০ ডলার থেকে ৭৭৫ ডলার (৩৫০+৪২৫ ডলার) করা সম্ভব হতে পারে। সারণী ১৩.৬-এ উপস্থাপিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের গতিধারা বিশ্লেষণ করত দেখা যায় যে, যেসকল দেশ তেল/গ্যাস রপ্তানি করেছে (ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া) তাদের তুলনায় যেসকল দেশ এনার্জি আমদানি করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড) তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতিধারা বেশি সন্তোষজনক ছিল। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এনার্জি রপ্তানি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার চেয়ে এনার্জি ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা সহজতর এবং বেশি সম্ভাবনাময়।

১৩.১২ জ্বালানি নিরাপত্তায় গ্যাসের গুরুত্ব

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার সাধারণত ৫ বছর মেয়াদকালের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। যে কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যে সকল বিবেচ্য বিষয় ৫ বছরের মধ্যে ফলাফল দিতে সক্ষম সে বিষয়গুলি বেশি প্রাধান্য পায় এবং দীর্ঘ মেয়াদকালে ফলাফল দিতে সক্ষম বিষয়গুলি কম গুরুত্ব পায় অথবা পায় না। উদাহরণস্বরূপ উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নিরাপত্তা, জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করলে তা স্বল্প মেয়াদকালে ফলাফল দিতে সক্ষম বিধায় সরকার এসকল বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সচেষ্ট। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে নিজস্ব প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণের বিষয় যত্নবান নন। সে কারণে স্বল্প মেয়াদকালীন সময়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থ যোগান দেয়ার জন্য সরকার গ্যাস রপ্তানির বিষয় চিন্তাভাবনা করছেন।

এধরনের সিদ্ধান্ত যে দীর্ঘমেয়াদকালে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে সে বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত। কেননা ভবিষ্যতে এনার্জির চাহিদা মিটাবার জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোন নির্ভরযোগ্য জ্বালানিসম্পদ নেই। এবং ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প অন্য কোন জ্বালানি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কাছে বন্দী। তেল-গ্যাস রপ্তানি করে অতি সহজে পাওয়া অর্থ কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতির মাত্রা বাড়িয়েছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপমৃত্যু ঘটিয়ে সামরিক-স্বৈর শাসন প্রতিষ্ঠার পথ করে দিয়েছে। বাস্তবে দেশের সাধারণ মানুষ সে উন্নয়নের ন্যায্য হিস্যা পায়নি। তেল-গ্যাস রপ্তানিতে আগ্রহী বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের কাছে নাইজেরিয়া একটি বাস্তব উদাহরণ। গ্যাস রপ্তানির প্রবক্তারা এ উদাহরণটি পছন্দ করেন না। তাদের ধারণা বাংলাদেশে এমনটি হবার নয়। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সমীক্ষায় গত বছর বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম দুর্নীতিপরায়ন দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে নাইজেরিয়ার ন্যায় ঘটনা ঘটবে না মানুষকে কিভাবে এ বিষয় আশ্বস্ত করা যাবে তা বিবেচনার ভার পাঠকের কাছে রইল।

১৪

জ্বালানি উন্নয়ন ও পরিবেশগত সমস্যা

জ্বালানি উন্নয়নের ফলে ভূমি, পানি ও বাতাস দূষিত হতে পারে। এ কারণে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল ধরনের জ্বালানির অনুসন্ধান, উৎপাদন, পরিশোধন, পরিবহন ও ব্যবহার প্রভৃতি প্রতিটি ধাপে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে বলা হয়েছে যে, পরিবেশ নীতি ও পরিবেশ আইন এর আওতায় পরিবেশগত বিষয় পর্যালোচনা করা হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পরিবেশগত বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। যে কারণে কাগজে-কলমে পরিবেশগত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে অঙ্গীকার ব্যক্ত থাকলেও বাস্তবে কম অর্জিত হয়েছে। কোন প্রকল্প গ্রহণের সময় এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (EIA) করে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ আইন অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় EIA-তে বর্ণিত সতর্কতা পালন করা জন্য প্রয়োজনীয় তদারকি করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। অন্যদিক হঠাৎ করে পরিবেশগত কোন বিপর্যয় ঘটে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে এবং পরবর্তীতে কি করা হবে সে সম্বন্ধে দিক নির্দেশনার অভাব রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৭ সালের জুন মাসে মাগুরছড়া গ্যাস ফিল্ড দুর্ঘটনায় বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ ছাড়া স্থানীয়ভাবে অন্যান্য যে সম্পদের ক্ষতি হয়েছে ২০০১ সাল পর্যন্ত এর কোন নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন হয়নি। এবং এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দুর্ঘটনার পর বিদ্যুত, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। অজানা কারণে সে কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। অন্যদিকে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লয়ার্স এসোসিয়েশন (BELA) মাগুরছড়া দুর্ঘটনার জন্য আদালতে মামলা করেছে। ২০০১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে সে মামলার কোন নিষ্পত্তি হয়নি।

ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানির (কয়লা, তেল, গ্যাস, বিদ্যুত ইত্যাদি) উৎপাদন, পরিশোধন, পরিবহন, প্রভৃতি বিভিন্ন ধাপে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ধাপের ন্যায় পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর এনভায়রনমেন্টাল গাইডলাইন প্রণয়ন করার একটি স্টাডি হাতে নিয়েছে। আশা করা যায় যে, উক্ত স্টাডির প্রতিবেদন প্রণীত হলে ভবিষ্যতে জ্বালানি সেক্টরের পরিবেশগত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সহজ হবে।

জ্বালানি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যায় ভোক্তারা বেশি ভোগেন। এ প্রসঙ্গে ঢাকা শহরের পরিবেশগত কিছু সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১৪.১ ঢাকা শহরে বায়ু দূষণ সমস্যা

ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটে যারা চলাফেরা করেন তারা সকলেই বায়ুদূষণের বেদনায় ভুক্তভোগী। এই বেদনার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে চোখ জ্বলা, শ্বাস কষ্ট অনুভব করা, অস্বস্তিবোধ করা ইত্যাদি। প্রতিনিয়ত যাদেরকে রাস্তা দিয়ে চলতে হয় তাদের মধ্যে অনেককে যখন বুকের ব্যথা, কাশি, রক্তচাপ, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যেতে হয়, তখন তারা হয়তো মনে করেন যে ভাগ্যে ছিল তাই এ সকল শারীরিক অসুস্থতায় ভুগতে হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, হাসপাতাল, ক্লিনিক, বেসরকারি সংস্থা, বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে, ঢাকা শহরে বায়ু দূষণজনিত কারণে ৫ লক্ষেরও অধিক মানুষ কষ্টে ভুগছেন এবং প্রতি বছর ১৫ হাজার মানুষ এ সকল রোগের কারণে মারা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গবেষকগণ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানের বায়ুতে দূষিত পদার্থের পরিমাণ পরিমাপ করে পত্র-পত্রিকায় মতামত প্রকাশ করেছেন যে রাজধানী শহর ঢাকা পৃথিবীর বায়ুদূষিত নগরীর অন্যতম। বিভিন্ন গবেষকদের প্রকাশিত উপাত্তের ভিন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে তবে কোন পরিমাণ নিরূপণ ছাড়াই যেকোন সাধারণ মানুষ স্বীকার করবেন যে আগের তুলনায় ঢাকার বাতাস অনেক দূষিত। তার প্রমাণ স্বরূপ ইদানীংকালে রাস্তা-ঘাটে হাঁটতে গেলে ট্রাফিক পুলিশ, রিক্সাওয়ালা ও পথচারীদেরকে নাকে-মুখে কাপড়ের টুকরো বেঁধে চলাচল করতে দেখা যায় এবং একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে উক্ত কাপড়ের নাকের ও মুখের স্থান বরাবর স্পষ্ট চাটা চাটা কালো দাগ। যারা রাস্তার পাশে বাস করেন তাদের বাসাবাড়িতে ঝুলন্ত ফ্যানের ব্লেডে, মশারীর চালে ঘন কালো কণা জমে থাকতে দেখা যায়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি প্রকাশনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকা শহরে বায়ুদূষণে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন যান্ত্রিক যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া শতকরা ৫০-৬০ ভাগ দায়ী। ঢাকা শহরের বায়ুদূষণের জন্য গৃহস্থালী, শিল্পকারখানা, যানবাহন, রেস্টুরেন্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি থেকে উৎপাদিত ধোঁয়া; কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া, অস্বাস্থ্যকরভাবে ফেলে রাখা বর্জ্য, জলাবদ্ধ স্থানে পচনশীল দ্রব্যের দুর্গন্ধ দায়ী। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ঢাকা শহরের মোট বায়ু দুষণের জন্য কি পরিমাণে দায়ী তা এখন পর্যন্ত যথাযথভাবে নিরূপণ করা হয়নি। তবে যানবাহন খাত মোট বায়ু দুষণের পঞ্চাশ না ষাট ভাগের জন্য দায়ী সে বিষয়ে বিতর্কের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য রেখে আপাতত এ কথা স্বীকার করা যায় যে,

ঢাকাবাসীরা যানবাহনের সৃষ্ট বায়ুদূষণে অতিষ্ঠ। প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত আলোচনা ও প্রচার জনগণকে এ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হতে সাহায্য করেছে।

BRTA-এর পরিসংখ্যান মতে ঢাকায় প্রতিদিন ২ লক্ষ যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করে। এর মধ্যে ট্রাক ১২ হাজার, বাস-মিনিবাস ৫ হাজার, প্রাইভেট কার ও জীপ ৮৫ হাজার, অটোরিক্সা (বেবি ট্যাক্সি, মিশুক) ৫০ হাজার, টেম্পো ৩ হাজার, মোটর সাইকেল ৩০ হাজার, অন্যান্য যন্ত্রচালিত যানবাহন ১৫ হাজার। এছাড়া ঢাকা শহরের রাস্তায় প্রায় ১ লক্ষ লাইসেন্সধারী এবং অসংখ্য লাইসেন্স বিহীন রিক্সা চলাচল করে। অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু রিক্সাসহ অন্যান্য মানুষ চালিত যানবাহনসমূহে কোন জ্বালানি ব্যবহৃত হয় না সে কারণে এ সকল যানবাহন পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী নয়। আজকের বিশাল ঢাকা নগরীতে দ্রুতগামী যানবাহনের গতি মন্থর করে যানজট সৃষ্টি করায় রিক্সা পরোক্ষভাবে বায়ুদূষণের জন্য দায়ী। গরিব রিক্সা চালকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে ঢাকার রাস্তা থেকে একেবারে রিক্সা তুলে দেয়ার ব্যাপারে অনেকের আপত্তি আছে। তবে ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ নিরসনের স্বার্থে মোট রিক্সার সংখ্যা ও চলাচলের পথ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

পরিবেশ অধিদপ্তরের এক গবেষণা প্রতিবেদনের সূত্রে জানা যায় যে, ঢাকা শহরের বাতাসে প্রতিদিন যানবাহনে ব্যবহৃত জ্বালানি থেকে ৭৩ টন কার্বন মনোঅক্সাইড, ১৭ টন হাইড্রোকার্বন, ১৯ টন নেইট্রোজেন অক্সাইড, ২ টন সালফার ডাইঅক্সাইড, ৪.২ টন সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার এবং ১২৮ কেজি সীসা নির্গত হয়। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের এক হিসাব অনুসারে ঢাকার বাতাসে প্রতি বছর ৫০ টন (প্রতিদিন গড়ে ১৪৫ কেজি) সীসা নির্গত হয়। ঢাকার শিশু হাসপাতালের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে শিশুদের রক্তে সীসার অনুকণার পরিমাণ বেশি হলে শিশুর মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ সমস্যা সমাধানের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বায়ুদূষণের সাথে জ্বালানি সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১৪.২ সীসামুক্ত পেট্রোলের প্রচলন

ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ নিরসনে সীসামুক্ত জ্বালানির প্রচলন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে কার ও জীপ পেট্রোল ইঞ্জিনচালিত। এ ধরনের মটরগাড়ীতে ব্যবহারের জন্য দুই ধরনের গ্যাসোলিন ব্যবহৃত হয়। যথা রেগুলার গ্যাসোলিন এবং প্রিমিয়াম গ্যাসেলিন। মোটর গ্যাসোলিনের মান নির্ধারণ সূচক হচ্ছে অকটেন নাম্বার। রেগুলার এবং প্রিমিয়াম গ্রেডের গ্যাসোলিনের অকটেন নাম্বার যথাক্রমে ৮০ এবং ৯৫। বেশি অকটেন নাম্বারের গ্যাসোলিনে নকিং (knocking) কম হয় বলে এর দাম বেশি হয়। সাধারণত দু'ভাবে বেশি অকটেনের গ্যাসোলিন উৎপন্ন করা হয়। উন্নত মানের রিফাইনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে এবং সাধারণ রিফাইনিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত নিম্নমানের

গ্যাসোলিনের সাথে নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে টেট্রাইথাইল লেড (TEL) অথবা টেট্রামিথাইল লেড (TML) নামক তরল পদার্থ মিশিয়ে। বাংলাদেশের ইস্টার্ণ রিফাইনারির রিফাইনিং প্রযুক্তি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের হওয়ায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কম অকটেন নাম্বারের গ্যাসোলিনের সাথে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বেশি অকটেন নাম্বারের গ্যাসোলিন মিশিয়ে তার সাথে পরিমাণ অনুসারে টেট্রাইথাইল লেড মিশ্রণ করে ৮০ অক্টেনের রেগুলার গ্যাসোলিন এবং ৯৫ অকটেনের প্রিমিয়াম গ্যাসোলিন উৎপন্ন করে বাজারজাত করা হতো। রেগুলার এবং প্রিমিয়াম গ্যাসোলিনে প্রতি লিটারে সীসার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ০.৫ গ্রাম (০.০৭%) এবং ০.৮৪ গ্রাম (০.১১%)। টেট্রা-ইথাইল লেড অথবা টেট্রামিথাইল লেড মিশ্রিত গ্যাসোলিন পেট্রোলচালিত গাড়িতে ব্যবহার করা হলে গাড়ি থেকে নির্গত কার্বন মনোঅক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসের সাথে সীসা নির্গত হয়। সীসা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক বিবেচিত হওয়ায় সরকার সীসাবিহীন (lead free) গ্যাসোলিন বাজারজাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে অনুসারে ঢাকা শহরের পেট্রোল পাম্পে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ থেকে সীসামুক্ত গ্যাসোলিন বিক্রি করা হলেও সাধারণ মানুষ ও গুণীজনরা বিষয়টি ভালভাবে জানতে পারেনি।

উদাহরণস্বরূপ ১৪-১৫ জানুয়ারি, ২০০০ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সেমিনারে সীসামুক্ত পেট্রোল বাজারজাত করা প্রয়োজন বিষয়ে যখন প্রস্তাব করা হয় তখন একজন বিজ্ঞ আলোচক মত প্রকাশ করেন যে, পেট্রোল থেকে সীসা বের করে নিয়ে বাজারজাত করায় অসুবিধা কি? এটা করা হচ্ছে না কেন? সে অনুষ্ঠানে মুক্ত আলোচনার সুযোগ ছিল না বলে উক্ত সভায় এ ভাল খবরটি জানানো সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় কর্মরত কয়েকজন বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করার সময় যখন বলা হল যে ঢাকাতে সীসামুক্ত পেট্রোল বাজারজাত করা হয়, তারা মুখের কথা বিশ্বাস করতে চাচ্ছিলেন না। বরং পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন যে, যদি সীসামুক্ত পেট্রোলই বাজারজাত করা হয়ে থাকে তবে তা প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে না কেন? ডিসেম্বর ১৯৯৯ এবং জানুয়ারি ২০০০ সালে প্রকাশিত দেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায়ও সীসামুক্ত জ্বালানি বাজারজাত করার জন্য দাবি প্রকাশিত হয়েছে। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে, লেডযুক্ত পেট্রোল কেনার সময়ও ৯৫ অকটেন নাম্বারের পেট্রোল ক্রয় করা হত এবং লেডমুক্ত পেট্রোল ক্রয় করার সময়ও ৯৫ অকটেনের পেট্রোল ক্রয় করা হয়। তাহলে বিক্রিত ৯৫ অকটেনের পেট্রোল লেডমুক্ত হল কিভাবে? এ প্রশ্নের অর্থ বুঝতে খানিকটা সময় লেগেছিল। প্রশ্নকর্তা মনে করেছেন যে, ৯৫ অকটেনের পেট্রোলে শতকরা ৯৫ ভাগ পেট্রোল থাকে এবং বাকি ৫ ভাগ লেড। গ্যাসোলিনের অকটেন নাম্বার নির্ণয়ের জন্য কোয়াপারেটিভ ফুয়েল রিসার্চ (CFR) ইঞ্জিন নামে স্ট্যান্ডার্ড ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। উক্ত স্ট্যান্ডার্ড ইঞ্জিনে যে গ্যাসোলিনের knocking পারফরমেন্স ১০০ ভাগ iso-octane জ্বালানি এর সমমানের সে

গ্যাসোলিনের অকটেন নাম্বার ১০০ নির্ধারণ করা হয়। তেমনিভাবে যে গ্যাসোলিনের knocking পারফরমেন্স ৯৫ ভাগ iso-octane এবং ৫ ভাগ normal-heptane এর সমমানের সে গ্যাসোলিনের অকটেন নাম্বার ৯৫। যে গ্যাসোলিনের knocking পারফরমেন্স ৮০ ভাগ iso-octane এবং ২০ ভাগ normal-heptane এর সমমানের সে গ্যাসোলিনের অকটেন নাম্বার ৮০।

বর্তমানে লেডমুক্ত ৯৫ এবং ৮০ অকটেনের গ্যাসোলিন উৎপাদন করার জন্য বিপিসি-কে উচ্চ দামে বিদেশ থেকে বেশি পরিমাণে বেশি অকটেন (high octane) গ্রেডের গ্যাসোলিন আমদানি করে আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কম অকটেন (low octane) গ্রেডের গ্যাসোলিনের সাথে মিশ্রণ করে নির্দিষ্টকৃত ৯৫ এবং ৮০ অকটেনের সীসামুক্ত গ্যাসোলিন উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হয়। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে বিপিসি-কে বেশি পরিমাণে বেশি অকটেন (high octane) গ্রেডের গ্যাসোলিন আমদানি করার জন্য আগের তুলনায় বেশি অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। অন্যদিকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কম অকটেন গ্রেডের গ্যাসোলিন ব্যবহার করতে না পারার কারণে অপেক্ষাকৃত কমদামে অতিরিক্ত পরিমাণ কম অকটেনের (low octane) গ্যাসোলিন বিদেশে রপ্তানি করতে হয়। সীসামুক্ত গ্যাসোলিন বাজারজাত করার কারণে বিদেশ থেকে টেট্রাইথাইল লেড আমদানি না করার কারণে যে পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হয় এবং কম অকটেন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম রপ্তানি করে যে পরিমাণ আয় হয় তার যোগফলের চেয়ে বিদেশ থেকে বেশি অকটেন গ্রেডের বেশী পরিমাণের গ্যাসোলিন আমদানি করতে বিপিসির খরচ বেশি হয়। এই ব্যয়িত অর্থের আনুপাতিক হারে বাজারে গ্যাসোলিনের দাম না বাড়াবার কারণে বিপিসিকে লোকসানের দায় বহন করতে হচ্ছে। আমার মতে পরিবেশ দূষণ নিরসনের জন্য সীসামুক্ত পেট্রোল প্রচলনের ব্যয় পেট্রোলিয়ামের দাম বাড়িয়ে উশুল করা উচিত।

সরকার যদি ইস্টার্ণ রিফাইনারিতে একটি কনটিনিউয়াস ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ অনুমোদন করে তবে ভবিষ্যতে টেট্রাইথাইল লেড না মিশিয়ে, উন্নত রিফাইনিং পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে বেশি পরিমাণে বেশি অকটেনের (high octane) গ্যাসোলিন উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এখানে একটি বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন যে, ইতোপূর্বে যখন সীসাযুক্ত গ্যাসোলিন বাজারজাত করা হতো এবং বর্তমানে lead free গ্যাসোলিন বাজারজাত করা হচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বেশি অকটেনের (high octane) সীসামুক্ত গ্যাসোলিনের সাথে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কম অকটেনের (low octane) সীসামুক্ত গ্যাসোলিন মিশিয়ে উৎপাদন করা হতো এবং বর্তমানে হয়। তফাৎ হচ্ছে যে, আগে নির্দিষ্ট অকটেন গ্রেডের গ্যাসোলিন প্রস্তুত করতে মিশ্রিত সীসামুক্ত গ্যাসোলিনের সাথে টেট্রাইথাইল লেড মিশানোর সুযোগ ছিল বলে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বেশি অকটেনের (high octane) গ্যাসোলিন পরিমাণে কম লাগতো। বর্তমানে টেট্রাইথাইল লেড না মিশানোর কারণে নির্দিষ্ট অকটেন গ্রেডের গ্যাসোলিন প্রস্তুত করতে আগের

তুলনায় বেশি পরিমাণে বেশি দামের বেশি অকটেনের (high octane) গ্যাসোলিন আমদানি করতে হচ্ছে। আগের পদ্ধতির তুলনায় বর্তমানে অনুসৃত পদ্ধতিতে খরচ বেশি পড়ে। টেট্রাইথাইল লেডের কাজ ছিল কম অকটেনের (low octane) গ্যাসোলিনকে বেশি অকটেনের (high octane) গ্যাসোলিনের ন্যায় performance দিতে সহায়তা করা।

বিপিসি জুলাই ১৯৯৯ সময় থেকে সীসামুক্ত পেট্রোলিয়াম আমদানি ও বিতরণের ব্যবস্থা করেছে। যেহেতু ঢাকা শহরসহ দেশের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পের স্টোরেজ ট্যাংকে ইতোপূর্বে সীসা মিশ্রিত পেট্রোল সংরক্ষণ করা হত – সে কারণে জুলাই ১৯৯৯ থেকে সীসামুক্ত পেট্রোল বাজারজাত করা শুরু করা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে পেট্রোল পাম্প থেকে সীসামুক্ত পেট্রোল পেতে কয়েক মাস লেগে যায়। ইতিপূর্বে ধারণকৃত স্টোরের সীসা মিশ্রিত অংশ আস্তে সীসামুক্ত পেট্রোলের সাথে সংমিশ্রিতভাবে ব্যবহারের ফলে ক্রমাগতভাবে এর পরিমাণ হ্রাস পেয়ে শূন্যের পর্যায়ে পৌঁছায়। সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সময়ে বিভিন্ন স্থানে গ্যাসোলিন পরীক্ষা করে কোন সীসা পাওয়া যায়নি। বিপিসির হিসাব অনুসারে ১৯৯৯-২০০০ বছরে অকটেন (প্রিমিয়াম গ্যাসোলিন) এবং পেট্রোল (রেগুলার গ্যাসোলিন)-এর চাহিদা হচ্ছে যথাক্রমে ৭৫,০০০ মেট্রিক টন এবং ২,৫৫,০০০ মেট্রিক টন। সীসামুক্ত গ্যাসোলিন বাজারজাত করার ফলে ১৯৯৯-২০০০ বছরে ৭৫,০০০ টন অকটেনের জন্য ৮.২৫ টন সীসা এবং ২,৫৫,০০০ টন পেট্রোলের জন্য ২০.৪ টন সীসা বাংলাদেশের বায়ুতে নির্গত হতো। ইতোপূর্বে গবেষকরা ঢাকার বাতাসে প্রতিবছর ৫০ টন সীসা নির্গত হয় বলে সংবাদপত্রে মত প্রকাশ করে ছিলেন। উপরোক্ত হিসাবের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বাতাসে সীসার পরিমাণ পরিমাপ করে সীসার যে মোট পরিমাণের হিসাব দেয়া হয়েছিল তা সারাদেশে ব্যবহৃত পেট্রোল থেকে নির্গত সীসার পরিমাণের চেয়ে ২১.৩৫ টন বেশি। গবেষকদের প্রকাশিত তথ্য যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে ঢাকার বাতাসে পেট্রোল ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে সীসা নির্গত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ বাজারজাত করার ইতিহাসে জুলাই ১৯৯৯ থেকে সীসামুক্ত পেট্রোলিয়াম বাজারজাত করার ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। ইস্টার্ণ রিফাইনারি এবং বিপিসি কোন বিদেশী সাহায্য ও উপদেশ ছাড়া সফলতার সাথে এ ধরনের কাজ করার জন্য সকলের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। পরিবেশ দূষণরোধে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এ ধরনের ভাল খবর গণমাধ্যমে অবশ্যই প্রচার করা উচিত ছিল।

১৪.৩ দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট মোটরযানের বায়ু দূষণ

পেট্রোল চালিত ইঞ্জিনে সীসাযুক্ত গ্যাসোলিন ব্যবহারের ন্যায় পেট্রোল চালিত দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট মোটরযান (বেবি ট্যাক্সি, টেম্পো) থেকে নির্গত বিভিন্ন গ্যাস ও গ্যাসীয় পদার্থ বায়ু দূষণ করে। দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট মোটরযানে যখন সীসাযুক্ত

গ্যাসোলিন ব্যবহার করা হয় তখন অন্যান্য মোটরযানের ন্যায় বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইড, কার্বন মনক্সাইড, সীসা ছাড়া অন্যান্য যে সকল গ্যাস নির্গত হয় তা হচ্ছে অসম্পূর্ণ পোড়া গ্যাসোলিনের অংশ এবং লুব্রিক্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত ভারী তেলের বাষ্প ও কার্বনকণা। এ কারণে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহনগুলো গ্যাসোলিন চালিত অন্যান্য গাড়ির (কার) চেয়ে বেশি পরিবেশদূষক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত কম দামে যন্ত্রচালিত যানবাহন উৎপাদনের লক্ষ্যে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন বাজারজাত করা হয়। এ ধরনের ইঞ্জিনে চলমান (moveable) পার্টসে লুব্রিক্যান্ট দেয়ার জন্য চারস্ট্রোক-ইঞ্জিনের ন্যায় আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। যে কারণে যানবাহন চালাবার সময় নির্দিষ্ট অনুপাতের গ্যাসোলিন এবং লুব্রিকেটিং তেল একত্রে গাড়ির ফুয়েল ট্যাংকে ঢালা হয়। এ সস্তা ইঞ্জিনের প্রযুক্তিগত দুর্বলতার কারণে ইঞ্জিনে ব্যবহারের জন্য জ্বালানি তেল পুরাপুরিভাবে পুড়ে না, আংশিক না পুড়েই বের হয়ে যায়। এ ছাড়া লুব্রিকেশনের জন্য দেয়া অপেক্ষাকৃত ভারী তেল বেশিরভাগই না পুড়ে তেলের বাষ্প হিসাবে ইঞ্জিন থেকে বের হয়ে যায়। দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন থেকে নির্গত আংশিক পোড়া তেলের ধোয়া এবং লুব্রিকেটিং তেলের বাষ্প মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করেন যে, পেট্রোল পাম্পের মালিকরা জ্বালানি তেল বিক্রির সময় বেশি লাভ করার জন্য বেবিট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণ লুব্রিক্যান্ট বিক্রি করেন। আবার অনেক সময় বেবিট্যাক্সি ড্রাইভাররা অজ্ঞতার কারণেও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণ লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার করেন। যে কারণেই হোক না কেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার পরিবেশের জন্য বেশি ক্ষতিকারক।

কোন কোন উদ্যোক্তা মনে করেন যে কোন বিখ্যাত আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির প্রস্তুতকৃত নির্দিষ্ট ব্রান্ডের লুব্রিকেটিং তেল পরিমাণ মত ব্যবহার করা হলে সে ক্ষেত্রে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণের পরিমাণ অনেকাংশে কমে আসবে। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারকে অর্থাৎ বিপিসিকে উক্ত তেল কোম্পানিকে একচেটিয়াভাবে তাদের লুব্রিকেটিং অয়েল বাজারজাত করার অধিকার দিতে হবে। অন্য কোন আন্তর্জাতিক কোম্পানি যদি একই মানের অথবা তার চেয়ে ভাল মানের লুব্রিক্যান্ট সরবরাহ করতে সক্ষম হয় সে ক্ষেত্রে বিপিসি কি করবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে এ সকল উদ্যোক্তারা আগ্রহী নয়। বাজার অর্থনীতির যুগে কোন বিশেষ কোম্পানিকে একচেটিয়াভাবে লুব্রিকেটিং পণ্য বাজারজাত করার অধিকার দেয়ার কোন যুক্তি নেই।

বিপিসি এবং তার অধীনস্থ কোম্পানিগুলোতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ আছেন। তারা একটু সচেষ্ট এবং আন্তরিক হলে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিনের জন্য নির্দিষ্ট মানের লুব্রিকেটিং অয়েল চিহ্নিত করতে পারেন। পরবর্তীতে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মুখবন্ধ বোতলে বিভিন্ন পরিমাপের লুব্রিকেটিং অয়েল বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে পারেন। এ সকল যানবাহনের চালকরা নির্দিষ্ট পরিমাণের গ্যাসোলিন কেনার সময় বর্তমানে প্রচলিত খোলা লুব্রিকেটিং তেলের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণের sealed বোতলে

লুব্রিক্যান্ট কিনবেন এবং ডিস্টিলড্ ওয়াটারের বোতলের ন্যায় প্লাস্টিকের বোতলের গলার শুরু অংশ ভেঙ্গে লুব্রিকেটিং অয়েল ফুয়েল ট্যাংকে ঢেলে মিশিয়ে নেবেন। এ ব্যবস্থা চালু করা হলে ভেজাল এবং পরিমাণের অতিরিক্ত লুব্রিকেটিং অয়েল বিক্রি কমবে। বিপিসি ও লুব্রিকেটিং অয়েল মার্কেটিং কোম্পানিগুলোর কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য বিষয়টি উল্লেখ করা হল।

ঢাকা শহরের পরিবেশ দূষণ নিরসনের জন্য ঢাকার রাস্তায় দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা গেলে ভাল ফল হত। সেমিনার ও সভার আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সরকার ২০০২ সালের মধ্যে ঢাকার রাস্তা থেকে পর্যায়ক্রমে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন তুলে দেয়ার ব্যবস্থা নেবেন। বিষয়টি ঢাকা শহরের রাস্তা থেকে রিক্সা তুলে দেয়ার ন্যায় আর্থ-সামাজিক সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত। জাতীয় পরিবেশ কমিটির নির্বাহী কমিটির সভায় এ বিষয় যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা হলো বাজেটে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহনের উপর উচ্চহারে কর আরোপ করা। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের বাজেটে এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের ফলে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন আমদানি কমেছে বলে জানা যায়নি। ঢাকা শহরে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট পেট্রোলচালিত যানবাহন নিষিদ্ধ হতে পারে এ খবরের সুবাদে কোন কোন উদ্যোক্তা ঢাকা শহরে চারস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট ডিজেলচালিত বেবিট্যাক্সি ও টেম্পো চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে চারস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট ডিজেলচালিত যানবাহন, দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট পেট্রোলচালিত যানবাহনের ন্যায় পরিবেশকে দূষিত করে। যতটুকু জানা যায় পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বিআরটিএ এখন পর্যন্ত এ ধরনের যানবাহন চলাচলের জন্য অবাধ রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে না।

কোন কোন উদ্যোক্তা ঢাকা শহরে পেট্রোলচালিত দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন যানবাহনের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক ব্যাটারিচালিত যানবাহন প্রচলনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তাদের যুক্তি হল, সস্তা দামের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে অথবা গ্রীড থেকে অফ পিক আওয়ারে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ব্যাটারি চার্জ করে রাখা হবে। পরবর্তীতে চার্জ করা ব্যাটারি ব্যবহার করে যানবাহন চালানো হবে। বেবিট্যাক্সি এবং টেম্পো স্ট্যান্ডের কাছে ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন নির্মাণ করে চার্জ করা ব্যাটারি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। আজ থেকে ৩০ বছর আগে ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সময় খুব ভোরে ব্যাটারিচালিত ভ্যানে করে বাসায় বাসায় দুধের বোতল বিতরণ করতে দেখেছি। খুব কম শব্দ করে এ গাড়িগুলো চালানো যেত বলে পেট্রোল চালিত ভ্যানের পরিবর্তে এগুলো ব্যবহার করা হত। ইদানীংকালে নেপালের কাঠমান্ডু শহরে এ ধরনের বিদ্যুৎ চালিত যানবাহন চালু করা হয়েছে। নেপালে যে বিদেশী উদ্যোক্তা এ যানবাহন চালু করতে সাহায্য করেছে তারা বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞ হিসাবে আসতে খুব আগ্রহী; ফান্ডিং এর জন্য দাতা খুঁজছেন। উদ্যোক্তারা মনে করেন ঢাকা শহরেও এ যানবাহন চালু করার সম্ভাবনা আছে। কোন কোন দেশী বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, কাঠমান্ডু শহরে

বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার সমস্যা নেই কিন্তু ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতার সমস্যা বিদ্যমান। ডিসি মোটর ব্যবহার করে জলাবদ্ধ এলাকায় গাড়ী চালালে অতি সহজে মোটর খারাপ হয়ে যাবে। এ কারণে ঢাকা শহরের জন্য ডিসি মোটরের পরিবর্তে এসি মোটর সংযোজিত ব্যাটারিচালিত যানবাহন চালু করা বেশি যুক্তিসঙ্গত। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন তুলেছেন যে, ব্যাটারি চালিত যানবাহন চালু করা হলে পরবর্তীতে জীবন শেষ হয়ে যাওয়া ব্যাটারি থেকে সীসা দূষণ হতে পারে। এক ধরনের প্রযুক্তির প্রমোটাদের সাথে আলাপ করা হলে অন্য প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতাও দোষত্রুটি সম্বন্ধে জানা যায়।

১৪.৪ ডিজেল ইঞ্জিনচালিত মোটরযানের বায়ু দূষণ

ঢাকা শহরে বাস ও ট্রাকের ন্যায় ভারী যানবাহন ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত। ডিজেল ইঞ্জিনে সালফার যুক্ত ডিজেল জ্বালানি ব্যবহার করার ফলে এ সকল যানবাহন থেকে কার্বনডাই অক্সাইড, কার্বন মনক্সাইড, সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং পার্টিকুলেট ম্যাটার নির্গত হয়। বিপিসি বাতাসে সালফার অক্সাইডের দূষণ কমাবার জন্য আগের তুলনায় কম সালফারযুক্ত ডিজেল জ্বালানি বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বাভাবিক কারণে ভাল মানের ডিজেল জ্বালানির দাম কিছু বেশি হবে এবং জ্বালানি ব্যবহারকারীদেরকে এর খরচ বহন করতে হবে। পেট্রোল ও ডিজেল চালিত যানবাহন থেকে বায়ুদূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিবেশ কমিটির নির্বাহী কমিটির সভায় ১ জুলাই ১৯৯৯ এর পর থেকে আমদানিকৃত পেট্রোল চালিত যানবাহনে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার এবং ডিজেল চালিত যানবাহনে ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার সংযোজন করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ সুপারিশটি খুবই ভাল, নতুন গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের সময় ক্যাটালাইটিক কনভার্টর এবং ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার সংযোজন নিশ্চিত করা যেতে পারে। যারা পরিবেশ দূষণ করবেন তাদের পরিবেশ দূষণ নিরসনের ব্যয় বহন করা উচিত।

১৪.৫ মোটরযান কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি) এর ব্যবহার

২০০০ সালে বাংলাদেশে মোট ৩২ লক্ষ টন তরল পেট্রোলিয়াম জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৮% পূরণ করা হয়েছে আমদানির মাধ্যমে এবং বাকি ২% দেশের বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তরল পেট্রোলিয়াম জ্বালানি থেকে। চট্টগ্রামে অবস্থিত ইস্টার্ণ রিফাইনারিতে ক্রুড অয়েল পরিশোধন করে দেশে ব্যবহৃত মোট পেট্রোলিয়াম জ্বালানির ৩৮% এবং বাকি ৬২% সরাসরি বিদেশ থেকে আমদানি করে চাহিদা মিটানো হয়েছে। দেশে পেট্রোলিয়াম জ্বালানির চাহিদা প্রতি বছর ৯% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যতটা সম্ভব আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম জ্বালানির পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাবার জন্য সরকার সব সময় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেশের সকল অঞ্চলে এবং সব ধরনের গ্রাহকদের জন্য পাইপাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ

করা সম্ভব হচেছ না। যেমন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এখন পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করা সম্ভব না হওয়ায় এতদাঞ্চলের শিল্প-কারখানার আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম জ্বালানি সরবরাহ করে চাহিদা মিটানো হয়। অন্যদিকে যোগাযোগ সেক্টরে সকল ধরনের যানবাহনে তরল পেট্রোলিয়াম জ্বালানি যেমন পেট্রোল ও ডিজেল ব্যবহৃত হয়। ২০০০ সালে দেশে ব্যবহৃত মোট ৩২ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রায় ৪৮% যোগাযোগ সেক্টরে ব্যবহার করা হয়েছে। স্থলপথে চলাচলকারী পেট্রোল ও ডিজেল চালিত যানবাহনে এবং জলপথে চলাচলকারী ডিজেলচালিত যানবাহনে আমদানিকৃত তরল পেট্রোলিয়াম জ্বালানির পরিবর্তে দেশে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যানবাহনে তরল জ্বালানির সম্পূরক জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার পদ্ধতিকে বলা হয় সিএনজি পদ্ধতি। পেট্রোলিয়াম জ্বালানি চালিত গাড়ীতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করতে হলে সিএনজি ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ বা কনভার্সনকীট এবং গ্যাস বহন করার জন্য তরল জ্বালানির ট্যাংকের অতিরিক্ত সিএনজি সিলিন্ডার সংযোজন করতে হয়। উচ্চ চাপে বেশি পরিমাণে গ্যাস স্টোর করার জন্য সিএনজি সিলিন্ডার, তরল জ্বালানি ট্যাংকের তুলনায় অনেক বেশি মজবুত হয়। বর্তমান বাজার দরে ২০০১ সালে একটি ১৩০০ সিসি পেট্রোল চালিত গাড়িকে যথাযথ যন্ত্রাংশ এবং সিএনজি সিলিন্ডার সংযোজনের মাধ্যমে গ্যাসে চালানোর জন্য উপযোগী করতে ২২,৬০০ টাকা প্রয়োজন হয়।

সরকার কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (CNG)-এর সম্ভাবনাময়ী প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশে গ্যাস চালিত যানবাহন প্রচলনের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে পেট্রোবাংলার অধীনে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (RPGCL) নামে স্বতন্ত্র একটি কোম্পানি গঠন করেছে। সিএনজি বাজারজত করা ছাড়াও আরপিজিসিএল, প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে প্রাপ্ত ন্যাচারাল গ্যাস লিকুইড (হায়ার হাইড্রোকার্বন) প্রসেস করে এলপিজি উৎপাদনের দায়িত্বেও নিয়োজিত। আরপিজিসিএল ইতোমধ্যে ঢাকার জোয়ারসাহারাতে একটি সিএনজি ওয়ার্কশপ এবং ঢাকা শহরে ৪টি পেট্রোল পাম্পে (মেসার্স রহমান সার্ভিস এন্ড ফিলিং স্টেশন, কল্যাণপুর; মেসার্স সোহাগ ফিলিং স্টেশন, মহাখালী; মেসার্স পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাব পেট্রোল পাম্প, আসাদগেট; মোহাম্মদপুর এবং মেসার্স রহমান ফিলিং স্টেশন, টিকাটুলি, মতিঝিল) যানবাহনে ব্যবহারের লক্ষ্যে উচ্চ চাপের প্রাকৃতিক গ্যাস বিক্রয়ের জন্য কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করেছে। দেশের পূর্বাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লাসহ অন্যান্য শহরে) বিভিন্ন শহরে সিএনজি সরবরাহের জন্য ৫১টি সিএনজি সরবরাহ স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে চীনের একটি কোম্পানির সাথে ইতোমধ্যে আরপিজিসিএল-এর একটি যৌথ বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যানবাহনে সিএনজি-এর ব্যবহার সম্প্রসারিত হলে আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম জ্বালানি সাশ্রয় হবে, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে নিজস্ব প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে ও পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমবে। অর্থাৎ পেট্রোল

এবং ডিজেল জ্বালানোর ফলে যে সকল দূষিত গ্যাস নির্গত হত তার মাত্রা কমবে। অনেকে দাবি করেন যে সিএনজি চালু করা হলে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমণের পরিমাণও কমবে। এ সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণকারীদের মতে সিএনজি ব্যবহারের জন্য লিকেজের ফলে এটমসফিয়ারে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস নির্গত হয় গ্রীণ হাউস এফেক্ট সৃষ্টিতে তার যথেষ্ট প্রভাব পড়তে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৯৯০ সালে সিএনজি চালিত গাড়ির সংখ্যা ছিল : ইতালী ৩.৭ লক্ষ, নিউজিল্যান্ড ১.৭ লক্ষ, রাশিয়া ২.০ লক্ষ, যুক্তরাষ্ট্র ৩০ হাজার, কানাডা ১৫ হাজার, চীন ২ হাজার। ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু করে ২০০০ সাল পর্যন্ত ১৬ বছর সময়কালে ঢাকা শহরে ১২০০ যানবাহন সিএনজিতে চলার জন্য রূপান্তরিত করা হয়েছে। গড়ে বছরে ৭৫টি গাড়ি সিএনজি ব্যবহারের জন্য রূপান্তরিত করা হয়েছে যা মোটেই আশাব্যাঞ্জক নয়।

মে ২০০০ সালে যানবাহনের ব্যবহারকারীদের জন্য প্রতি ঘনমিটার সিএনজির দাম ছিল টাকা ৭.৪৫। তাপ প্রদানের ক্ষমতা অনুসারে ১ ঘনমিটার সিএনজি ১.২৩ লিটার পেট্রোল এবং ০.৯৩ লিটার ডিজেলের সমতুল্য। প্রতি লিটার পেট্রোলের মূল্য টাকা ২১.০০ এবং প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য টাকা ১২.৯৩ ধরে (তাপ প্রদানের ক্ষমতা অনুসারে) প্রতি লিটার পেট্রোলের সমপরিমাণ সিএনজি-এর মূল্য টাকা ৬.০৫ এবং প্রতি লিটার ডিজেলের সমপরিমাণ সিএনজি-এর মূল্য টাকা ৮.৫৫ হয়। একটি ১৩০০ সিসি কার গড়ে প্রতিদিন ৬০ কিলোমিটার পথ চললে প্রায় ৮ ঘনমিটার সিএনজির প্রয়োজন হয়, যার দাম পড়ে টাকা ৫৯.৬০। অন্যদিকে ৬০ কিলোমিটার চলাচলের জন্য ৮ লিটার পেট্রোলের প্রয়োজন হয়, যার মূল্য টাকা ১৬৮.০০। একটি ১৩০০ সিসি গাড়ি সারা মাস ধরে সিএনজি ব্যবহার করে চালালে খরচ পড়ে টাকা ১,৭৮৮ এবং পেট্রোল ব্যবহার করে চালালে খরচ পড়ে ৩০ × টাকা ১৬৮.০০ = টাকা ৫০৪০.০০। অর্থাৎ সিএনজি ব্যবহারের জন্য একমাসে জ্বালানি বাবদ সাশ্রয় হয় টাকা ৩২৫২.০০। একটি ১৩০০ সিসি গাড়ি সিএনজি ব্যবহারের উপযোগী করতে খরচ পড়ে টাকা ২২,৬০০.০০। রূপান্তরিত গাড়িটি সিএনজি ব্যবহার করে টাকা ২২,৬০০.০০ ÷ টাকা ৩২৫২.০০ = ৭ মাস চালালে গাড়িটি সিএনজিতে রূপান্তর করতে যে খরচ পড়ে তা উঠে আসে। নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন একজন গাড়ি ব্যবহারকারীর জন্য গাড়িতে পেট্রোলের পরিবর্তে সিএনজি ব্যবহার করা লাভজনক।

বর্তমানে প্রতি ঘনমিটার সিএনজি-এর বিক্রয় মূল্য টাকা ৭.৪৫ অন্যান্য গ্রাহকদের জন্য নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশ বেশি (মে ২০০০)। ঢাকা শহরে স্থাপিত ৪টি গ্যাস ফিলিং স্টেশনের জন্য আরপিজিসিএল প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের জন্য টাকা ১.৯৩ মূল্য পরিশোধ করে এবং গাড়ি ব্যবহারকারীদের কাছে টাকা ৭.৪৫ দামে বিক্রি করে। অর্থাৎ গ্যাস ফিলিং স্টেশনে গ্যাস বিক্রয় ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত হচ্ছে ৩.৯ গুণ (৭.৪৫ ÷ ১.৯৩)। নিঃসন্দেহে যে কোন বিনিয়োগকারীর জন্য গ্যাস ফিলিং স্টেশন স্থাপন করা একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। ঢাকা শহরে বর্তমানে রাস্তার পাশে জমির মূল্য

অনেক বেশি সে কারণে নতুনভাবে জমি ক্রয় করে গ্যাস ফিলিং স্টেশনের ব্যবসা লাভজনক নাও হতে পারে। তবে বর্তমানে যাদের পেট্রোল পাম্প আছে তারা সিএনজি রিফিলিং-এর জন্য কম্পপ্রেসর বসিয়ে ব্যবসা শুরু করলে ভাল লাভ করতে পারেন। যদি সরকার অনুগ্রহ করে পেট্রোল এবং ডিজেলের দামের সাথে সিএনজি গ্যাসের মূল্যের বর্তমান ব্যবধান দীর্ঘ মেয়াদকাল পর্যন্ত বজায় রাখতে সম্মত হয়। কেননা, কোন উদ্যোক্তা যদি আগ্রহী হয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সিএনজি স্টেশন চালু করার পর গ্যাস ফিলিং স্টেশনের কাছে বর্তমানে যে দামে গ্যাস বিক্রি করা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি দাম নির্ধারণ করে তবে বিনিয়োগকারীরা ঋণ খেলাপী হয়ে যেতে পারে।

আরপিজিসিএল বর্তমানে প্রতিদিন ৮-১০টি গাড়ি কনভার্সন করতে সক্ষম। একটি গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডারে গ্যাস রিফিল করতে ৭-৮ মিনিট সময় লাগে। ঢাকা শহরে অধিক সংখ্যক গাড়িতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হলে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত গাড়ির তুলনায় বায়ু দূষণ কম হবে, অন্যদিকে আমদানিকৃত জ্বালানির ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস পাবে। এত সম্ভাবনাময়ী একটি প্রযুক্তি গাড়ি চালকরা নিচ্ছে না কেন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে কোন কোন বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেন যে, তেল চুরি করা যায় না বলে সরকারি গাড়ির ড্রাইভাররা প্রাকৃতিক গ্যাসে চালিত গাড়ি চালাতে উৎসাহবোধ করে না। এ কারণে আরপিজিসিএল এখন বেশি সংখ্যক প্রাইভেট গাড়ি এবং ট্যাক্সি প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তরিত করতে আগ্রহী। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের গাড়ির ড্রাইভাররা তেল চুরি করার সুযোগ না থাকার কারণে গ্যাস দিয়ে গাড়ি চালাতে উৎসাহবোধ করবে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সিএনজি পদ্ধতিতে গাড়ি চালাবার ব্যবস্থা করা হলেও প্রাথমিক অবস্থায় গাড়ী স্টার্ট দেয়ার জন্য কিছু জ্বালানি তেল রাখা প্রয়োজন হয়। একজন পরিবেশ দরদি ব্যক্তি বলেছেন যে, তিনি নিজের গাড়িতে সিএনজি পদ্ধতি চালু করে নিয়মিতভাবে গ্যাস ফিলিং স্টেশনে সার্ভিস না পাওয়ার কারণে মাঝে মাঝে বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, প্রাইভেট উদ্যোক্তারা সিএনজি প্রযুক্তি প্রচলনে উদ্যোগী হলে ভোক্তারা উন্নত মানের সেবা পাবেন। তবে দীর্ঘ মেয়াদকালে গ্যাসোলিনের তুলনায় কম দামে গ্যাস বিক্রি করার জন্য নিশ্চয়তা প্রদান না করা হলে প্রাইভেট সেক্টর আগ্রহী হবে না। কেউ কেউ মনে করেন যে, যানবাহনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করার ফলে বাংলাদেশে অন্যান্য কাজে গ্যাসের ব্যবহারে অভাব হতে পারে। বর্তমান মুহূর্তে এ ধরনের ধারণা একেবারে অমূলক। প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণের ফলে আগের তুলনায় বর্তমানে এলপিজি সিলিন্ডারের প্রাপ্যতা অনেক সহজ হয়েছে। দামে পোষালে প্রাইভেট ট্যাক্সির চালকরা গ্যাসোলিনের পরিবর্তে স্ব-উদ্যোগে গাড়িতে এলপিজি ব্যবহার শুরু করতে পারে। থাইল্যান্ডে অনেক বছর ধরে LPG চালিত গাড়ি চলছে।

RPGCL এর কারিগরি সেবার মান দেখার জন্য লেখক একবার (মে ২০০০) জোয়ারসাহারা ওয়ার্কশপে গিয়েছিল। সেখানে সেবার যে মান পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ

হয়েছে তার দু'একটা ঘটনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। একটি প্রাইভেট কোম্পানির একজন ড্রাইভার তার কোম্পানির গাড়ি নিয়ে কনভার্সনের জন্য আসলে ওয়ার্কশপের কারিগরগণ গাড়ি পরীক্ষা করে তাকে জানালেন যে গাড়িতে যান্ত্রিক সমস্যা আছে। গাড়িটি কনভার্সন করার উপযোগী নয়। যান্ত্রিক সমস্যা সমাধান করে তারা তাকে পুনরায় আসতে বললেন। সে গাড়ির ড্রাইভার অনুরোধ করলেন যে, তার গাড়িতে কি ত্রুটি তা লিখে দিতে যাতে তিনি তার মালিককে বলতে পারেন। তখন ওয়ার্কশপের কারিগরগণ তাকে গাড়ির মালিকসহ আসতে বললেন। ড্রাইভার অনুরোধ জানালেন যে কাগজে কিছু লিখে না দিলে তার মালিক তাকে বিশ্বাস করবে না যে, তিনি সত্যি সত্যিই কনভার্সনের জন্য ওয়ার্কশপে এসেছিলেন (ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে তেল চুরির সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় বলে ড্রাইভার চালিত গাড়ির চালকরা গাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর করতে নিরুৎসাহিতবোধ করে)। ওয়ার্কশপের কারিগরগণ গাড়ির ড্রাইভারকে জানালেন যে, তারা কোন কাগজে কোন কারণ লিখে দেন না। এমতাবস্থায় ড্রাইভার ওয়ার্কশপের ফোনে তার মালিককে যোগাযোগ করে আলাপ করতে চাইলে তাও পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি ওয়ার্কশপের ফোন নাম্বার লিখে নিয়ে চলে গেলেন।

এরপর মালিকসহ একজন হলুদ ট্যাক্সি ক্যাবের ড্রাইভারের সাথে আলাপ হল। তার সাথে আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করলে ওয়ার্কশপের কারিগরগণ একটু ইতস্তত বোধ করলেন। হলুদ ট্যাক্সি ক্যাবের মালিক জানালেন যে, তার একাধিক ট্যাক্সি ক্যাব আছে। তিনি লাভজনক কারণে সিএনজিতে কনভার্সনে আগ্রহী কিন্তু নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে পারছেন না। এছাড়া তিনি ইতোমধ্যে সে সকল গাড়ি কনভার্ট করেছেন ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ না পাওয়ার কারণে সেগুলো ঠিকমত চালাতে অসুবিধায় পড়ছেন। ওয়ার্কশপের টেকনিশিয়ানদের এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জানান যে, তারা একটি complete কনভার্সনকীট বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু তাদের স্টকে খুচরা যন্ত্রাংশ থাকে না বলে যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারেন না। হলুদ ট্যাক্সির মালিক জানালেন যে, তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে ভবিষ্যতে ট্যাক্সি ক্যাব আমদানি করার সময় প্রাকৃতিক গ্যাস কনভার্সনকীটসহ আমদানি করবেন। তাঁর মতে ফিলিং স্টেশন গ্যাস ভরতে পেট্রোল রিফিলিং-এর তুলনায় বেশি সময় লাগে এবং নির্দিষ্ট ফিলিং স্টেশন ছাড়া কাছাকাছি ফিলিং স্টেশন না থাকায় তাদের পক্ষে ট্যাক্সির ন্যায় কমার্শিয়াল ট্রান্সপোর্ট গ্যাস দিয়ে চালানো অলাভজনক হয়ে পড়ে। এরপর অন্য একটি হলুদ ট্যাক্সি কোম্পানির মালিকসহ ড্রাইভারের সাথে ট্যাক্সিতে যাত্রী হিসাবে মহাখালীতে অবস্থিত গ্যাস ফিলিং স্টেশনের দিকে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। পথে আলাপকালে দ্বিতীয় ট্যাক্সির মালিক জানালেন যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানিতে তার একাধিক ট্যাক্সি ক্যাব আছে। তিনি প্রথম ট্যাক্সির মালিকের ন্যায় অনুরূপ অসুবিধার কথা জানালেন। মহাখালীতে অবস্থিত গ্যাস ফিলিং স্টেশনে গ্যাস রিফিলিং-এর জন্য অপেক্ষমাণ গাড়ির লম্বা লাইন চোখে পড়লো। দ্বিতীয় ট্যাক্সির মালিক জানালেন যে, ট্যাক্সি মালিক সমিতিকে গ্যাস ফিলিং স্টেশনের সুযোগ প্রদান করা হলে তারা

যথানিয়মে গ্যাস ফিলিং স্টেশন স্থাপন করে তাদের নিজেদের সমিতির সদস্যদের কাছে অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্যাস বিক্রি করার জন্য গ্যাস ফিলিং-এর ব্যবসা করতে ইচ্ছুক।

বাংলাদেশে সিএনজি প্রযুক্তি ধীরগতিতে সম্প্রসারণের কারণ জানতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হল তার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে যে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানির ন্যায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষে আন্তরিকতার সাথে গ্রাহক সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায় যেহেতু সিএনজি ব্যবহারের চাহিদা বাড়ছে সেকারণে খোলা দরপত্র আহ্বান করে ঢাকা শহরসহ দেশের অন্যান্য যে সকল শহরে গ্যাস পাইপলাইন আছে সে সকল শহরে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে আরপিজিসিএলকে দেয়া দামের সুবিধায় সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অনুমতি দেয়া উচিত। এ ব্যবস্থা প্রচলন করা হলে প্রতিযোগিতার কারণে আরপিজিসিএল-এর সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া প্রাইভেট ওয়ার্কশপকে সিএনজি কনভার্সন ব্যবস্থা চালু করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা উচিত।

১৪.৬ যানবাহনের কারণে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিরসনের প্রচেষ্টা

যানবাহনের কারণে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিরসনের জন্য সরকার অন্যান্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ও করছেন সেগুলো হল রাস্তার সংস্কারকরণ, ঢাকা শহরে রিং রোড এবং সার্কুলার ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থাকরণ, দুইশত দ্বিতল বাস চালুকরণ, বিআরটিএ কর্তৃক গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের সময় অধিক সতর্কতা অবলম্বন, ইকুইপমেন্ট বেইজ্‌ড ইন্সপেকশন ইউনিট চালুকরণ।

ঢাকা শহরে চলমান কোন ধরনের যানবাহন কি পরিমাণে বায়ু দূষণ করে তা নিরূপণ করা প্রয়োজন। এ জন্য বিভিন্ন ধরনের যানবাহন থেকে নতুন অবস্থায় এবং পরবর্তীকালে একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্গত গ্যাসসমূহের বিশ্লেষণ ও পরিমাণ নিরূপণ করা দরকার। পরিবেশ অধিদপ্তর এ বিষয়ে এ তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করার জন্য যানবাহন বাজারজাত কোম্পানিকে নির্দেশ প্রদান করতে পারে অথবা কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করতে পারে।

একটি বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে, জ্বালানি চালিত সকল যানবাহন থেকে কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস ও ওয়াটার ভ্যাপার নির্গত হয় তা স্থানীয়ভাবে পরিবেশ দূষণের কারণ না হলেও গ্রীনহাউস গ্যাস হিসাবে বিশ্বের বায়ু দূষণে প্রভাব ফেলে। তবে বাংলাদেশের মাথাপিছু গ্রীনহাউস গ্যাস নিরসনের পরিমাণ খুবই কম।

১৪.৭ ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ সমস্যা সমাধানের সুপারিশ

ঢাকা শহরে বায়ু দূষণের সমস্যা জ্বালানি এবং যানবাহন ছাড়াও অন্যান্য অনেক সমস্যার সাথে জড়িত। শুধুমাত্র যানবাহনের জ্বালানির মান উন্নয়ন এবং দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিনের উন্নতি সাধন করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। এ জটিল সমস্যা

সমাধানের জন্য একই সাথে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন হবে তা হচ্ছে রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, অবকাঠামোগত, জ্বালানি সংশ্লিষ্ট, প্রযুক্তি সম্পর্কিত, ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয়, আইনগত, আর্থিক, সামাজিক এবং মানবিক। সে কারণে বায়ু দূষণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (FEJB) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং ইউএনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে পরিবেশ রিপোর্টিং-এর উপর আয়োজিত ২ দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ বলেছেন, পরিবেশগত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং এসব সমস্যা সমাধানের উপায়ও জানা আছে কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে আলাউদ্দিনের চেরাগ না থাকায় সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রতা হচ্ছে। রাজধানী ঢাকায় পরিবেশ দূষণের সমস্যা পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরানো। এ সময়ের ব্যবধানে ঢাকার লোকসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সবাই যদি এখনও সতর্ক না হয় তাহলে ঢাকা মহানগরী পরিবেশগত দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে পারে। সভার বিশেষ অতিথি দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এর সম্পাদক জনাব মাহবুবুল আলম পরিবেশগত বিপর্যয়ের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবকে দায়ী করেন। তিনি বলেছেন যে, দুর্নীতির কারণে পরিবেশগত সমস্যা সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সভার অন্য বিশেষ অতিথি বাংলার বাণীর নির্বাহী সম্পাদক জনাব শফিকুল আজিজ মুকুল বলেছেন, পরিবেশকে বাসোপযোগী রাখার পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনীতিকে সুন্দর ও সুস্থ করা। রাজনৈতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পরিবেশগত উন্নয়ন অসম্ভব। সংবাদপত্রে খবরটি পড়ে বিজ্ঞজনদের প্রতিটি উক্তির অন্তর্নিহিত উৎকণ্ঠা ও আক্ষেপ অনুভব করা যায়। এ সকল উক্তি ঢাকা শহরের যানবাহন থেকে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিরসনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা শহরের বায়ু দূষণের সাথে সম্ভাব্য যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সেগুলো হলো : বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ও টেস্টিং ইনস্টিটিউট, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড, পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা), লুব্রিক্যান্ট সরবরাহকারী আন্তর্জাতিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানিসমূহ, পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি, পেট্রোল পাম্পের মালিক, পেট্রোবাংলা, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড, বিভিন্ন ধরনের দুইস্ট্রোক, চারস্ট্রোক-ইঞ্জিন এর আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান, যানবাহনের যন্ত্রাংশ বাজারজাতকরণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে নিয়োজিত রাস্তার পার্শ্বের ওয়ার্কশপসমূহ, বিভিন্ন ধরনের মোটরযানের মালিক সমিতি ও মালিকগণ, বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের চালকগণ এবং তাদের ইউনিয়ন, ব্যাটারি তৈরির প্রতিষ্ঠান, কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান, নন-

গভর্ণমেন্ট অর্গানাইজেশন, বায়ু দূষণ পরিমাপ ও মূল্যায়নে নিয়োজিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ, সুশীল সমাজ, সংবাদ মাধ্যমের সদস্যবৃন্দ, এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়তাদানকারী বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি।

বায়ু দূষণ নিরসনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায় যে সমস্যার সমাধান জানা থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক অথবা ব্যক্তি স্বার্থহানির আশঙ্কায় বিভিন্ন প্রেসার গ্রুপের চাপের প্রভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে। আবার কখনও কখনও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক কারণে এ বিলম্বের জন্য জনগণ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরকে দায়ী করে থাকেন। যদিও তাদের পক্ষে এককভাবে কিছু করার থাকে না। সম্ভবত এ কারণে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব আক্ষেপ করে বলেছেন যে, "আমার কাছে আলাউদ্দিনের চেরাগ না থাকায় সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রতা হচ্ছে"।

ঢাকা শহরের জনগণ বায়ু দূষণের কষ্টে ভুগছেন। এর প্রেক্ষাপটে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে কর্মরত গবেষকদের গবেষণালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণ করে পরিবেশ দূষণের মাত্রা এবং কারণ চিহ্নিত করলেন। সভা-সমিতিতে আলোচনা হলো, সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হলো, জনগণ সচেতন হলো, সরকারের কাছে দাবি আসল এবং আসছে যে বায়ু দূষণরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বহুবিধ সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা হল এবং হচ্ছে। কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা, দীর্ঘসূত্রতার সম্ভাব্য কারণ নীচে আলোচনা করা হলো :

(ক) ঢাকা শহরে পরিকল্পিতভাবে রাস্তা নির্মাণ করা প্রয়োজন : পরিকল্পিতভাবে ঢাকা শহরকে একটি বাসযোগ্য নগরী হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। ঢাকা শহরে সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলের জন্য পরিকল্পিতভাবে উত্তর-দক্ষিণে এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত যথেষ্ট সংখ্যক প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করা হয়নি। ইতোমধ্যে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা নগরীর বিভিন্ন এলাকায় যতটা সম্ভব এবং ভবিষ্যতে যে সকল এলাকায় উপশহর নির্মাণের কাজ চলছে সে সকল এলাকায় পরিকল্পিতভাবে প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আন্তঃনগরীয় যানবাহনের চলাচলের সুবিধার্থে বহুচক্রের রিং রোড (ইনার সার্কুলার রোড, আউটার সার্কুলার রোড, রিং রোড, আউটার রিং রোড ইত্যাদি) নির্মাণ করা উচিত। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ২৩৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ঢাকা শহরের রাস্তা উন্নয়নের জন্য ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের

অধীনে যে কাজ করা হবে তাহল রাস্তার ইন্টারসেকশন, ফ্লাইওভার, ফুটওভার পাস, বাস ও ট্রাক-এর ডিপো এবং পার্কিং-এর স্থান নির্মাণ করা।

(খ) ঢাকা শহরের রাস্তায় রিক্সা চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা : ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোহাম্মদ হানিফ এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, ঢাকা শহরে লাইসেন্স প্রাপ্ত রিক্সার সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার এবং লাইসেন্সবিহীন রিক্সার সংখ্যা আনুমানিক দুই/তিন লক্ষ হতে পারে (মে ২০০০)। অনেক রিক্সার পিছনে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর লাইসেন্স প্লেটের পরিবর্তে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও মালিক সমিতির নম্বর প্লেট দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া লাইসেন্সবিহীন রিক্সা রাস্তায় চলাচল করা সম্ভব নয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহায়তা নিয়ে ঢাকা শহর থেকে প্রথম পর্যায়ে সকল লাইসেন্সবিহীন রিক্সা তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। ঢাকার লাইসেন্সধারী এবং লাইসেন্সবিহীন উভয় ধরনের রিক্সা চালকদের ভোটাধিকার আছে। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বর্তমান মেয়র সাহেব বা তার দল কঠোরতার সাথে ঢাকার রাস্তা থেকে লাইসেন্সবিহীন রিক্সা এবং ভাসমান হকার তুলে দিতে উদ্যোগ নিলে বিপক্ষের রাজনৈতিক দলসমুহ নগরবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে গৃহিত কঠোর সিদ্ধান্তসমূহ নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কাজে লাগাতে পারে। ঢাকার পরিবেশ দূষণ নিরসনের জন্য সকল রাজনৈতিক দলের এ ধরনের উদ্যোগকে সমর্থন দেয়া উচিত। যথেষ্ট সংখ্যক বাস সার্ভিস চালু হলে প্রতিযোগিতার মুখে রিক্সা কমে যাবে বলে অনেকে মনে করেন।

(গ) দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট মোটরযান নিষিদ্ধকরণ : ইঞ্জিন আমদানিকারকদের তদ্বির এবং মালিক, মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান এবং চালকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে ভাল লুব্রিকেটিং তেল, ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিনের পরিবেশ দূষণ নিরসনের অন্তর্বর্তীকালীন প্রচেষ্টা সফল হবে বলে মনে হয় না। যতটা শীঘ্র সম্ভব এ যন্ত্রচালিত যানবাহনটি অন্তত ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা নগরীর জন্য নিষিদ্ধ করা উচিত।

(ঘ) যানবাহন ও ড্রাইভারদের লাইসেন্স প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন : বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) যন্ত্রচালিত যানবাহন ও চালকদের লাইসেন্স প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত। যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সব ধরনের গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট দেয়া উচিত। অনেকের মতে বিশেষ ধরনের গাড়ি যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া ফিটনেস সার্টিফিকেট পায় বলে অভিযোগ শোনা যায়। অকেজো গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট দিলে সে গাড়ি পরিবেশকে দূষিত করতে থাকবে। তেমনিভাবে যন্ত্রচালিত গাড়ির চালকদের গাড়ি চালাবার ক্ষমতা যথাযথ পরীক্ষা করে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা উচিত। নগর ভবনে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে ট্রাফিক পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সভায় জানিয়ে ছিলেন যে, ঢাকা শহরের রাস্তায় চলমান বেবি ট্যাক্সিগুলোর চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা কালে দেখা গেছে শতকরা ৯০ ভাগই নকল।

(ঙ) রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ : সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ঢাকা শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিলে যানজট কম হতে দেখা যায়। পুরাতন ঢাকার রাস্তায় স্থানীয় জনগণকে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়। ট্রাফিক পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ যাতে দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন সে বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যথাযথভাবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে যানবাহনের গতিময়তা বজায় রাখা হলে স্বল্প মেয়াদকালে বায়ু দূষণ নিরসনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখতে পারবে। ঢাকা শহরে চলাচলকারী সরকারি এবং প্রাইভেট কারের সংখ্যা এবং পিক আওয়ারে আসন খালি রেখে গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হলে কিছুটা হলেও পরিবেশ দূষণ কমবে। ঢাকা শহরে যারা কারে চলেন তারা হলেন সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী নাগরিক। কোন রাজনৈতিক সরকার এ গোষ্ঠীর স্বার্থের বা সুবিধার পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহজে রাজি হন না। শহরের কেন্দ্রের নির্দিষ্ট এলাকা সম্পূর্ণভাবে মোটরযান মুক্ত করে শুধুমাত্র রিক্সা এবং পায়ে হাঁটার ব্যবস্থা করলেও বায়ু দূষণ কিছুটা কমবে। ঢাকার রাস্তায় বাণিজ্যিকভাবে চলাচলকারী যানবাহনের মালিকগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের একজন প্রভাবশালী সদস্যকে সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করেন। নীতিগত সুবিধা পাওয়ার কৌশল হিসাবে যানবাহনের মালিকগণ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন বলে ধারণা করা হয়। এ কারণে সকল ধরনের বাণিজ্যিক যানবাহন চলাচলের পথ ও সময় নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সদস্যদের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রয়োজন হবে।

(চ) ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিবেশ দূষণের মাত্রা পরিমাপ ও মনিটর করার ব্যবস্থাকরণ : ইতিপূর্বে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিবেশ দূষণের যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। শহরের নির্বাচিত স্থানে বায়ু দূষণের বিভিন্ন উপাদান ক্রমাগতভাবে পরিমাপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া রাস্তায় চলাচলকারী বিভিন্ন যানবাহনের বায়ু দূষণের মাত্রা পরিমাপের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে পরিবেশ দূষণ নিরসন সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রভাব যথাযথভাবে মনিটর করা সম্ভব হবে না। বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে বাস্তবায়িত এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা এবং চট্টগ্রাম শহরের বায়ু দূষণের মাত্রা পরিমাপের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উপরোক্ত প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও যাতে এ ব্যবস্থাগুলো বিদ্যমান থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

BPC সীসামুক্ত গ্যাসোলিন বাজারজাত করার ফলে ঢাকার মানুষ সীসা দূষণ থেকে আপাততঃ মুক্তি পেয়েছে এটা আশা করা যায়। তবে নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এছাড়া সীসামুক্ত গ্যাসোলিন বাজারজাত করার ফলে সীসার ন্যায় অথবা সীসার চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক অন্য কোন বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হচ্ছে কিনা সে বিষয়টিও নিয়মিতভাবে মনিটর করা প্রয়োজন। পরিবেশ অধিদপ্তরের এ বিষয়ে

ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সীসামুক্ত গ্যাসোলিন বাজারজাত করার ফলে জ্বালানি ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট মানের এবং গুণসম্পন্ন গ্যাসোলিন পাচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে বিএসটিআই-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সীসাযুক্ত গ্যাসোলিন ব্যবহার করার সময় গাড়িতে ক্যাটালাইটিক কনভারটার লাগালে সীসার উপস্থিতির কারণে উক্ত কনভারটার কার্যকর হতো না। বর্তমানে সীসামুক্ত গ্যাসোলিন বাজারজাত করা শুরু হওয়ায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্যাসোলিন চালিত গাড়িতে ক্যাটালাইটিক কনভারটার লাগানোর নিয়ম করা উচিত। একই সাথে ডিজেল চালিত গাড়ীতে ডিজেল পার্টিকুলেট ফিলটার লাগাবার নিয়ম প্রচলন করা উচিত।

ঢাকা শহরের পরিবেশ দূষণ নিরসনের সাথে অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ নিরসন করতে হলে সরকারকে, যানবাহনের চালককে এ জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে। যদি তা না করেন অথবা করতে গড়িমাসি করেন তবে শেষ ধাপে গিয়ে জনগণকে এর পরিণাম ভুগতে হবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া যত দেরী হবে জনগণের ভোগান্তি তত বাড়বে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব-এর ভাষায় সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ঢাকা নগরী পরিবেশগত দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে পারে। যা কারও কাম্য নয়। সবশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, পরিবেশ দূষণ নিরসনের বিভিন্ন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হলে একদিকে ঢাকা শহরের পরিবেশের উন্নতি হবে এবং অন্যদিকে জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

১৪.৮ দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন চালু রাখার চেষ্টা

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে বেবিটেক্সী থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ার কারণে স্বাস্থ্যহানির জন্য বছরে ৬০ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে । এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিশ্বব্যাংক ঢাকায় ৪০০ বেবিটেক্সী মেকানিককে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। জ্বালানি খাত ব্যবস্থাপনা সহায়তা কর্মসূচি (ESMAP) বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ বিষয়ক এনজিও "নগর পরিবেশ রক্ষা সমিতি" এবং "উত্তরা মটরস" এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া পরিবেশ ইউনিটের পরিবেশ বিষয়ক উর্দ্ধতন প্রকৌশলী জনাব জিতেন্দ্র শাহ্ উপরোক্ত প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন যে, মেকানিকদের এ প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হচ্ছে বেবিট্যাক্সী থেকে নির্গত ধোঁয়ার মাত্রা দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে হ্রাস করা এবং দূষণের প্রধান শিকার দরিদ্র মানুষের ওপর বায়ু দূষণের চাপ কমানো। বেবিট্যাক্সী চালকেরা রাস্তায় খোলা গাড়িতে দিনে ১০-১৫ ঘন্টা কাটান বলে তাদের দুর্ভোগ সবচেয়ে বেশি এবং আক্ষরিক অর্থে বায়ু পরিষ্কারের জন্য তারা তাদের ফুসফুস ব্যবহার করছেন। গাড়ির নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ না হলে তা থেকে বায়ু দূষণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। ঢাকা শহরে প্রায় ৫০,০০০ বেবিট্যাক্সী রয়েছে; এর অধিকাংশই দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট। ঢাকায় চলাচলকারী বিভিন্ন যানবাহন থেকে বাতাসে মোট যে পরিমাণ দূষিত পদার্থ নির্গত হয় তার ৩৫ শতাংশ এসব দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন থেকে নির্গত হয়। তা সত্ত্বেও

দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট বেবিট্যাক্সিগুলো নিষিদ্ধ করা রাতারাতি সম্ভব নয় (খবর পড়ে বুঝা যায় নি যে বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তা জনাব জিতেন্দ্র শাহ এ অভিমত দিয়েছিলেন কিনা)। বিশ্বব্যাংকের পেট্রোকেমিক্যাল বিশেষজ্ঞ মাসামি কোজিমা বলেছেন, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন থেকে এত দূষণের কথা নয়। তাই শিল্পোন্নত দেশসমূহে এগুলো নিষিদ্ধ করা হয়নি। তিনি উদাহরণরূপে উল্লেখ করেন যে, জাপানে বেশ বড় সংখ্যক দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন রয়েছে কিন্তু এগুলো থেকে ঢাকার মত এতটা ধোঁয়া নির্গত হয় না। এর কারণ হলো এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ভাল এবং এগুলোয় যথামাত্রার নির্দিষ্ট পরিমাণ লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার করা হয়। বেবিট্যাক্সির সুষ্ঠু পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিয়মিত সম্পন্ন করলে নির্গত ধোঁয়া ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিনের জন্য নির্ধারিত লুব্রিক্যান্ট অয়েল সঠিক পরিমাণে ব্যবহার করা হলে চালকদের অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না। বর্তমানে বেবিট্যাক্সির চালকেরা পেট্রোলের সঙ্গে চারস্ট্রোক-ইঞ্জিনের লুব্রিক্যান্ট অয়েল প্রায় ১০ শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করে। কিন্তু তারা দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিনের জন্য নির্ধারিত মান সম্পন্ন লুব্রিক্যান্ট অয়েল মাত্র ৩ শতাংশ ব্যবহার করে লুব্রিক্যান্ট কেনার খরচ ও ধোঁয়ার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারবে।

উপরে বর্ণিত খবরটি পড়ে আমার মনে যে প্রশ্নগুলো জেগেছে তা সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলো। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত বেবিট্যাক্সির মেকানিকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য কি ঢাকার রাস্তায় দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিনের যানবাহন ২০০২ সালের পরেও দীর্ঘস্থায়ী করা? তা যদি হয় তবে এটা কার স্বার্থে? জানামতে বাংলাদেশে যে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন ব্যবহৃত হয় তা নিকটবর্তী দেশ ভারত থেকে আমদানি করা হয় এবং ভারতে পরিবেশগত কারণে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন যদি ভাল হবে তাহলে ভারতে নিষিদ্ধ করা হল কেন? বিশ্বব্যাংকের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তারা কি এ খবরটি রাখেন না? বিশ্বব্যাংকের পেট্রোকেমিক্যাল বিশেষজ্ঞ দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহনের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে জাপানের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং আবহাওয়াগত পার্থক্যের কারণে বাংলাদেশের অবস্থার সাথে জাপানের অবস্থা তুলনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য আইনগত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ প্রকল্পে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট-এর ভূমিকা কি তা জানার ইচ্ছা রইল। উত্তরা মোটর বাংলাদেশে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহনের আমদানিকারক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অজুহাতে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহনের অবস্থান দীর্ঘায়িত হলে তারা ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হবে। কিন্তু পরিবেশগত অবস্থার উন্নতি না হলে সারা ঢাকাবাসীর দুর্ভোগ বাড়বে।

১৪.৯ দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট মোটরযানে সিএনজি ব্যবহারের চেষ্টা

ঢাকা শহরে বায়ু দূষণের মাত্রা কমানোর লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর; বাংলাদেশ সরকার ও কানাডীয় দাতা সংস্থা সীডার অর্থানুকূল্যে বাস্তবায়িত বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট প্রজেক্ট (BEMP)-এর আওতায় দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট বেবিট্যাক্সিতে কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (CNG) ব্যবহারের জন্য একটি পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রথম ধাপে (জুন ২০০০) উত্তরা মোটরস লিমিটেডের তেজগাঁও ওয়ার্কশপে ৪টি বেবিট্যাক্সিতে সিএনজি দিয়ে চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করে পরীক্ষামূলকভাবে রাস্তায় চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রকল্পে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশের কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি, ঢাকা সিটি অটোরিক্সা বিজনেস ওনার্স এসোসিয়েশন, উত্তরা মোটর লিমিটেড এবং কানাডার এনভারনমেন্ট কানাডা ও ইউগো-টেক কনভারশন গ্যাস সিসটেমস্ ইনক। সিএনজিতে রূপান্তরিত করার মূল লক্ষ্য হল পেট্রোল ও লুব অয়েলের ব্যবহার আলাদা করা। একটি পেট্রোল চালিত বেবিট্যাক্সিকে পেট্রোল ও সিএনজি দিয়ে চালাবার জন্য অতিরিক্ত যে সকল যন্ত্রাংশ সংযোজন করতে হয় তা হলো একটি সিএনজি সিলিন্ডার, শাট অব ভালভ, একটি প্রেসার গেজ, স্টীলের তৈরি সরু গ্যাস সরবরাহ পাইপ, ফুয়েল মিকচার, একটি মেকানিকেল অয়েল ইনজেকশন পাম্প এবং একটি পেট্রোল শাট অব ভালভ। পেট্রোল ও সিএনজি উভয় ধরনের জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ রাখার ফলে যে কোন সময় গ্যাস শেষ হয়ে গেলে পেট্রোল ব্যবহার করে বেবিট্যাক্সি চালানো সম্ভব। একটি পেট্রোল চালিত বেবিট্যাক্সিতে সিএনজি ব্যবহারের প্রযুক্তি সংযোজন করতে আনুমানিক ২৫,০০০ টাকা খরচ পড়ে। উদ্যোক্তাদের হিসাব অনুসারে একটি বেবিট্যাক্সি গড়ে বছরে ৬০,০০০ কিলোমিটার (২০০ কিমি × ৩০০ দিন) চললে ৩,০০০ লিটার পেট্রোল খরচ হয়। প্রতি লিটার ২১ টাকা হিসাবে ৩০০০ লিটার বছরে পেট্রোল ক্রয় করা বাবদ খরচ পড়ে ৬৩,০০০ টাকা। অন্যদিকে সিএনজি দিয়ে চালালে বছরে খরচ পড়ে ২৯,২৫০ টাকা। উপরোক্ত হিসাব মতে বছরে সিএনজি ব্যবহারের ফলে জ্বালানি খাতে বছরে ৩৩,৭৫০ টাকা এবং মাসে ২,৮১২ টাকা খরচ বাঁচবে। একটি বেবিট্যাক্সিকে সিএনজি ব্যবহার উপযোগী করতে এককালীন ২৫,০০০ টাকা খরচ পড়ে। সেক্ষেত্রে একনাগাড়ে প্রায় ৯ মাস (২৫,০০০ ÷ ২,৮১২) সিএনজি ব্যবহার করা সম্ভব হলে সিএনজি ব্যবহার উপযোগী করার বিনিয়োগ ওঠে আসবে। উদ্যোক্তারা বেবিট্যাক্সির পাইলট প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আরও ১০০টি বেবিট্যাক্সি সিএনজি চালাবার উপযোগী করার পর পরবর্তীতে সিএনজি চালিত বেবিট্যাক্সির বহুল প্রচলনের পরিকল্পনা করছে।

BEMP প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের তথ্য অনুসারে কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানির উদ্যোগে আগস্ট ২০০০ সালে জোয়ারসাহারায় ১টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং ২০০০ সালের মধ্যে ঢাকা শহরে আরও ১০টি নতুন সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপিত হওয়ার কথা বেবিট্যাক্সিসহ ঢাকার রাস্তায় চলাচলকারী এবং সিএনজি

ব্যবহারে আগ্রহী মোটরযানের মালিকদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি আশার খবর এবং দেশের জন্যও মঙ্গলজনক। বেম্প প্রকল্পের উদ্যোক্তারা বেবিট্যাক্সিতে সিএনজি ব্যবহারের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করার ব্যাপারেও চিন্তা করেছিলেন। থ্রি-হুইলারের সিএনজি ব্যবহারের উপযোগী করে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থমন্ত্রী বাজেটে সহজ শর্তে ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের কথা বলেছেন। সিএনজি করভার্সনের জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের সুবিধা শুধুমাত্র বেবিট্যাক্সির জন্য সীমিত না রেখে সকল ধরনের মোটরযানকে এ সুবিধা প্রদান করা উচিত।

BEMP প্রকল্পের উদ্যোক্তারা আশা করছেন যে, দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিনে সিএনজি ব্যবহার করা হলে ঢাকা শহরে বাতাসের মান উন্নয়ন উপভোগ করা যাবে। এ বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। বেবিট্যাক্সিতে সিএনজি প্রচলন একটি নতুন প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে যথেষ্ট সময় লাগবে। সে সময়সীমা বেম্প প্রকল্পের জীবনকালের চেয়ে বেশি হলে, বেম্প প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্প মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হয়ে গেলে ব্যবহারকারীদের আগ্রহ কমে যাবে। যতটা জানা যায় ২০০৪ সালে বেম্প প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। এ সময়ের মধ্যে বাস্তবে কতটুকু সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে সে বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের সফলতার টার্গেট ঠিক করা উচিত। এ ছাড়া ঢাকা শহরের ৫০,০০০ বেবিট্যাক্সি সিএনজি ব্যবহার শুরু করলেও অন্যান্য মোটরযানের সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের কারণে সে সুফল সহজে অনুভব কেন এমনকি পরিমাপ করাও সম্ভব হবে না। সিএনজি চালিত বেবিট্যাক্সির বহুল প্রচলনে বাস্তবে অনেক প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একটি পেট্রোল চালিত বেবিট্যাক্সিকে সিএনজি ব্যবহার উপযোগী করতে ২ জন টেকনিশিয়ানের প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে মোট ৪ শ্রমঘন্টা সময় লাগে। ৪ জন টেকনিশিয়ানের একটি ওয়ার্কশপে প্রতিদিন (৮ ঘন্টায়) মোট ৮টি বেবিট্যাক্সিতে যন্ত্রাংশ লাগানো সম্ভব হবে। এ ধরনের একটি ওয়ার্কশপে বছরে (৩০০ দিনে) মোট ২৪০০ বেবিট্যাক্সিতে যন্ত্রাংশ লাগাতে পারবে। ৫০,০০০ বেবিট্যাক্সিতে যন্ত্রাংশ লাগাতে কয়টি ওয়ার্কশপের কত সময় লাগবে তার হিসাব ওয়ার্কশপের মালিকদের জন্য রেখে দেয়া হল। ঢাকা শহরে সমসুযোগে সকল সিএনজি স্টেশনে সকল ধরনের মোটরযানের জন্য সিএনজি ফিলিংয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে ডাবল ডেকার বাস, বাস, গাড়ির অপেক্ষমান লম্বা লাইনে বেবিট্যাক্সি কতটুকু সহানুভূতি পাবে তাও ভেবে দেখা উচিত।

১৪.১০ দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট মটরযান আমদানি নিষিদ্ধ করণ

অর্থমন্ত্রী তার ২০০০-২০০১ বছরের বাজেটে পরিবেশ দূষণকারী দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি-হুইলার যানবাহন (টেম্পু, অটোরিক্সা ইত্যাদি) ও ইঞ্জিনসহ চেসিস-এর আমদানি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেছেন। বাজেটে বলা হয়েছে যে, পরিবেশ

মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ ও সুশীল সমাজের প্রবল দাবি বিবেচনা করে ঢাকা এবং অন্যান্য শহরকে মারাত্মক পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। তবে বর্তমানে দেশে ব্যবহৃত দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি-হুইলার যানবাহনের চালকরা এ বিধানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরং পরিবেশ দূষণ রোধের বৈধভাবে আমদানিকৃত ও রেজিস্ট্রিকৃত ডিজেল ও পেট্রোল চালিত থ্রি-হুইলারকে সিএনজি যন্ত্রে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে উক্ত রূপান্তরের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্তে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। অর্থমন্ত্রী বাজেটে আরও প্রস্তাব করেছেন যে, গণপরিবহনের সুবিধা সম্প্রসারণ কল্পে শুধু সিএনজি চালিত ডাবল ডেকার বাসের আমদানিতে মূল্য সংযোজন করসহ যাবতীয় শুল্ক প্রত্যাহার এবং শুধু সিএনজি চালিত ৪০ বা তদূর্ধ্ব সিটের সাধারণ বাসের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ব্যতিত অপরাপর সকল শুল্ককর প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর মতে, এই পদক্ষেপ গণপরিবহন ব্যবস্থার সন্তোষজনক উন্নয়নের সাথে সাথে দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যাহারের মাধ্যমে জ্বালানি তেল আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্রয় ঘটবে। বাজেটে বায়ু দূষণরোধে ১৫.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জ্বালানি খাতে পরীক্ষামূলকভাবে একটি সিএনজি প্রকল্প গ্রহণ করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যানবাহন থেকে সৃষ্ট বায়ু দূষণের মাত্রা এবং আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সিএনজি চালিত মোটরযান প্রচলনে সরকারের গৃহিত ব্যবস্থা প্রশংসনীয়।

বাজেটে শুধু সিএনজি চালিত দোতালা বাস আমদানিতে মূল্য সংযোজন করসহ যাবতীয় শুল্ককর প্রত্যাহার এবং শুধু সিএনজি চালিত ৪০ বা তদুর্ধ সিটের বাসের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ব্যতিত অপরাপর শুল্ককর প্রত্যাহার করা হয়েছে। শুল্ককর নির্ধারণের সময় "শুধু সিএনজি চালিত" কথার ব্যাখ্যা নিয়ে আমদানিকারক এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে। সিএনজি চালিত যানবাহনগুলো শুধুমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাসে চালিত গাড়ি নয়। বাস্তবে সিএনজি ও ডিজেল অথবা সিএনজি ও পেট্রোল চালিত যানবাহন। দ্বৈত জ্বালানি থাকার সুবিধা হল যে, যখন সিএনজি সিলিন্ডার খালি হয়ে যায় তখন তরল জ্বালানি (পেট্রোল/ডিজেল) দিয়ে গাড়ি চালাবার সুযোগ থাকে। সিএনজি চালিত গাড়িতে তরল জ্বালানি দিয়ে গাড়ি চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় তেলের ট্যাংক ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ এবং অতিরিক্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের সিলিন্ডার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ থাকে। এমতাবস্থায় "শুধু সিএনজি চালিত" বাক্যের পরিবর্তে "সিএনজি ব্যবহার উপযোগী যন্ত্রাংশ সম্বলিত" প্রতিস্থাপিত করা হলে সংশ্লিষ্ট সকলের বুঝার সুবিধা হবে। বাজেটে দুইস্ট্রোক-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন ও ইঞ্জিনসহ চেসিস আমদানি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ইতোমধ্যে যে সকল যানবাহন এবং চেসিস আমদানি করা হয়েছে সেগুলোর রেজিস্ট্রেশন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া উচিত। তা নাহলে অস্বীকৃত পথে আমদানি করা গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন চলতে থাকতে পারে।

১৫

ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা

বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জ্বালানি সমস্যা সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, বইয়ে আলোচিত বিষয়গুলো জ্বালানি সমস্যার জটিলতা সম্বন্ধে পাঠককে বুঝতে কিছুটা সহায়তা করবে। বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে করণীয় কিছু বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১৫.১ এনার্জি খাতের উন্নয়নে জাতীয় সমঝোতা

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচির আওতায় এনার্জি খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এনার্জি খাতের সাসটেইনেবল উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় সমঝোতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। জাতীয় সমঝোতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এনার্জি খাতের নীতিগত এবং উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ জাতীয় সংসদে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

১৫.২ এনার্জি খাতের তথ্য ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন

স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তার সাথে এনার্জি সেক্টরের দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য নির্ভরশীল তথ্য ব্যবস্থা (তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, প্রকাশনা) সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বর্তমানে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং প্রয়োজনে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করার প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য জ্বালানির ব্যবহার, ভবিষ্যতে জ্বালানির চাহিদা এবং জ্বালানির উৎস সমূহের নির্ভরযোগ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা উচিত।

১৫.৩ বায়োমাস জ্বালানির ব্যবহার

বাংলাদেশে বায়োমাস জ্বালানির ব্যবহার আগামীতে অনেক বছর চলবে। বায়োমাস জ্বালানির সমস্যা সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত। দেশের অধিকাংশ জনগণ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষ এ সমস্যায় সবচেয়ে বেশি জর্জরিত। এ সমস্যা সমাধানের জন্য একই সাথে বায়োমাসের সরবরাহ বৃদ্ধি, বায়োমাস সংরক্ষণ এবং বায়োমাসের পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি প্রচলনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বায়োমাসের

সরবরাহ বৃদ্ধির (বৃক্ষায়ণ) সম্ভাবনা প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত এবং গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। গৃহীত ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। বায়োমাস জ্বালানি সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে বায়োমাস সরবরাহ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার সাথে অধিকতর আন্তরিকতার সাথে বায়োমাস সংরক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে উন্নত চুলা, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি এবং বায়োমাস ব্রিকোয়েটিং প্রযুক্তি প্রচলনের বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যথাযথভাবে বায়োমাস জ্বালানির পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য এলাকাভিত্তিক (উপজেলা/জেলা) এনার্জি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত।

১৫.৪ জ্বালানি তেলের ব্যবহার

প্রতি বছর আমদানিকৃত জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের জন্য দক্ষ জ্বালানি প্রযুক্তি (efficient energy technology) এর ব্যবহার বৃদ্ধি এবং আমদানিকৃত জ্বালানি তেলের পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন। মোটরযানে জ্বালানি তেলের পরিবর্তে কমপ্রেসড্ ন্যাচারাল গ্যাস (CNG) ব্যবহারের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং এ বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করা উচিত। জ্বালানি তেল খাতের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে একটি হোল্ডিং কোম্পানি করা উচিত। জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের কাছে ন্যস্ত করা উচিত।

১৫.৫ প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

দীর্ঘমেয়াদকালে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদকালের (চল্লিশ/পঞ্চাশ বছরের) জ্বালানি চাহিদা মিটাবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষিত রাখার জন্য সংসদে আইন পাশ করা উচিত। ইতোমধ্যে দুই দফায় দেশের মোট ২৩টি ব্লকের মধ্যে ১২টি ব্লকে হাইড্রোকার্বন উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং ৩টি ব্লকে পিএসসি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ব্লক ইজারা দেয়া উচিত ছিল। ভবিষ্যতে ব্লক ইজারা দেওয়ার সময় এ বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেয়া উচিত। দেশীয় কোম্পানি বাপেক্সকে হাইড্রোকার্বন উন্নয়ন কর্মসূচিতে সচল রাখার লক্ষ্যে কিছু সম্ভাবনাময় ব্লক (আইওসি কর্তৃক ১২, ১৩, ১৪ নং ব্লকের ছেড়ে দেয়া অংশ) সংরক্ষিত রাখা উচিত। বাপেক্সকে বছরে অন্তত ৪টি কূপ খননের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান,

বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য অধিকার প্রদান, প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান করা উচিত।

গ্যাস সেক্টরে দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য পেট্রোবাংলাকে একটি হোল্ডিং কোম্পানি করা উচিত এবং সে কাঠামোর অধীনে পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনা বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা উচিত। গ্যাস সেক্টরের বিদ্যমান সিস্টেম লস হ্রাস করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নের জন্য দেশের নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের কাছে ন্যস্ত করে যথাযথভাবে মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা করা উচিত।

১৫.৬ কয়লার ব্যবহার

যতটা শীঘ্র সম্ভব বড়পুকুরিয়া কয়লার খনি চালু করার ব্যবস্থা করা উচিত এবং একই সাথে উত্তোলিত কয়লার যথাযথ ব্যবহারের জন্য তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার ব্যবস্থা করা উচিত।

১৫.৭ হাইড্রোপাওয়ার ব্যবহার

বাংলাদেশে মোট হাইড্রোপাওয়ার উৎপাদনের সম্ভাবনা ৭৫৫ মেগাওয়াট এর মধ্যে কাপ্তাইতে ২৩০ মেগাওয়াট হাইড্রোপাওয়ার উৎপাদনের ব্যবস্থা চালু আছে। বর্তমানে চালু কাপ্তাই হাইড্রোপাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত-আর্থসামাজিক সমস্যার কারণে ভবিষ্যতে কাপ্তাই হাইড্রোপাওয়ার প্লান্টের সম্প্রসারণ এবং সাঙ্গু ও মাতামহুরীতে নতুন হাইড্রোপাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা উচিত।

১৫.৮ বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার

বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ খাতের (জেনারেশন, ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন) ইউনিটগুলোতে আলাদা আলাদা কোম্পানির অধীনে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা উচিত। বিদ্যুৎ সেক্টরের বিদ্যমান সিস্টেম লস কমিয়ে আনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হলে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রেগুলেটরি কমিশনের কাছে ন্যস্ত করা উচিত।

১৫.৯ দেশের দু-অঞ্চলের জ্বালানি বৈষম্য

দেশের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান জ্বালানি প্রাপ্যতার বৈষম্য দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ উদ্দেশ্যে পাইপলাইনের মাধ্যমে সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালনের ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারণ করা উচিত।

পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থানে পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা উচিত। বড়পুকুরিয়া কয়লার খনি চালু করার ব্যবস্থা করা উচিত। সেচের মৌসুমে ডিজেলের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

১৫.১০ গ্রামাঞ্চলের জ্বালানি সরবরাহ

রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (REB) এর তত্ত্বাবধানে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলের মোট জ্বালানি চাহিদার একটি ক্ষুদ্র অংশ বিদ্যুতের মাধ্যমে মিটানো সম্ভব। অন্যদিকে জাতীয় বৈদ্যুতিক গ্রীড লাইনের মাধ্যমে সারাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণ করা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। এমতাবস্থায় গ্রামাঞ্চলের সার্বিক জ্বালানি চাহিদা মিটানো এবং স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বিচিছন্ন গ্রামাঞ্চলের (isolated village) বিদ্যুতের চাহিদা মিটাবার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। এলাকভিত্তিক এনার্জি উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে উপরোক্ত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করা উচিত।

১৫.১১ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্বালানি সমস্যা

অন্যান্য সমস্যার সাথে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জ্বালানি সমস্যা প্রকট। গতানুগতিক চিন্তাধারায় প্রণীত জ্বালানি উন্নয়ন কর্মসূচি দরিদ্র মানুষের জ্বালানি সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্বালানি সমস্যা নিরসনের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বিকল্প প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শহরের বস্তিবাসীদেরকে রান্নার জন্য সাবসিডি ছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব। টেলিফোনের বিলের ন্যায় সকল গৃহস্থালী বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর জন্য প্রতি মাসে ন্যূনতম নির্ধারিত (fixed) বিদ্যুৎ চার্জ এবং গরিব ব্যবহারকারীদের জন্য প্রথম ৫০ ইউনিটের জন্য সর্বনিম্ন বিদ্যুৎ ট্যারিফ হার প্রবর্তন করা হলে গরিব মানুষরা উপকৃত হবে।

১৫.১২ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরসন

জ্বালানি সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রম (উত্তোলন, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, ব্যবহার) পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী আমাদের দেশে প্রযুক্তিগত পশ্চাদপদতা এবং অর্থনৈতিক কারণের জন্য জ্বালানি সেক্টরের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরসনের বিষয়ের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেয়া হয় না। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সাসটেইনেবল করার জন্য যতটা সম্ভব পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কোন কারণে পরিবেশ (ভূমি, পানি ও বাতাস) দূষিত হলে তা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। দেশের মানুষকে জানাবার জন্য মাগুরছড়া গ্যাস ক্ষেত্রের দুর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করা উচিত।

১৫.১৩ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং ও গবেষণা

জ্বালানি সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন লেভেলের কর্মকর্তাদের জন্য যথোপযোগী ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা উচিত। পরিকল্পিতভাবে গৃহীত গবেষণা কার্যক্রম জ্বালানি সেক্টরের উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। জ্বালানি সেক্টরের নিয়মিত ব্যয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা খাতে ব্যয় করা উচিত।

১৫.১৪ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন প্রতিষ্ঠাকরণ

বিভিন্ন ধরনের এনার্জির (তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ) মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এনার্জি রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান (NEA) স্থাপন করা উচিত। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন গঠনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং পরিচালনা পদ্ধতি স্টাডি করা যেতে পারে।

১৫.১৫ রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি স্থাপন

বিভিন্ন ধরনের রিনিউয়েবল এনার্জি কর্মসূচিতে ক্রমাগতভাবে অর্থায়নের জন্য রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (REDA) স্থাপন করা উচিত।

BIBLIOGRAPHY

Anon (1997)
Report of the National Gas Pricing Formulation Committee (Final Draft), Ministry of Energy and Mineral Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh, April 1997.

Anon (1995)
The Domestic Natural Gas and Oil Initiative, First Annual Progress Report, US Department of Energy, February 1995.

Anon (1992)
New Directions: Natural Gas Supply, Natural Gas Council, USA, October 1992.

Anon (1991)
Report of the Task Force on Bangladesh Development Strategies for the 1990's, Developing he Infrastructure (Volume 3), The University Press Ltd. 114 Motijheel C/A, Dhaka, 1991.

BPDB (1995)
Power System Master Plan-Bangladesh, Final Report, Volume 1-3, Prepared by Acres International Ltd. Asian Development Bank, TA No. 1962-BAN, Directorate of System Planning, Bangladesh Power Development Board (BPDB), August 1995

Brown, I.A., Shamsuddin, A.H.M., Rickard, M.J. (2001)
Hydrocarbon Resource Base of Bangladesh, Proceeding of the 13th Southeas Asia Petroleum Exploration Society (SEAPEX) Exploration Conference, Tangling, P.O. Box 423, Singapore 912415.

Cookson, F.E. (2000)
Issues in Energy Pricing, Paper Presented in a Seminar Organized by Institute of Management Consultants Bangladesh, Hotel Sonargaon, Dhaka, 4 October 2000.

The Economist (2001)
A Survey of Energy, A Brighter Future ? The Economist, London, 10 February 2001.

FERC (1996)
1996 Annual Report, Federal Energy Regulatory Commission, Washington DC., USA, 1996.

GOB (2001)
1999 Statistical Year Book of Bangladesh, Twentieth Edition, Bangladesh Bureau of Statistics, Government of the People's Republic of Bangladesh, May 2001.

GOB (1999)
1998 Statistical Year Book of Bangladesh, Nineteenth Edition, Government of the People's Republic of Bangladesh, 1999.

GOB (1998)
Household Expenditure Survey 1995-96, Bangladesh Bureau of Statistics, Government of the People's Republic of Bangladesh, April 1998.

GOB (1998a)
1997 Statistical Year Book of Bangladesh, Eighteenth Edition, Bangladesh Bureau of Statistics, Government of the People's Republic of Bangladesh, September 1998.

GOB (1996)
National Energy Policy, Bangladesh Gazette, Ministry of Energy and Mineral Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh, 6 January, 1996.

GOB (1996a)
Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh, Ministry of Energy and Mineral Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh, October, 1996.

GOB (1994)
1993 Statistical Year Book of Bangladesh, Fourteenth Edition, Bangladesh Bureau of Statistics, Government of the People's Republic of Bangladesh, April 1994.

GOB (1991)
1991 Statistical Year Book of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics, Government of the People's Republic of Bangladesh, November 1991.

GOB (1990)
The Constitution of the People's Republic of Bangladesh (As Modified up to 30th June, 1988) Published by Government Printing Press, 1990.

GOB (1989)
1989 Statistical Year Book of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics, Government of the People's Republic of Bangladesh, June 1989.

GOB (1976)
Bangladesh Energy Study, Administered by Asian Development Bank, Under UNDP Project, BGD/73/038/B/01/45, Prepared by Montreal Engineering, Meta System Inc., Snamprogetti, S.p.A, C.Lotti and Associati S.P.A., November 1976.

GOB (1973)
The First Five Year Plan (1973-78), Government of the People's Republic of Bangladesh, 1973.

Hammonds, M. (2000)
Solar Photovoltaic Business: Has Its' Time Arrived ? Oil and Gas Journal, Penn Well Publishing Co. Tulsa, USA, July 10, 2000.

Hammond, A.L. (Editor in Chief) (1990)
World Resources 1990-91, A Report by the World Resource Institute in Collaboration with the United Nations Environment Program and The United Nations Development Programme, Oxford University Press, 1990.

Islam, M. Nurul (2001)
Energy Security and Sustainable Human Development: Bangladesh Perspective, Paper presented at the Regional Conference of Human Security in South Asia, Jointly Organized by Institute of peace and Conflict Studies (IPCS), New Delhi, India and Bangladesh Institute o International and Strategic (BIISS), Dhaka, Bangladesh IIC, New Delhi, India, 10-11 January, 2001.

Islam, M. Nurul (2000)
Energy Security Issues of Bangladesh, Engineering News, 26th years, 1st issue, Engineers Institution Bangladesh, February 2000.

Islam, M. Nurul (2000a)
Some Observations on Global Energy Scenario and Critical Issues in Energy Development of Bangladesh, Journal of Institution on Engineers, Bangladesh, Multidisciplinary, Vol. Mul-dis, 25, No. 1, December 2000.

Petrobangla (2001)
Natural Gas Demand and Supply Forecast: Bangladesh, Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation (Petrobangla), Petrocentre, 3 Kawran Bazar, Dhaka, 15 March 2001.

Petrobangla (1997)
Model Production Sharing Contract, Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla), Petrocentre, 3 Kawran Bazar, Dhaka, March 1997.

Petrobangla & USGS (2001)
US Geological Survey-Petrobangla Cooperative Assessment of Undiscovered Natural Gas Resources of Bangladesh, January 2001.

Rodekohr, M. (2001)
Natural Gas Demand Growth Analysis of Bangladesh, Presented at the Workshop on Energy Statistics and Analysis, Organized by Petrobangla and USAID with the support of Energy Information Administration (EIA), Department of Energy, USA held at Petrobangla 10-13 June 2001.

Sadler, C. and Sahai, I.M. (2000)
Unlocking South Asia's Polential, Asian Power, December 1999/January 2000.

Schaffer, T.C. and Arora, H.S. (2000)
Bangladesh: Energy and Development: The Lessons of Experience, Centre for Strategic and International Studies, Washington DC, June 2000.

Shell (1999)
Gas Utilization Options, Presentation to H.E. The Prime Minister of Bangladesh, September 1999.

Simpson, T.(1998)
International Energy Statistics Source Book, OGJ Energy Database. Box 21288, Tulsa, OK 74121, USA, October 1998.

TERI (2000)
TERI Energy Data Directory and Year Book 2000/2001, Tata Energy Research Institute, Darbari Seth Block, Habitat Place, Lodhi Road, New Delhi, India, 2000.
UNCTAD (1995)
Comparative Analysis of Petroleum Exploration Contracts, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva, UNCTAD/DTCI/21, May 1995.

UNDP (1994)
Human Development Report 1994, United Nations Development Programme, Oxford University Press, Delhi, 1994.

UNOCAL Corporation (2000)
Bangladesh Resource Assessment, UNOCAL Corporation, March 2000.

USPO (1995)
Sustainable Energy Strategy, Clean and Secure Energy for a Competitive Economy, National Energy Plan, Pursuant to Section 801 of the Department of Energy Organization Act, US Government Printing Office, Washington DC. 1995.

WCED (1987)
Our Common Future-World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford, 1987.

World Bank (2001)
World Development Report 2000/2001, Attacking Poverty, Published for World Bank, Oxford University Press, 2001.

World Bank (2000)
World Development Report 1999/2000, Entering the 21st Century Published for World Bank, Oxford University Press, 2000.

World Bank (1999)
World Development Report 1998/99, Knowledge for Development, Published for World Bank, Oxford University Press, 1999.

World Bank (1997)
World Development Report 1997, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1997.

World Bank (1996)
World Development Report 1996, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1996.

World Bank (1995)
World Development Report 1995, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1995.

World Bank (1994)
World Development Report 1994, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1994.

World Bank (1993)
World Development Report 1993, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1993.

World Bank (1992)
World Development Report 1992, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1992.

World Bank (1991)
World Development Report 1991, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1991.

World Bank (1990)
World Development Report 1990, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1990.

World Bank (1989)
World Development Report 1989, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1989.

World Bank (1988)
World Development Report 1988, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1988.

World Bank (1987)
World Development Report 1987, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1987.

World Bank (1986)
World Development Report 1986, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1986.

World Bank (1985)
World Development Report 1985, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1985.

World Bank (1983)
World Development Report 1983, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1983.

World Bank (1979)
World Development Report 1979, Published for the World Bank, Oxford University Press, 1979.

APPENDIX-1 : RECOMMENDED ENERGY POLICY (GOB 1996)

I. NON-RENEWABLE ENERGY POLICY

I.1 Assessment of Indigenous Resources

a. A comprehensive assessment of non-renewable energy resource base is essential irrespective of the actual prospects of their exploitation under prevailing techno-economic situation.

b. A comprehensive data base, containing all information and data required for exploration, is required to be developed by continuously updating geological, geophysical and geochemical information.

c. Extensive exploration need to be continued to upgrade structural leads to established structures.

d. Steps are to be taken to drill the established structures/plays to ascertain their status.

e. Intensive exploration need to be continued to delineate new structures in the hitherto unexplored frontier and virgin areas.

f. Special incentive packages similar to those offered for oil and gas exploration in off-shore areas are to be given for exploration of oil and gas resources in the west zone.

g. Foreign and local entrepreneurs are to be encouraged to invest in exploration for petroleum and solid fuels in the country.

h. The public sector utilities are to intensify exploration. For this, the present policy of the Government to allow one exploration drilling per year with internal resources is inadequate. Number of exploration drilling with internal resources is to be increased to at least four per year.

I.2 Supply and Augmentation of Indigenous Resources

I.2.1 Oil and Gas

a. Comprehensive reservoir study of the developed gas fields need to be undertaken to determine their actual field potential.

b. Systematic appraisal of the discovered, partially developed and undeveloped gas/oil fields is to be undertaken to determine actual recoverable reserve. In this context, the possible reserves of presently exploited gas fields and the discovered oil fields at Haripur, Kailashtila and Fenchuganj are to be given priority.

c. Efforts are to be made to reduce the abandonment pressure to optimum level wherever possible, to augment the recoverable reserve of natural gas.

d. The number of production wells are to be increased by the year 2000 to 77, including 15 stand-by wells for ensuring reliability and an average supply of 1000 MMCFD gas.

e. Producible wells, which may now be idle for different reasons, are to be brought under production on a priority basis. If needed, internal resources are to be allocated for attaining this target.

f. Gas fields having higher NGL content are to be given priority for development in order to increase NGL supply. In this context, the Beanibazar gas field is to be brought into production at the earliest.

g. NGL plants at Ashugonj and Kailashtila are to be commissioned at the earliest.

h. Development of the national gas grid, inter-connecting all the producing fields with the transmission network as well as connecting the demand centres with it should be completed as soon as possible.

i. Since reserve of Kutubdia Gas Field has been considered in the energy balance, due consideration is to be given to its development and availability for use.

1.2.2 Coal

a. The target of producing one million tonne of coal from Barapukuria by the turn of the century is to be achieved.

b. Techno-economic feasibility of Khalaspir coal deposit in Rangpur is to be taken up at the earliest.

c. Appraisal of coal basins in Rangpur-Dinajpur belt is to be completed and depending on the findings, techno-economic feasibility of their exploitation are to be taken up.

d. Exploration for coal in the north-western part of the country including the identified potential coal basins is to be undertaken on a priority basis .

e. The feasibility study on extraction of Coal Bed Methane (CBM) from Jamalgonj and Khalaspir is to be undertaken on a priority basis, if needed internal resources are to be allocated for this. Depending on the findings of the Feasibility study, commercial exploitation of CBM is to be considered for these and other prospective areas of coal deposit. Private entrepreneurs may be encouraged to extract CBM.

1.2.3 Peat

a. A number of semi-commercial to commercial scale projects on peat extraction and briquetting plants may be set up at different peat deposit areas on the basis of findings of the under-implementation project on peat.

b. Problems like reclamation of land after extraction of peat, drying, briquetting of peat as well as the logistics of transportation and distribution are to be solved before this fuel is considered for use on a large scale.

I.2.4 Nuclear Minerals

Areas having prospects of uranium and thorium deposits are to be appraised and, studies may be conducted on the techno-economic viability of production at prospective sites.

I.3 Reduction of Imbalance in Energy Consumption

I.3.1 Rural-Urban

a. Penetration of commercial fuels backed up by appropriate pricing policy is to be accelerated to ensure equitable distribution of benefits.

b. Reliability of energy supply to the rural areas in terms of availability in adequate quantity, in time and at a fair price is to be ensured.

I.3.2 East Zone and West-Zone

Considering the importance of equitable development of different regions of the country, it is important to undertake special measures for the planned development of energy supply in the west zone. The following measures/projects for the west zone are to be considered in this connection:

a. Special incentives for exploration and production of oil and gas;

b. Exploration and development of coal, including that at Barapukuria and Khalaspir, and CBM;

c. Use of furnace oil from ERL for power plants and industries;

d. Establishment of adequate oil depots at the Chalna port and up country;

e. Ensuring reliable supply of LPG through extension of LPG pipeline to Elenga and establishment of bottling plants there;

f. Extension of natural gas pipeline;

g. Development of infrastructure for handling and inland transportation of imported fuels like coal and oil;

h. Establishment of Petroleum Refinery.

I.4. Fuel-Mix

a. Supply of indigenous fuels is to be maximized to the extent possible in meeting the future demands. The deficit is to be a mix of coal, oil and nuclear energy.

b. The mix of imported fuels and their end-uses are to be determined on the basis of their relative advantages and disadvantages. Reliance on a single fuel type is to be avoided in order to minimize the effect of any future global energy crisis. Security of energy supply, logistics of transportation and handling, environmental pollution along with economics of energy supply will influence the evolution of the mix of the imported fuels.

c. Import of liquid fuels is to be determined by the market force. However, its consumption is to be limited primarily to such uses, like transport for which alternatives are not either available or affordable by the vast majority of the population.

d. Size of new refinery(ies), whenever required, is to be determined on the basis of growth in demand. At least one of the new refineries may be considered for installation in the west zone.

e. Infrastructure for transportation of crude to the refinery site, including pipeline if the site is inland, should be developed in parallel to installation of the refinery(ies).

f. Logistics of handling at the port and inland transportation are to be developed in keeping with the growth in import of coal.

I.5. Allocation of Non-Renewable Energy Sources

I.5.1 Natural Gas

a. Existing reserve and projected supply of 1000 MMCFD is to be allocated as follows:

Power Generation	45 - 50%
Fertilizer Production	25 - 27%
Industry	13 - 18%
Commercial and domestic	8 - 10%

b. In case of any commercial discovery in the west zone, the same is to be developed on a priority basis.

I.5.2 Petroleum Products

a. Allocation of liquid petroleum products will depend on the dynamics of market economy.

b. Furnace oil produced in the ERL is to be allocated mostly for power generation and other industries in the public and the private sectors of the west zone.

c. In the event of Compressed Natural Gas being available, the share of the transport sector in the consumer-mix may be slightly changed as it will be possible to replace part of the liquid fuel by CNG in engines operating in the dual fuel mode.

I.5.3 Liquified Petroleum Gas (LPG)

Most of the LPG is to be allocated for the west zone, primarily for the domestic sector. LPG may also be imported for meeting the demand of the country.

I.5.4 Coal

a. Local coal is to be used mostly in the west zone, while a part of it may be allocated for brick burning in both the zones. The indicative allocation for indigenous coal is as follows.

Power generation	75-85%
Domestic/Industrial	15-25%

b. Allocation of imported coal will depend on the dynamics of the market economy.

I.5.5 Coal Bed Methane

The future production of Coal Bed Methane is to be used for power generation, domestic, commercial and industrial purposes in the west zone.

I.5.6 Peat

Use of peat is to be popularised. Private sector is to be encouraged to participate in extraction, processing and distribution of peat.

I.6 Pricing

I.6.1 Overall Policy

a. All forms of non-renewable energy are to be priced at their economic cost of supply.

b. A cross-subsidy or trade-off may be made among different forms of energy or within different products of a particular form of energy to promote growth and ensure social justice. A differential price structure for different groups of consumers based on social and other considerations may be retained.

c. An equalized pricing principle for a particular product throughout the country, at least upto certain point of delivery, say, district/thana/depot level is to be continued.

I.6.2 Specific Policy

a. The present price of natural gas is to be raised annually to reach its economic cost of supply in course of next five years.

b. In case of large scale participation of the private sector in the oil and gas exploration under PSC, the price of gas is to be linked to the price of high sulphur furnace oil as recommended in the Petroleum Policy.

c. The present subsidy on gas price for power and fertilizer is to be removed gradually. Subsidy, if required, is to be given at the end-user level and the related liabilities can not be passed on to the utilities.

d. Differential tariff is to be applied for use of gas by the bulk user (e.g. power and fertilizer) for the off-peak and peak hours.

e. Some subsidy on gas price for domestic use may be given on social considerations.

f. Cross-subsidy of liquid fuels may, however, be considered to promote growth, substitution and social justice.

g. While fixing up price for Diesel, MS, Kerosene, LPG etc., adequate care has to be taken to prevent adulteration of one product by the other or to discourage smuggling of the product outside the country..

h. The price of coal is to be set at its economic cost of production and supply.

I.7 Conservation

Following categories of conservation measures are to be strictly enforced to ensure rational,economic and efficient use of energy.

I.7.1 Energy Audit

Energy audit is to be enforced at all levels, so that wastage of energy can be checked and corrective measures taken. To this end, the Energy Conservation Act is to be introduced and the role of Energy Monitoring and Conservation Centre (EMCC) is to be strengthened.

I.7.2 Reduction of Wastage

a. Use of efficient processes in fertilizer production, BMRE, retrofiting and other measures are to be taken to reduce specific gas consumption in fertilizer production first to the level of the present average consumption of the national fertilizer factories and then at least to the specific consumption of Jamuna Fertilizer Factory. Any new fertilizer factory must have an specific gas consumption no more than that of the Jamuna Fertilizer Factory.

b. Use of efficient technologies for power generation, BMRE or retrofitting are to be undertaken for the existing power plants of different types having efficiency lower than the national average of that technology. Future power plants must have an efficiency acceptable at the international level.

I.7.3 Demand Management

a. Single/double shift industries are to be operated during off peak period.

b. Decision on establishing gas-based new fertilizer factories will be taken in such a way that total production is limited to the level of national demand.

c. Export of Fertilizer produced with subsidized price of gas is to be discouraged.

d. Incentives for fuel efficiency for all categories of end-uses may be given.

e. Fiscal incentives, including reduced taxes and duties may be given to promote the use of Compressed Natural Gas (CNG) in transports.

I.7.4 Efficient Use

a. Use of improved cooking appliances and lighting devices using commercial fuels are to be encouraged.

b. Use of efficient engines and furnaces as well as co-generation in industries, are to encouraged wherever feasible.

1.8 System Loss Reduction

a. All types of technical system losses are to be reduced to acceptable levels and non-technical losses are to be eliminated.

b. Adequate number of meters (system meters) are to be installed by the utilities at designated points of the gas network at the earliest.

c. Gas meters are to be checked and calibrated periodically and on a regular basis.

d. Power, fertilizer and all other industrial consumers are to provide their annual production and total gas consumption in order to estimate specific consumption.

I.9 Environment Policy

a. Environmental Impact Assessment should be made mandatory and should constitute an integral part of any new energy development project.

b. Use of economically viable environment friendly technology are to be promoted.

c. Use of fuel wood is to be discouraged and replacement fuels are to be made available at an affordable price.

d. Popular awareness to be promoted regarding environmental conservation.

e. In case of coal based power plants, disposal of ash and reduction of environmental emission are to be considered in technology selection.

f. In case of nuclear power plant, internationally acceptable criteria on radiation emission are to be observed. Abandoned hard rock mine faces may be considered for final disposal of such wastes.

g. Use of lead free petrol will be encouraged.

I.10 Emergency Stocks

I.10.1 Petroleum Fuels

The emergency stock is to be increased from the present level of 40 days to 60 days of consumption. Such reserves in storage tanks are to be distributed all over the country and reserve capacity for each location are be determined by considering extreme natural events like flood and cyclone, as well as drought.

I.10.2 Coal

Adequate emergency stock of coal, say equivalent to one month's consumption of off-shore island and flood prone areas may be maintained.

I.10.3. Natural Gas

Stand-by wells are to be provided to meet emergency situation. The reserve margin in this case is recommended to be 20% of the producing wells.

I.11 Investment and Lending Terms

a. Dependence on external donors is to be gradually replaced by internal financing to the extent possible. Public sector utilities are to be encouraged to mobilize own resources for their projects. The existing formalities for using internal resources of the utilities for implementation of their projects are to be simplified.

b. A part of the contributions of Petrobangla and the BPC towards the national exchequer is to be made available to the public sector utilities for investment in development of the non-renewable energy sector.

c. Public sector utilities are to be allowed to mobilize finance from the market through bank loans, debentures and floating shares.

d. Private sector financing is to be encouraged.

e. In case of government funding, same set of financing conditions are to be applicable for both the private and the public sector.

f. Considering the importance of energy as a vital infrastructure for development, interest on loans provided by the Government is to be equal to the lowest slab of interest for industrial loans.

g. Protection from foreign exchange fluctuations should be given to energy sector projects.

I.12 Project Planning and Implementation

a. A Master Plan for the sub-sector is to be developed, identifying projects along with the recommended phasing of implementation. The master plan may also include information on the project cost and economic analysis. Bankable documents are to be produced for a project in accordance with its schedule identified in the master plan.

b. Necessary attention should be given for reducing the delay in the process of project approval. The existing procedure should be modified so as to enable the concerned utility to implement the project according to the time schedule given in the project proforma.

I.13 Institutional Issues

Though Petrobangla has been organised in the functional line and operating companies have been registered as Public Limited Company, yet Petrobangla continues to remain as a Government Agency in the form of a Corporation. Petrobangla is to be corporatised and converted into a Public Limited Company (Holding Company) under the Companies Act of 1994 with necessary organisational and financial restructuring and the ownership to remain with Government. The new Company should have the right to select employees on its own terms and conditions of employment so as to attract and retain high quality staff.

A regulatory organization (National Energy Authority) is to be set up to facilitate co-ordination of the activities related to the future development of non-renewable energy and also to help the private and the public sector play complimentary roles in achieving various development targets. Terms of Reference of the proposed organization may include the followings, among others.

a. to decide a consensus projection on demand for commercial energy for planning of non-renewable energy sub-sector;

b. to develop tariff structures for commercial fuels in consultation with the public and the private sectors as well as the consumer groups;

c. to evolve a rational allocation of different fuel types;

I.13.1 Participation of Private Sector

a. Incentive packages defined through the Petroleum Policy are to be offered to the local and foreign entrepreneurs. Similar incentive packages is to be developed for the solid fuels as well.

b. In case of marketing of fuels by the private sector, the price fixation and the reliability of supply to all categories of consumers in the rural as well as the urban areas are to be regulated through the proposed regulatory authority (e.g. National Energy Authority).

I.14 Research and Development

a. A comprehensive R & D programme addressing the problems of development of non-renewable energy is to be drawn up and implemented in co-operation with the existing R & D and educational institutions of the country.

The areas for priority attention may include the following:

Policy Research
Resource Assessment
    - Material
    - Technology
    - Management/Manpower
New Technology Acquisition and Adaptation.
Impact Assessment (Policy/Programme/Projects).
Standardization of Equipment and Procedures.
Data Base.

b. Sufficient funds are to be allocated for conducting the R & D programme according to a defined schedule. A certain percentage of PSC shares and revenue generated by the utilities is to be earmarked for this purpose.

c. Petrobangla should have a Research and Development Wing to help in achieving the above objectives.

I.15 Human Resource Development

a. A comprehensive programme on training linked with career planning of professionals is to be drawn up and implemented.

b. Sufficient funds are to be allocated for human resource development. A certain percentage of PSC shares and revenue generated by the utilities is to be earmarked for this purpose.

I.16 Legal Issues

Appropriate modifications/ revisions of the existing law, acts, regulations, ordinances, etc are to be made in consultation with the Ministry of Law in order to facilitate implementation of various provisions of the National Energy policy.

II. PETROLEUM POLICY[1]

(As approved by the Cabinet in its meeting held on 18.7.93)

II.1. Objective

The basic objectives underlying the policy are to:

i. undertake systematic survey, exploration and exploitation of petroleum resources and to ensure their rational use for sustainable development of the country,

---

[1] For the purpose of the Petroleum Policy, Petroleum means any naturally occurring hydrocarbon, whether in liquid, gaseous or soild state as defined in the Bangladesh Petroleum Act, 1974.

ii. adopt uniform policy instrument for both public and private sector (local and foreign) enterprises,

iii. expedite exploration and development of indigenous petroleum resources,

iv. mobilize domestic and external financial and technical resources from private and public sector especially the former for the development of petroleum exploration, refining, import, export, storage, distribution and marketing,

v. consider development of gas fields through private sector, as a part of Government's privatization policy,

vi. replace oil import by gas as far as possible and to augment energy supply by other undeveloped commercial energy sources such as coal, coal bed methane, peat as well as LPG and all other possible sources of conventional and non-conventional energy,

vii. strengthen the research, technical and administrative capabilities of the government agencies responsible for making policies and their effective implementation,

viii. encourage involvement of private sector in the petroleum industry and trade,

ix. create a competitive environment for giving the best deal to the consumer in price and quality, and

x. promote measures for environmental impact assessment in this sector

II.2. Implementation

For achieving these policy objectives, the measures specific to various segments of the oil and gas sector are spelled out below:

II.2.1. Legal and Procedural

i. steps will be taken to amend the existing acts and rules to implement the policy wherever necessary,

ii. all applications for exploration licenses will be decided within six months and disputed or contested applications will be decided within nine months,

iii. a comprehensive data base necessary for exploration promotion will be developed and made available on payment of necessary fees for the use of exploration companies and the confidentiality rules will be amended to bring it in line with the international practice wherever necessary, and

iv. the model production sharing contract will be reviewed at intervals.

II.2.2 Fiscal

i. repatriation of profit as per production sharing contract (PSC) provision will be allowed,

ii. private and public sectors will be treated uniformly,

iii. no administering fee or signature bonus will be necessary on signing of PSC. Contract service fee to be paid annually will be biddable with a minimum of US $50,000.00(Fifty thousand US dollars),

iv. special consideration will be given to application for PSC in offshore areas,

v. for offshore production, rate of bonuses and the Government's share would be lower than onshore production,

vi. no duty will be levied on machinery, equipment and consumables imported for petroleum operation during exploration, development or production stage,

vii. the equipment imported for enhanced oil and gas recovery will also be subject to the same concessionary rate of duty, and locally manufactured machinery and equipment used by the exploration companies will be entitled to all such benefits as are admissible on their export,

viii. pre-shipment inspection of machinery and other imported items will be mandatory,

ix. companies will remain harmless of all corporate tax and such other taxes as are determined under the terms of PSC. and

x. incentive oriented agreements will be made for exploration in and recovery from deeper horizons.

II.2.3. Commercial

i. local private companies will be encouraged to seek joint ventures with foreign companies and/or with BAPEX in exploration,

ii. the current practice of accepting a commercial discovery on the basis of the first exploration well followed by one appraisal well to determine the extent of the reservoir will be changed and declaration of commerciality on conclusive ground will be accepted even on the basis of one well,

iii. the gas producing companies will be assured a market outlet within a reasonable time of commercial discovery, and if indication of an outlet is not given by the government within 12 months of the declaration of commercial discovery, the producer would be free to find market outlet within the country, and

iv. the companies would be required to undertake optimal development of oil and gas fields for maximum recovery.

II.2.4. Pricing

i. The pricing for associated gas would be on a cost plus basis, while for non-associated gas it will be 75% of international price of high sulfur heavy fuel oil with negotiated discounts, and to encourage exploration in offshore areas, associated or non-associated gas from such fields will be priced at 25% higher than those from onshore areas,

ii. the price of locally produced LPG will be linked to international kerosene price on BTU basis with appropriate discount to encourage its local production, and

iii. the value of oil from each production area will be determined on the basis of market value comparable to Asia Pacific Petroleum Price Index (APPI).

II.3 Oil Refining

i. Private sector will be free to set up new refineries,

ii. private sector will be encouraged to install secondary conversion units for upgrading residual fuel to higher value products in collaboration with the existing refinery,

iii. new marketing companies linked with investment in development of infrastructure (storage, pipelines, wharves and other facilities) will be allowed,

iv. joint venture companies for i., ii. and iii. outlined above will be encouraged,

v. the pricing formula for refinery products will be based on import parity prices with a negotiated discount,

vi. refineries will be allowed to import required crude oil after lifting locally produced crude oil allocated from local source(s), and foreign exchange for import of crude oil will be made available,

vii. refineries will be free to sell their products to any marketing company or directly from the plant to any customer(s) within the country, and

viii. foreign companies investing in refinery or in blending plants whether on their own or in association with local investors will enjoy the benefits of Foreign Private Investment (Promotion and Protection) Act, 1980.

II.4. Lubricating Oil

i. Lubricating oil products will be free from price control,

ii. no permission will be required for establishing lubricating oil blending plants, grease and wax manufacturing plants subject to registration for quality check,

iii. investors will be free to procure raw materials from local or foreign sources,

iv. used lubricating oil will be sold only to registered reclamation plants or their authorized agents operating on prescribed guidelines,

v. quality standards will be defined according to the international standards and enforced through checks; each plant will be required to establish adequate testing facilities; penalty for non compliance will be imposed, and

vi. it will be preferable to have a licensing arrangement with internationally reputed oil company(s) or lubricant blending plants for product formulation.

II.5. Marketing and Distribution

i. In consultation with the Government the prices of products will be fixed and equalized for main installation and depots at various places in the country and freight will be added beyond these points,

ii. subject to uniformity in coverage development of retail outlets will be done by the marketing companies and individual investors based on environment, explosives and safety rules,

iii. the commission of the marketing companies and dealers will be excluded from the notified prices, and the dealers' commission will be left out to be determined by the marketing company or by the individual retailer,

iv. the private sector will be encouraged to invest in infrastructure like pipeline(s) including common carriers, storage, and distribution/handling facilities,

v. private sector may also be involved in phases in import and distribution of POL,

vi. marketing companies (under BPC) may import POL products after lifting the locally produced products, and

vii. to check adulteration and to enforce quality existing laws will be enforced.

II.6. Liquefied Petroleum Gas (LPG)

LPG may be imported for meeting the demand of the country.

II.7. Research and Development

To enforce this policy, the monitoring, research and development capabilities of Petrobangla, Bangladesh Petroleum Institute, Bangladesh Petroleum Corporation, Geological Survey of Bangladesh, Universities and other Institutions will be strengthened by allocating a fixed percentage of the government share of the PSC and by utilizing the technical assistance provided by the petroleum producing companies under production sharing contracts.

II.8. CNG in Transport

The use of CNG in all types of road and riverine transports including locomotives replacing motor spirit and diesel will be commercialized. No duty, sales tax or surcharges will be levied on equipment imported for compression and refueling of natural gas and for conversion of vehicles. Local as well as foreign private capital will be encouraged to invest in all phases of CNG business.

II.9. Consultation

A standing panel will be constituted by the Ministry of Energy and Mineral Resources to advise the government on policy and operational issues relating to all phases of petroleum operation.

II.10. Safety and Environmental Protection

Laws, rules and policies formulated by the Government in this regard will be followed.

II.11. Welfare

The private companies in consultation with the Ministry of Energy & Mineral Resources/Petrobangla will contribute towards the:

i. development of roads, water supply, health and education facilities in the areas of their operation and towards any such other activities to be undertaken,

ii. undertake programs to improve the state of environment in their areas of operation.

III. RENEWABLE AND RURAL ENERGY POLICY

III.1. General Policy Issues

III.1.1 Sustainable Energy Development

All energy development programmes are to be aimed at sustainable development with minimal environmental effect.

III.1.2 Rural Energy

Rural sector plays a vital role in the national life in terms of economic activities, agricultural production, and population. Therefore, energy needs of the rural areas are to be given priority in all activities related to the overall development of the energy sector.

III.1.3 Biomass Fuels

Direct and total replacement of biomass by commercial energy will be prohibitive for financial and infrastructural constraints. Biomass fuels will, therefore, continue to play an important role in the energy scene of the country for many years to come.

III.1.4 Commercial Fuels

Upper limit of supply of biomass fuels, imposed by the availability of land, would necessitate supplementing the supply side in the rural areas with commercial fuels. Penetration of commercial fuels into rural areas and all other activities related thereto are to be planned and implemented when the overall programme for development of the commercial fuels are drawn up.

III.1.5 Energy-Mix

Demand for total energy in the rural areas are to be met by a mix of bio-mass fuel, commercial fuels and the renewable energy technologies, and their composition would vary from place to place.

III.2 Specific Policy Issues

III.2.1 Resource Assessment and Planning Methodology

a. Systematic assessment of bio-mass resources of all types are to be made. In this process, scopes for alternate use of a part of such resources, like recycling a part of agro-residues into soil are to be identified.

b. Potentials of renewable sources of energy like solar, wind, mini/micro hydro, tidal, wave and geothermal are to be assessed along with the potentials for their harnessing as useful energy.

c. It would be prudent to conduct such assessment on an area basis, preferably considering Union or Thana as a unit for resource assessment.

d. End use based demands are to be balanced with the supply of fuel for each planning unit, which are to be used for planning and for projections , thereby turning such areas into individual units for a decentralized planning structure.

e. Rural and renewable energy database are to be established and updated on a regular basis to facilitate systematic planning.

III.2.2 Technology Assessment

a. Assessment of different technologies related to harnessing, conversion and consumption of bio-mass fuel and other types of new and renewable sources of energy is to be undertaken.

b. Testing, evaluation and standardization of different technologies are to be undertaken to assess their advantages and disadvantages under socio-economic conditions of Bangladesh, economic parameters, adaptability and other factors influencing their dissemination.

c Systematic research on other innovative technologies and for harnessing, conversion and consumption of bio-mass fuels and other renewable energy technologies is to be conducted.

III.2.3 Conservation

a. Conservation at end use level of biomass fuels is to be implemented through technological intervention, primarily by dissemination of technologies like improved stoves and biogas digestors, provided that these are otherwise found suitable on the basis of financial, socio-economic and technological considerations.

b. Conservation measures for use of woodfuel in urban households, for commercial places like hotels and restaurants and as fuel for certain industrial activities are to be encouraged. In this connection similar measures for households are to be given priority.

c. Motivation and incentives shall be provided in the rural areas for implementing conservation measures.

III.2.4 Environmental Policy

a. Ban on the use of woodfuel for brick burning is to be enforced strictly.

b. Use of woodfuel for melting bitumen for road carpeting is to be banned.

c. Use of woodfuel in urban areas and for brick burning shall be discouraged and at a later stage restricted by making alternate fuels (e.g. coal, peat, LPG, etc.) available for such purposes.

d. Alternate fuels are to be supplied in rural areas at an affordable price to encourage increase in recycling of agricultural residues back to soil in order to achieve and maintain sustainable agricultural production.

e. Watershed management should be an integral part of Hydropower project. Concerned government agencies should take care to the soil conservation and afforestation/reforestation issues and other activities to arrest soil erosion and consequently siltation within the dam area.

III.2.5 Afforestation/Reforestation

a. Afforestation/reforestation programmes are to be primarily aimed at bringing the forest coverage of the country to an environmentally acceptable level.

b. Availability of fuel wood as source of energy is to be considered only after afforestation has attained a sustainable level and an excess amount is available after meeting demands for its alternate value added uses like a source for timber.

c. Motivation is to be strengthened to establish that afforestation is a social and moral obligation for every citizen.

d. Research on identification of fast growing species of trees, having better fuel and/or timber values shall be strengthened keeping local climatic and soil conditions in view.

e. Extension programmes, especially those related to community or villages forestry, shall be planned and implemented through participation of the population living in that locality.

f. Phasing of afforestation/reforestation programmes shall be such that the areas like north-western part of the country, where deforestation has already assumed an alarming proportion, are taken up and continued on a priority basis.

III.2.6 Penetration of Commercial Fuels

a. Penetration of commercial fuels, including end user level distribution and retail outlets, shall be ensured and related projects planned and implemented with the same priority as in the case of urban areas.

b. Demand for commercial fuel for irrigation being extremely concentrated to specific season, the logistics of supply of such forms of energy shall be such that supply is reliable and price is fair at all times and particularly during the irrigation season.

c. Decentralized demand in rural areas may appear less lucrative to a private company as compared to the concentrated demand in the urban areas. Therefore, as and when the private sector is allowed to market commercial fuels, it should be made mandatory to ensure reliability of supply to rural areas at fair prices. Provisions of penalties should be incorporated for the failure of the distributor in ensuring this.

d. Retail outlets in the distribution network for commercial fuels shall be located so that the users can reach the nearest outlet easily and without spending much time.

III.2.7 Rural Electrification

a. The present concept of area coverage electrification with involvement of the population is to be extended to bring the entire country under electricity coverage in phases.

b. Rural electrification is to incorporate a component aimed at stimulating industrial activities and its other value added utilization. Linkages of the REB with different sectors, particularly the industrial sector, are to be established for identification and implementation of such potential end uses.

c. In order to enhance the impact of rural electrification programme, efforts are to be made to stimulate its demand at household levels. In mid-term perspective, the aim may be to provide electricity for at least 2 fluorescent tubes of 20 W capacity to each household under each PBS.

d. Planning of rural electrification is to be coordinated with that of the BPDB in order to avoid any mismatch between the demand and supply of electricity, particularly during the irrigation season.

e. Same set of criteria on reliability of power supply for different categories of consumers are to be applicable to the urban and rural consumers.

f. Rural consumers are to be motivated to adapt measures on conservation, to avoid wasteful uses of electricity and to support all measures leading to conservation, reduction of system losses, efficient load management and economic operation.

III.2.8 Renewable Energy Technologies

a. Biomass fuels have to be supplemented by commercial energy in order to help meet the demands in rural areas on a sustainable basis. But since resource constraints and other problems of logistics may actually impede attainment of such a target, renewable energy technologies are to be considered to bridge the resulting gap between demand and supply.

b. Remote and isolated areas, including the off-shore islands, Beel and Haor areas, which are not likely to be brought under the networks of commercial fuels in foreseeable future are to be considered as potential sites for implementing renewable energy technologies, in spite of their high capital cost.

c. Technologies like Solar Photovoltaic may also be considered even in other places for specific purposes like preservation of temperature sensitive drugs and vaccines, lighting and disaster management in cyclone shelters, where supply of reliable emergency power is more important than any other technical or financial/economic considerations.

d. Other technologies like those involving solar thermal conversion, may be considered for use in industries and rural hospitals.

e. Assessment of wind turbine technology, compatible with the average wind speed, is to be conducted and such units shall be built at specific locations depending on its economic performance and other technological considerations.

f. Technologies like mini/micro hydro, geothermal, tidal power, wave energy and others are to be assessed and considered for implementation based on their relative advantages/disadvantages of economic, financial and technical parameters.

III.2.9 Tariff and Fiscal Policy

a. Pricing of commercial energy may influence both demand and mix of energy consumption in rural areas. Therefore, pricing policy at the macro level shall take due cognizance of its possible impact on rural energy demand-supply matrix.

b. Kerosene is used for lighting in the rural areas and lighting is indispensable for attaining socio-economic advancement including the government goal on universal literacy. Therefore, subsidy on kerosene price is to be considered.

c. All types of taxes and duties on renewable energy technologies shall be waived to encourage their promotion.

d. Finance for new and renewable energy technologies shall be provided at comparatively softer terms and conditions in order to encourage their promotion.

III.2.10 Legal Issues

a. Legal framework shall be developed and implemented to restrain use of fuel wood for brick burning and road carpeting, with the condition that alternate replacement fuel like coal and peat shall be made available for such purposes.

b. Legal framework is to be introduced for inter-connecting small and isolated electricity generating units with the national grids where applicable.

III.2.11 Human Resources Development

Management and utilization of bio-mass fuels, renewable energy technologies and overall rural energy are highly decentralized. Therefore, development of human resources for such task is to be taken up in a planned way.

III.2.12 Investment

a. Development of rural energy, and especially introduction of renewable energy technologies would require substantial financial support, especially as most of the rural population may not have such financial capability. As such, a separate financial institution may be organized with the mandate to provide financial support to the rural people on relatively softer term and conditions for helping implementation of energy related projects. Alternatively, existing commercial banks may be encouraged to earmark funds for such purposes.

b. Adequate funds are to be allocated for implementation of different programmes and projects related to renewable energy technologies and biomass fuels. Private sector investment shall also be encouraged.

c. Bank loans are to be provided for implementation of renewable energy technologies in the urban areas.

III.2.13 Institutional Issues

a. The Ministry of Energy and Mineral Resources is to administer all activities related to rural and renewable energy.

b. An institutional framework, like Renewable Energy Development Agency (REDA), is to be established for meeting the challenges of planned development of renewable energy technologies and efficient use of biomass fuels. This institution is to be under the Ministry of Energy and Mineral Resources.

c. Government funding for various programmes (including R & D, extension, studies, human resource development) related to rural energy, bio-mass fuels and renewable energy technologies shall be managed and coordinated by this institution (REDA).

d. At least 10% of the overall energy R&D fund, generated from contributions from production sharing contracts and also from government or external sources is to be made available for R&D in rural energy, biomass fuels and renewable energy technologies.

e. Extension of identified rural energy technologies is to be made through various government agencies dealing with extension and/or by the NGO's and the private sector.

IV. POWER POLICY

IV.1 Demand Forecast

a. The methodology of forecasting linking electricity with socio-economic goals of the country is to be used for projecting demands for electricity.

b. An agreed overall projection on demand is to be developed and used for all planning purposes. The projection is to be updated and if needed readjusted periodically based on achievement of targets.

c. A data base on the power sector is to be developed which shall be continuously updated .

IV.2 Long Term Planning and Project Implementation

a. Long term planning for development of the power sector is to be drawn up on the basis of the projection on demand, cost of supply, reliability and quality of supply and adequate transmission and distribution facilities.

b. Least cost approach is to be the basis for generation planning. Realistic exogenous constraints like transportation and logistics of fuel supply, energy security, maximum unit size, project management and environmental impact of technologies are to be defined and used as inputs for least cost expansion planning. Sufficient constraints may be built into the controlling factors related to supply in the west zone.

c. An overall master plan for electricity is to be developed incorporating the least cost generation expansion plan, transmission plan and distribution plan and phasing of projects. This master plan shall be the basis for all development programmes and projects of the power sector.

d. Bankable documents and detailed feasibility studies of such identified projects to be implemented at specific sites are to be prepared in advance by the respective utilities/ private companies for financing either by the Government or the commercial banks.

e. Special projects are to be identified (for example power plants in the west zone or the off-shore islands), implementation of which within a time frame are essential either to improve operational performance of the grid or to provide electricity on socio-economic considerations. Criteria for their acceptance may differ from the overall criteria for other projects of the sub-sector.

f. Distribution agencies such as REB, DESA as well as BPDB and the possible distribution companies in the private sector are to take up marginal expansion projects for their respective franchise area or a part or parts of it in annual rolling sequences under five year plans.

IV.3 Investment and Lending Terms

a. Development of the power sub-sector is to be such that the utilities can function economically and reliably and their financial situation permits generation of resources internally for financing at least a part of their development activities.

b. Utilities are to develop appropriate corporate financial structures along with efficient systems of accounting and financial management in order to facilitate accountability, transparency, to help assessing financial performance, decision making in investment, cost control and economic operation.

c. The terms of lending for finance offered by the Government to the utilities is to be fixed in such a way that the interest does not exceed the lowest slab of interest on loans offered by the commercial banks of the country.

d. The utilities are to be permitted to procure generating plants and other items of generation, transmission and distribution through international competitive bids and local suppliers/manufacturers to be provided with adequate incentives to participate in such bids.

e. Efforts are to be made to raise capital from the market for the utilities as a whole or its individual projects through bank loans, floating share certificates and bonds. Efforts are to be made to encourage non-resident Bangladeshis, including wage earners abroad, to invest in the power sub-sector.

f. Incentives like tax exemption may be provided to encourage investments in the energy sector. A tax holiday of at least 5 years may be offered for the energy related projects.

g. No duty (including VAT) is to be levied on machinery, equipment, spares and other consumables for energy related projects. In case it becomes necessary to impose customs duties and taxes, then separate budgetary allocations are to be made to cover such expenses.

h. Public sector utilities, implementing Government financed projects, are to be allowed moratorium periods for repayment of loans covering at least the implementation phases of their projects.

i. Existing public sector institutions are to be transformed into public limited companies over a period of time in phases and when so done are to be registered with stock exchanges in Dhaka and overseas.

j. Public sector utilities are to have the option to enter into joint venture with private sector (Local and Foreign) in the fields of generation and distribution of electricity.

k. Protection from foreign exchange fluctuations should be given to power sector development projects.

IV.4 Fuels and Technologies

a. Efforts are to be made to maximize use of indigenous fuels, namely natural gas, coal, hydro-electricity and coal bed methane in the future generation mix of the country.

b. A mix of fuel for power generation is to be evolved so as to reduce reliance on any particular fuel type. Least cost fuel option for generation of electricity should be chosen.

c. Criteria for selection of a technology are to include its provenness, maintainability, reliability, adaptability, and efficiency and environmental compatibility.

d. Local coal is to be given preference for the future coal fired plants. In case of import of coal, infrastructure for its handling and transportation are to be developed in keeping with the volume of coal import for power generation.

e. Construction of nuclear power plants is to be considered on the basis of its cost-economics viz-a-viz alternatives using imported fuels and the problems of logistics of handling and transportation of oil and coal. Safety and waste management are to be given priority in selecting technology for nuclear power project.

f. Efforts are to be made to standardize systems, sub-systems and components of energy equipment so as to optimize cost, improve reliability of the system, facilitate operation and maintenance and optimize inventory of spares.

IV.5 Power Supply to the West Zone

a. Efforts are to be made to gradually bridge the gap in electricity supply between the west and the east zone.

b. The combined firm capacity of power plants in the west zone and the interconnector(s) is to be raised to at least half of the peak demand of the grid excluding the peak demand of Metropolitan Dhaka. This target is to be attained by the year 2010. The second East-West Interconnector is to be taken up on a priority basis.

c. The first coal fired plant in the west zone is to be taken up for implementation urgently.

d. Efforts are to be made to implement the Rooppur Nuclear Power Project, if this option is found competitive with the imported fuels, e.g. coal and oil.

e. Transmission and distribution network shall be developed in keeping with the planned growth in demand in the west zone.

f. Reliability and quality of supply in the west zone is to be improved.

IV.6 Power Supply to Isolated and Remote Load Centres

a. Plans for generation of electricity for isolated and remote areas like off-shore islands are to be drawn up separately and criteria for its acceptance shall be fixed on the basis of fuel and technology options relevant to such areas.

b. Transmission and distribution plans for similar load centres are to be developed on an area basis.

IV.7 Tariff

a. The tariff is to be reviewed and fixed in such a way that the utilities can be financially viable, can generate internal resources and at the same time the consumers can get electricity at a reasonable cost.

b. Long run marginal cost is to form the basis for tariff formulation.

c. Subsidies, if provided due to social reasons, are to be given at the end-user level and the related liabilities can not be passed on to the utilities.

d. The slab system for domestic consumers and the tariff applicable for the low income group are to be reviewed periodically to decide on extent of relief.

e. Differential tariff related to time of the day is to be designed to facilitate efficient demand management. The difference in tariff shall be such that the consumers may have the incentive to avoid use of electricity during peak hours. Domestic consumers may be excluded from differential tariff.

f. Cross subsidy is to be provided in order to reduce burden of energy cost on identified consumer groups. In doing so, the burden on the other consumer groups is to be kept within reasonable limits.

IV.8 Captive and Stand-by Generation

a. Permission to install captive generation facilities are to be accorded by the regulatory authority.

b. Categories of activities where captive generation may be allowed shall include the following:

i. Process industries, where loss of power may cause loss of a batch of production.

ii. Co-generation by industries.

iii. Industrial activities like paper and rayon where fluctuations in frequency may cause the loss of a batch of production.

iv. Stand-by generation for Cinema halls, recreational facilities with capacity for not less than 100 persons, hospitals and other facilities of the health services like preservation of temperature sensitive drugs needing reliable power supply, cold storage, aviation, railway communication and related facilities, media services, including TV and radio, telecommunication and for high rise buildings.

c. Stand-by generation facilities allowed for the uses identified above shall be established to meet only extreme contingency. Capacity however should cover only the loads for maintaining essential services.

d. Price of gas used as fuel for captive generation (including stand-by) shall be at least equal to the price offered to the industrial sector. However, gas at concessional rate may be supplied to stand by generators having separate meter.

e. Price of diesel or other petroleum products for captive generation will be at least at par with that offered to the industrial sector.

f. Individuals/organisations living in an area not covered by the utilities can install captive generation facilities.

IV.9 System Loss Reduction

a. Total system loss is to be brought down to a level typical to the successful utilities of the developing countries in the region, subject to cost effectiveness of such reduction in loss.

b. The auxiliary consumption of existing power plants is to be reviewed and attempts to be made to minimize such consumption through retrofiting subject to availability of financial resources.

c. Measures like transmission at higher voltages, optimum sizing of conductors, use of appropriate reactive power sources and adaptation of other technical measures are to be explored. Identified measures are to be implemented if found cost effective.

d. Optimization of the distribution systems through rehabilitation of distribution lines, sizing of transformers, use of capacitor banks are to be undertaken to reduce distribution loss. Standards for the distribution network are to be developed and implemented. Elevation of the existing distribution voltage is to be considered on the basis of its cost economics.

e. Energy meters are to be checked and calibrated periodically as follows:

i. Bulk commercial and industrial consumers	: at least once every 5 years.
ii. Domestic consumers	: at least once every 10 years
iii. System meters	: at least once every two years.

f. All industrial consumers are to provide information on their total production and total consumption of electricity in order to estimate their specific energy consumption.

g. Consumers are to be motivated through a social movement to realise that paying for electricity consumed is a social and moral obligation of each citizen.

h. Dishonest consumers and the personnel of the utility found guilty of collaborating with such dishonest consumers are to be liable to severe punishment.

i. Attractive incentive and prohibitive punishment scheme is to be developed and implemented in order to motivate utility employees to improve commercial operation.

IV.10 Load Management and Conservation

a. Measures are to be taken to reduce peak hour load. The possible areas where policy intervention can help implement such measures are as follows :

i. Commercial activities in shopping centres and malls are to be closed down at 6 P.M. on working days. Exception to this shall be restaurants, medicine shops, groceries and shops for provisions.

ii. Ceremonial illumination (for the purpose of private receptions, parties, wedding ceremonies etc.) are to be restricted.

iii. Industries are to stagger their holidays so that the holidays are distributed over the week.

iv. Second off-peak tariff may be introduced for consumption between 11 P.M and 5 A.M. to encourage industries to stagger their second shift.

b. Following measures are to be taken for conservation of energy.

i. Use of Power Factor Improvement plants are to be mandatory for all new consumers using induction motors in industries, bulk commercial consumers and irrigation pumps. Existing consumers of these categories are also to be encouraged to install such plants.

ii. Attempts are to be made by the utilities to improve efficiency of the operating plants to the extent possible through rehabilitation. Replacement of power plants shall be made if this is more economic than rehabilitation.

iii. High efficiency appliances like fluorescent lamps with efficient ballast, electronic regulators for fans and high efficiency electric motors are to be used. Replacement of existing devices shall be encouraged.

iv. Industries producing conventional appliances are to be encouraged to change/modify their production line for manufacturing identified efficient appliances.

v. The utilities, local R & D and educational institutions shall undertake a joint survey to identify measures of conservation at the end-use level. Consumers will be motivated to adapt such identified measures.

c. Commercial banks should be encouraged to provide loans at softer terms for implementation of conservation measures at the end-use level.

IV.11 Reliability of Supply

a. Adequate generation capacity is to be installed on an emergency basis to overcome the existing power crisis.

b. Adequate reserve margin is to be provided by installing capacities in excess of peak demand (say 25%) so that the system can reliably accommodate planned maintenance and forced outage. Reliability criteria like Loss of Load Probability of the system are also to be prescribed and reviewed from time to time, which are to be considered for generation expansion plans.

c. Planning of major maintenance, including overhauling, retrofiting and rehabilitation is to be done meticulously and ahead of time so that necessary spares, experts and logistics are available in time. Interim replacement or rehabilitation of power plants are to be ensured at appropriate time (12 to 15 years for steam turbine and 8 to 10 for gas turbines), for which adequate funds are to be made available in time.

d. Yearly maintenance schedule is to be drawn up and implemented strictly without any exception.

e. Procurement method for spares and expert services are to be simplified so that supplies and services can be procured on call from abroad. An optimum inventory of spares and consumable is to be maintained.

f. Continued training of maintenance personnel is to be ensured to develop an adequate number of maintenance manpower. Dissemination of knowledge and use of feedback from past maintenance works are also to be ensured. Attractive salaries, remuneration and other forms of incentives and facilities are to be given to such personnel.

g. Expertise is to be developed in the field of protection engineering so as to ensure coordination, reliability and availability of protection systems.

h. Maintenance of distribution system is to be separated from functions of commercial operations. Maintenance personnel are to be dedicated exclusively for operation and maintenance works.

IV.12 System Stability

a. Adequate transmission links between generators and major load centers are to be provided to enhance system stability.

b. Fast acting relays and breakers, auto reclosing of transmission line, co-ordination among protective devices, quick acting governors and excitation system along with automatic load shedding scheme are to be provided.

c. Continuous monitoring and analysis of problems, setting and resetting of control and protective devices to respond to changed conditions are to be ensured.

IV.13 Load Despatching

a. Load despatching Centre is to ensure coordination among the power stations and load centres for economic, efficient and reliable operation of the power system through continuous control of load flows, regulation of voltage and reactive powers, and reduction of transmission losses.

b. The load despatch centre of the concerned utility is to be equipped with state of the art techniques for ensuring the above objectives.

IV.14 Institutional Issues

a. The utilities of the power sector are to be presently divided into two following major groups according to functional responsibilities :

   i. generation and transmission
   ii. distribution

b. BPDB is to be restructured along functional lines. The functions of generation and transmission are to be separated from those of distribution of electricity and two separate corporatised entities, one for carrying out generation and transmission functions and the other for carrying out distribution function in those areas that are now being served by BPDB are to be established over a period of time in phases. These two (new) public limited companies are to be formed under the Companies Act of 1913 with necessary organizational and financial restructuring and the ownership remaining with the Government. In the longer-term, generation and transmission functions may also be needed to be separated.

c. DESA is to be corporatised and converted into a public limited company under the Companies Act of 1913 with necessary organizational and financial restructuring with the ownership remaining with the Government.

d. There is to be a Board of Directors, to be appointed by the Government for each of the companies as mentioned under (b) and (c) above, for directing and monitoring the performance of the company. Majority of the Directors, including the Chairman are to be from various interest groups outside the Government. Government may retain indirect control on specified matters through nominated Directors (from within the Government) with voting rights.

e. The new companies should have the right to select employees on their own terms and conditions of employment so as to attract and retain high quality staff.

f. Regulatory functions of the power sector are to be administered by a regulatory body to be initially attached to the Ministry of Energy and Mineral Resources. Its responsibilities may include, among others, licensing, tariff, safety standards, codes, performance standards and definition of franchise area of operation and licensing and development and updating of an agreed forecast.

g. The responsibility of policy formulation involving the power sector arc to continue to be vested with the Government.

IV.15 Private Sector Participation

a. Local and expatriate entrepreneurs are to be allowed to participate in development of the power sector. Possible modes of participation in functional areas may be as follows.

   i Generation: Specific projects included in the list of generation projects identified through national planning should be offered for private investment. Competitive tenders on the basis of Build-Own-Operate (BOO) and Joint Venture should be invited. Unsolicited offers received upto the approval date of this policy will be appraised by a competent group of experts (local and foreign) formed by the Ministry of Energy & Mineral Resources.

   ii Distribution: The Government is to invite private parties, possibly, including co-operative societies of utility employees, to supply power in one or more localities on an experimental basis, after evaluating alternative ways to organize their participation (e.g. franchise, contract).

   iii Contracting of Services: The government may consider contracting out some functions currently performed by BPDB and DESA particularly meter reading, billing and/or collections.

   iv Wheeling Arrangement: The electricity generated by private generators may be supplied to the grid system of the Generation and Transmission Company of agreed terms and conditions. The private/public generators may also sell directly to large consumers though the transmission and distribution facilities of other companies provided the facilities are adequate and the commercial terms and conditions of such wheeling arrangements are acceptable to all concerned.

b. Terms and conditions under which the private sector shall participate in generation and distribution are to be settled jointly by the Government, the proposed regulatory authority, entrepreneur(s), and the concerned utility companies.

c. Privatization of the power sector is to be considered in future depending on experience with corporatisation.

IV.16 Human Resource Development

a. Organization charts for operation and maintenance of new plants are to be designed in such a way that total manpower is not allowed to exceed the optimum level.

b. Present manpower of the utilities are to be reviewed to identify excess manpower. Such excess manpower may be utilized for future projects and plants.

c. Persons specifically hired for project implementation are to be employed on a contract basis and their service conditions shall preclude their automatic absorption in the utility.

d. Distribution utility boundaries are to be rationalized in order to avoid parallel operation and to optimize human resource utilization.

e. Employment opportunities or labour intensiveness should never be a criterion for acceptance of projects of power sub-sector.

f. A comprehensive training programme is to be developed for the power sector, which shall encompass all functional areas of the power sector and specifically include system planning, construction management, system operation and maintenance, utility management, financial management and computer aided operation.

g. Training is to be linked to career planning of professionals of the utilities.

h. The Government and/or the utilities are to provide adequate funds for implementation of the training programme.

i. A personnel, trained in a specific functional discipline, is not to be transferred to any other discipline.

j. Local training facilities are to be strengthened. Professionals receiving training abroad are to participate in local training as resource personnel in specific training programmes for ensuring smooth dissemination of technology and knowledge.

k. Local training facilities are to be made available to the future entrepreneurs of the private sector on payment of prescribed charges.

l. Inter-utility linkage in the field of human resource development is to be strengthened.

IV.17 Regional/International Cooperation

i. Possibility of importing electricity from neighbouring countries may be examined.

ii. Attempts may be made to include inter utility cooperation in the list of SAARC activities.

iii. Linkages of local utilities with those in other countries are to be established to form a basis for exchange of experience in power development and training of human resources.

IV.18 Technology Transfer and Research Programme

i. Transfer of technology is to be given due consideration in development of the power sector.

ii. Efforts are to be made to substitute import by local inputs. This may include both hardware and software like engineering, design and project management. At distribution level in particular, locally produced materials and equipment are to be used to substitute import.

iii. Local industries are to be assessed in order to identify manufacturing capabilities relevant to projects of power sector. Industries, thus identified, are to be encouraged to manufacture identified items as per standards.

iv. Utilities are to form a group of experts to provide advisory and consulting service in the power sector. Such groups shall be allowed to function on a commercial basis.

v. A comprehensive Research and development programme addressing problems of electrical energy is to be drawn up and implemented in cooperation with local universities/ BITs and R & D institutions. Adequate funds are to be made available for implementation of the R & D programme.

IV.19 Environmental Policy

i. Development of power sub-sector shall be such that it is sustainable environmentally and cost-effective at the same time.

ii. Environmental Impact Assessment shall be mandatory for any project of electricity generation. Clearance of projects from environmental point of view shall be accorded without undue delay so as to avoid cost and schedule over runs.

iii. The Department of Environment shall prescribe standard contents and formats of EIA to be submitted on electricity projects and also define other regulatory codes, guides and standards on emission and thermal pollution from generating plants. Same environmental standards shall be applicable to the new plants in the private and the public sectors.

iv. All new projects shall conform to the limits, codes, guides and standards that may exist at the time of project planning. In case of power plants already existing or under implementation, efforts shall be made to reduce the pollution as close as possible to the permissible level. In such cases economics of power generation and its effect on tariff shall be taken into account in reducing their pollution level.

v. Provisions under the Nuclear Safety and Radiation Control Act (Act 21 of 1993, the Government of Bangladesh) and its regulations in addition to environmental standards of the Department of Environment shall be mandatory in installation, operation and maintenance of nuclear power plants.

vi. Mode of disposal of wastes in case of coal-fired plants and radioactive wastes of nuclear power plants, as defined by the Department of Environment and the Nuclear Safety and Radiation Protection Division of BAEC, shall be followed.

vii. Watershed management should be an integral part of a hydropower project. Concerned government agencies should take care of the soil conservation and afforestation/reforestation issues and other activities to arrest soil erosion and consequently siltation within the dam area.

IV.20 Legal Issues

Appropriate modification/revisions of the existing Law, Acts, Ordinances, Regulations, etc are to be made in consultation with the Ministry of Law in order to facilitate implementation of various provisions of the National Energy Policy.

V. RURAL ELECTRIFICATION POLICY

V.1. General Policy Issues

a. Planning of rural electrification is to be made consistent with the overall goals of socio-economic development of the country.

b. Economic viability and overall economic sustainability are to be considered at the time of extension of rural electrification programme.

V.2. Specific Policy Issues

V.2.1. Demand Estimation and Planning

a. Demand for electricity in any rural area is to be duly assessed for different time horizons based on the demands for different categories of end-users.

b. Factors influencing growth in demand like possibilities of surplus income, changes in life style, scopes for diversification of economic activities and interdependence of end-uses and their effect on the demand for electricity are to be taken into cognizance and to be reflected in demand forecasts.

c. Area of coverage within a PBS or the PBS itself is to be determined on the basis of load quantum, numbers and mix of consumers and load factor.

d. Phasing of coverage of an area within a defined utility boundary and also an utility unit (PBS) is to be drawn up on the basis of growth of load and economics of extension.

e. The existing Master Plan is to be updated to provide a realistic programme on bringing all the rural areas of the country under electrification in phases. Such a Master Plan, delineating load centres and their growth potentials, is to be the basis for rural electrification irrespective of the utility to be actually involved in its implementation. Area based micro planning is to be integrated for preparing the Master Plan on rural electrification.

V.2.2 Approach for Extension

a. Primarily the techno-economic considerations are to determine the priority of areas to be electrified.

b. In case of resource constraints, areas with better prospects of utilization and better economic return shall be given preference over others.

c. In case an area within a PBS or a PBS itself is taken up for electrification for reasons other than technical and economic viability, then the concerned PBS is to be given financial support, including rescheduling of debt servicing (e.g. extended moratorium).

V.2.3 Palli Bidyut Samity

a. Electrification through Palli Bidyut Samity with scopes for participation of rural consumers in the entire programme is to be continued.

V.2.4. Financing for Extension of REB Network

a. Adequate financial resources are to be allocated for implementation of the Master Plan on rural electrification.

b. Conditions of financing (interest rate and repayment schedule) are to be such that a PBS can meet the debt servicing liabilities without frequently increasing the tariff rates.

c. The existing system of repayment of debts by the PBSs for 30 years including a grace period of 5 years may be continued. The conditions for repayment of debt may be further relaxed for financially weaker PBSs (having low load density and low utilization factor), especially during the initial years of their commercial operation.

V.2.5 Cost Optimization and Need for Import Substitution

a. Capital cost for establishing PBS and construction of distribution lines including other equipment is to be reduced by gradually replacing import with equivalent locally produced items.

b. The private sector is to be encouraged to produce identified items of rural electrification in sufficient quantities and according to the standard and quality to be specified by REB.

c. Local producers are to be offered the opportunity and terms and conditions equivalent to the imported items for rural electrification network in order to encourage them to produce such items locally. Reduced duties may be charged on imported raw materials to be used by the concerned manufacturing industries.

V.2.6 Number of PBS and the Average Size

a. Each PBS may cover on the average 6 Thanas and the average size of a PBS is to be of the order of 1,500 Sq. Kilometers.

b. Minimum size of a PBS in terms of installed capacity is to be 20 MVA, while the maximum size is to be determined by the trend of growth in demand. If management of a PBS of size larger than 100 MW appears to be difficult, then the PBS may be split into two PBS or a part of its load may be merged with an adjacent smaller PBS, if available.

c. Depending on the area served, physical distance of the furthest consumer from the PBS Headquarters, a PBS may be split into more than one rural electrification districts. In this case the overhead of maintaining district offices is to be optimized.

d. If a utility other than REB is given the responsibility for electrification of the districts in Chittagong Hill Tracts, then the expansion of rural electrification network in those areas is to meet the criteria followed for the REB network.

V.2.7. Capacity Utilization and Load Factor

a. Efforts are to be made to increase capacity utilization of the existing and future PBS in order to improve their economic performance.

b. Target minimum annual sale of a PBS is to be not less than 60 GWh in order to help them attain an economic break even point.

c. The annual load factor of a PBS is to be as close to the national grid as possible in order to improve economic performance.

V.2.8 Demand Management

a. Demand in a PBS is to be managed efficiently, so that the average to peak demand ratio may be as high as possible. The peak demand is also to be restricted so as to facilitate efficient demand management and economic operation of the national grid.

b. Use of energy during off-peak hours is to be encouraged in order to improve financial performance of the rural electrification network and the national grid.

V.2.9 Domestic Use of Electricity

a. Domestic connections to as many households in an electrified area as possible is to be aimed so that an average household can have two fluorescent tubes of 20 Watt capacity each.

b. Domestic consumers are to be encouraged to avoid wasteful use of energy.

V.2.10. Industrial Demand

a. Scopes for growth in industrial demand for electricity shall be exploited to the extent possible.

b. A congenial atmosphere and incentive packages are to be developed and offered to the private sector for establishing industrial units in the rural areas.

c. Categories of industries for implementation in rural areas are to be identified, and if needed new industries of such categories are to be allowed to be set up in rural areas only.

d. A list of industries may be drawn up for each PBS based on analysis of resources available, priority and other techno-economical considerations. Such a list of industries may be annexed to the master plan for rural electrification.

e. PBS with surplus cash may be encouraged to invest in local industrial ventures. The local financial institutions may be encouraged to accept a solvent PBS as a collateral security.

f. Credit for rural industries may be provided at softer terms and conditions based on the consideration that the resulting improvement in rural economy, diversification of activities and improvement in life style will help restriction of migration and unplanned urbanization.

V.2.11 System Loss Reduction and Conservation

a. Efforts are to be made through the PBS members to bring down the non-technical loss. Villagers are to be motivated to realize their social and moral obligations to reduce loss. They should be convinced that the reduction of loss will fetch many financial benefits to them, including scopes for equity participation in industrial projects.

b. Villagers are to be motivated to avoid wasteful use of energy and the use of electricity during peak hours is to be restricted.

c. Each Palli Bidyut Samity is to identify measures at different end-use levels so that wasteful use of energy can be avoided through technological interventions.

V.2.12 Power Generation

a. If it becomes necessary to install separate power plants for the REB network, the same are to be planned keeping in view the expansion plan for the national grid and cost economics of such a project viz-a-viz its effect on the tariff structure.

b. Renewable energy technologies like solar photovoltaic and wind energy may be considered for rural areas on their cost economics.

c. Gestation time for the solar PV being much lower (months) than other energy projects, these may be considered for large scale deployment whenever the capital cost comes down to an acceptable level. In case of wind turbines, suitable type is to be selected which can be operated optimally at the average wind speed of the selected site.

V.2.13 Environment

a. Environmental Impact Assessment for possible future power plants built by

c. the PBS/REB are to be conducted in the same line as applicable for any other power plant.

V.2.14 Tariff Structures

a. Tariff structure for rural consumers is to be developed in such a way that the PBS are economically viable, while the rates are within the purchasing power of the rural communities.

b. Rural industries may be offered lower tariff than the urban industries during off-peak hours in order to stimulate rural industrial activities and to facilitate efficient demand management.

c. Considering the importance of agriculture, special tariff facilities is to be offered for irrigation pumps during off-peak hours.

d. Electricity consumption in rural commercial sector during peak hours is to be discouraged through the differential tariff structure.

e. Operation of husking and milling units during peak hours are to be discouraged by imposing high rates.

V.2.15. Rationalization of Utility Areas

a. The supply areas are to be such that the network can be efficiently planned, implemented and managed. If needed an utility area with low load density may be merged with the adjacent utility area.

b. System load is to have sufficient magnitude. A minimum of about 15 MW would be necessary while optimum levels would be over 50 MW.

c. The consumers served are to be at least of the order of about 15,000 with a good mix of consumer types.

d. The demarcation between adjacent operational units is to be such that efficient net work configurations can be attained.

e. The supply area is to be contiguous and one utility should not have pockets of supply areas within another utility.

V.2.16 Institutional Issues

a. Scopes of REB activities may be widened by incorporating activities related to stimulation of demands for electricity, especially in the industries sector.

b. Advisory roles of external agencies (BRDB, BADC and BSCIC) are to aim at rural industrialization and diversification of economic activities. The advisory board of REB is to be widened by inclusion of private sector representative.

c. REB is to be provided with additional financial resources enabling it to enhance its capability in expansion of the network to 10,000 Km per year by the year 2000 AD based on adequate demand and generation.

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

ABPL - Asphaltic Bitumen Plant Ltd.
ADB - Asian Development Bank
ADP - Annual Development Program
APPI - Asian Petroleum Price Index
ARCO - Atlantic Richfield Company
BAPEX - Bangladesh Petroleum Exploration Co. Ltd.
BBL - Barrels
BBM - Bangladesh Bureau of Mines
BCAS - Bangladesh Centre for Advanced Studies
BCF - Billion (10^9) Cubic Feet
BCMCL - Barapukuria Coal Mining Company Ltd.
BELA - Bangladesh Environmental Lawyers Association
BEMP - Bangladesh Environment Management Project
BEPP - Bangladesh Energy Planning Project
BES - Bangladesh Energy Studies
BGFCL - Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.
BGSL - Bakhrabad Gas System Ltd.
BOC - Burma Oil Company
BODC - Bangladesh Oil Development Company Ltd.
BOGMC - Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation (Short name Petrobangla)
BOO - Build-Own-Operate
BOOT - Build-Own-Operate & Transfer
BOT - Build-Operate and Transfer
BPC - Bangladesh Petroleum Corporation
BPDB - Bangladesh Power Development Board
BRTA - Bangladesh Road Transport Authority
BSTI - Bangladesh Standard and Testing Institute
Caim - Caim Energy PLC
CIF - Cost Insurance and Freight
CFR - Cooperative Fuel Research
CM - Cubic Meter
CNG - Compressed Natural Gas
COS - Company's Shares of Gas Revenue
CP - Consumer Price of Gas (Unit Price)
CRF - Cost Recovery Fraction of Gas
CSG - Contractor's Share of Gas
CSIS - Center for Strategic and International Studies
CSP - Contractor's Share of Profit Gas
CST - Centri-Stroke
CT - Corporate Tax
DAE - Department of Agriculture Extension
DCM - Distribution Company's Margin
DCS - Distribution Company's Share
DESCO - Dhaka Electric Supply company
DESA - Dhaka Electric Supply Authority
DMC - Dhaka Municipal Corporation
DMP - Dhaka Metropolitan Police
DOE - Department of Environment

DOEX - Department of Explosive
DOF - Department of Forest
DOL - Department of Livestock
EA&CEI - Electric Adviser and Chief Electric Inspector
ECS - Exploration Company's Share
EIA - Environmental Impact Assessment
ELBP - Eastern Lube Blending Plant
EMCC - Energy Monitoring and Conservation Center
ERD - Economic Resources Division, Ministry of Finance
ERL - Eastern Refinery Ltd.
ESMAP - Energy Sector Management Assistance Programme
FBCCI - Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries
FEJB - Forum of Environmental Journalists of Bangladesh
FERC - Federal Energy Regulatory Commission
FO - Furnace Oil
FOB - Free on Board
GDP - Gross Domestic Product
GNP - Gross National Product
GOB - Government of Bangladesh
GOS - Government's Share of Gas Revenue
GR - Gas Revenue (Total)
GSB - Geological Survey of Bangladesh
GSG - Government's Share of Gas
GSP - Government's Share of Profit Gas
GTCL - Gas Transmission Company Ltd.
GW - Giga (10^9) Watt
GWh - Giga (10^9) Watt Hour
HFS - Hydrocarbon Fund's Share
HFSD - Hydrocarbon Funds Share for Distribution Companies
HFSP - Hydrocarbon Funds Share for Production Companies
HFST - Hydrocarbon Funds Share for Transmission Companies
HHV - Higher Heating Value
HOBC - High Octane Blending Compound
HSD - High Speed Diesel
HSFO - High Sulphur Fuel Oil
HU - Hydrocarbon Unit
IAEA - International Atomic Energy Agency
IEA - International Energy Agency
IMC - Institute of Management Consultants
IOC - International Oil Company
IPP - Independent Power Producer
IPPC - Indian Petroleum Prospecting Company
JGTDSL - Jalalabad Gas Transmission and Distribution System Ltd.
JOCL - Jamuna Oil Company Ltd.
KAFCO - Karnafuli Fertilizer Co. Ltd., Chittagong
KGOE - Kilogram Oil Equivalent
LHV - Lower Heating Value
LNG - Liquefied Natural Gas
LPG - Liquefied Petroleum Gas
LPGL - Liquefied Petroleum Gas Ltd.
MCF - Thousand Cubic Feet
MGMCL - Madhayapara Granite Mining Company Ltd.
MJ - Mega (10^6) Joule
MMCF - Million Cubic Feet

MMCFD - Million Cubic Feet Per Day
MOA - Ministry of Agriculture
MOEF - Ministry of Environment and Forest
MOEMR - Ministry of Energy and Mineral Resources
MPL - Meghna Petroleum Ltd.
MT - Million Ton
MTOE - Million Ton Oil Equivalent
MW - Mega (10^6) Watt
NBR - National Board of Revenue
NEA - National Energy Authority
NEP - National Energy Policy
NEPP - National Energy Policy Plan
NG - Natural Gas
NGL - Natural Gas Liquid
NGO - Non-Government Organization
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development
OGDC - Oil and Gas Development Corporation
OPEC - Organization of Petroleum Exporting Countries
Occidental - Occidental Bangladesh Ltd., Occidental Exploration Bangladesh Ltd.
OTA - Office of Technology Assessment
P - Production
PBS - Palli Biddyut Samity (Rural Electric Cooperative)
PC - Power Cell
PCS - Production Company's Share
PCM - Production Company's Margin
PF - Profit Fraction of Gas
PGCB - Power Grid Company of Bangladesh
PJ - Peta Joule = 10^{15} Jule
POCL - Padma Oil Company Ltd.
PPL - Pakistan Petroleum Ltd.
PSC - Production Sharing Contract
PSIG - Pound Per Square Inch Gauge
PSMP - Power System Master Plan
PSOC - Pakistan Shell Oil Company
PTDCS - Production, Transmission and Distribution Companies Share
R - Reserve
RAJUK - Rajdhani Unnayan Kartipakha
REB - Rural Electrification Board
REDA - Renewable Energy Development Authority
ROR - Rate of Return
RPGCL - Rupantarito Prakritik Gas Co. Ltd.
SAOCL - Standard Asiatic Oil Company Ltd.
SBED - Shell Bangladesh Exploration and Development BV (Shell)
SCL - Scimitar Company Ltd. (Simitar)
SD - Supplementary Duty
SGFL - Sylhet Gas Fields Ltd
TCF - Trillion (10^{12}) Cubic Feet
TCM - Transmission Company's Margin
TCS - Transmission Company's Share
TDCS - Total (Revenue Distributed Due to) Distribution Companies' Share
TECS - Total (Revenue Distributed Due to) Exploration Companies' Share
TEL - Tetra Ethyl Lead
TGTDCL - Titas Gas Transmission and Distribution Company Ltd.
TML - Tetra Methyl Lead

TOE - Ton Oil Equivalent
TPCS - Total (Revenue Distributed Due to) Production Companies' Share
TSD - Total (Revenue on Account of) Supplementary Duty
TTCS - Total (Revenue Distributed Due to) Transmission Companies' Share
TVAT - Total (Revenue on Account of) Value Added Tex
Tonne - Thousand Kilogramme
UNCTAD - United Nation Conference on Trade and Development
UNDP - United Nations Development Programme
UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees
Unocal - Unocal Bangladesh Ltd. (UBL)
USA - United States of America
USGS - United States' Geological Survey
VAT - Value Added Tax
VG - Volume of Gas (Total)
WB - World Bank
WESGAS - Western Region Gas Co. Ltd.
WG - Wellhead Gas
WPPF - Workers' Profit Participation Fund
WRIP - Western Region Integrated Project